Recommended as a Bengali Text-Book for the Matriculation Examination by the Calcutta University and Recommended as a Text-Book for the Middle and Higher Classes of H. E. Schools by the Government of Bengal. (Vide Calcutta Gazette 12th July, 1913 and 3rd Oct. 1917)

রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত

—o[*]o—

প্রকাশক—

শ্রীমোহিনীকান্ত গুপ্ত

"রজনীকুটীর"

২৮।১৬ নং অখিল মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—

সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী, ৩০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

(সংশোধিত পঞ্চদশ সংস্করণ)

1919

[illegible] এক টাকা আট আনা।

রজনীকান্ত গুপ্ত

জন্ম—১২৫৬ সাল (১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দ) ২১শে ভাদ্র।

সূচী।

গ্রন্থকারের জীবনী।

১২৫৬ সালে ভাদ্রমাসের ২১শে তারিখে মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধীন মত্তগ্রামে মাতুলালয়ে রজনীকান্তের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ৺কমলাকান্ত গুপ্ত তেওতা গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে রজনীকান্ত সর্ব্বকনিষ্ঠ।

তেওতা মাইনর স্কুলে ইঁহার বিদ্যা আরম্ভ হয়; বাল্যকালে তিনি দুষ্ট জ্বররোগে আক্রান্ত হয়েন; তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত জীবন রক্ষা হইয়াছিল; কিন্তু শ্রবণ-শক্তির দুর্ব্বলতা ঘটিয়াছিল। তাহার ফল তিনি চিরজীবন ভোগ করিয়াছিলেন। উচ্চে কথা না কহিলে শুনিতে পাইতেন না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তেওতা স্কুলে শিক্ষক থাকায় শিক্ষাবিষয়ে কিছু সুবিধা ঘটিয়াছিল। পরে মাণিকগঞ্জ এণ্ট্রান্স স্কুলে যান, সেখানেও অপর এক সহোদর শিক্ষক ছিলেন। মাণিকগঞ্জে কিছুদিন থাকিয়া পুনরায় তেওতা স্কুলে আসিয়া ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে তিনি কলিকাতায় আসেন। সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ সুপ্রসিদ্ধ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের অনুগ্রহে সংস্কৃত কলেজের স্কুলে প্রবেশের সুবিধা ঘটে; এবং তাঁহার শ্রবণশক্তির খর্ব্বতা দেখিয়া অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহার প্রতি বিশেষ যত্ন লইবার জন্য শিক্ষকদিগকে বলিয়া দেন। তিনি শিক্ষকদিগের নিকটে বসিবার জন্য পৃথক আসন পাইতেন। সংস্কৃত কলেজের স্কুলে থাকিয়া ইঁহার সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মে; তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্যের অনুরাগ ও বিশুদ্ধ ভাষা ব্যবহারের শক্তি এইরূপেই অর্জ্জিত হইয়াছিল। ইংরাজী ভাষায় ও গণিতাদি বিষয়ে তিনি সেরূপ ব্যুৎপত্তি-লাভে সমর্থ হন নাই; এবং এই কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়াও ঘটিয়া উঠে নাই। বাল্যকালে তিনি কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে

ভর্ত্তি হয়েন। কিছু সংস্কৃত শিক্ষার পর আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া ব্যবসায় চালাইবেন, এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল। সংস্কৃত কলেজে তিনি এণ্ট্রান্স ক্লাস পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন মাত্র।

বিদ্যালয়-ত্যাগের পরবর্ত্তী কালে তিনি কিছুদিন পরলোকগত কবিরাজ ব্রজেন্দ্রনাথ কণ্ঠাভরণের নিকট আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার্থ যাতায়াত করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা গবর্ণমেণ্টের অধীন একটি সাব্‌ডেপুটীগিরি যোগাড় করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু চিকিৎসা ব্যবসায় বা চাকরী কিছুই তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী না হওয়ায় তিনি ঐ পথে যান নাই।

এই সময় হইতেই তাঁহার বাঙ্গলা রচনার প্রতি অত্যন্ত ঝোঁক ছিল ও বাঙ্গলা সাহিত্যের আলোচনা দ্বারা যশোলাভের বাঞ্ছা ছিল। তাঁহার রচিত প্রথম্ পুস্তক জয়দেবচরিত বাঙ্গলা ১২৮০ সালে প্রকাশিত হয়। কিছু দিন পূর্ব্বে ঐ পুস্তক লিখিয়া তিনি রাজা সার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রদত্ত পুরস্কার পাইয়াছিলেন। তৎপরে ১২৮২ সালে গোল্ড ষ্টুকারের পাণিনি প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া পাণিনি পুস্তক প্রকাশ করেন।

সাহিত্যচর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করিবেন, রজনীকান্তের এইরূপ সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু বঙ্গদেশে সাহিত্য-চর্চ্চায় জীবিকা চলিতে পারে কি না, তাহা তখনও প্রমাণসাপেক্ষ ছিল। সে সময়ে রজনীকান্তের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না; কলিকাতার খরচ অতিকষ্টে চালাইতেন। তাঁহার সমকালে যাঁহারা তাঁহার সহিত হিন্দু-হোষ্টেলে বাস করিতেন, তাঁহাদের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি গ্রহণ করিয়া পরবর্ত্তী কালে সমাজে মান্য-গণ্য হইয়াছেন। রজনীকান্তের কোন উপাধিলাভ ঘটিয়া উঠে নাই। শ্রবণশক্তির দৌর্ব্বল্য তাঁহার জীবিকার্জ্জন বিষয়ে দারুণ অন্তরায় হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় ও এরূপ সময়ে সাহিত্যচর্চ্চা দ্বারা জীবন অতিবাহনের সঙ্কল্প অসাধারণ সাহসের বা দুঃসাহসের পরিচায়ক।

রজনীকান্ত সেই সাহস বা দুঃসাহস লইয়া সাহিত্যচর্চ্চা জীবনের ব্রত-স্বরূপ অবলম্বন করিলেন। সাহিত্যের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ না থাকিলে এরূপ ঘটিতে পারে না। মৌখিক অনুরাগ এইরূপ দুঃসাহস জন্মাইতে পারে না। বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালীর মধ্যে এইরূপ উদাহরণ বিরল। দ্বিতীয় উদাহরণ আছে কিনা, জানি না।

এই সময়ে তিনি স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির নিকট পরিচিত হন। ভূদেব বাবুর অনুরোধে তিনি সামান্য পারিশ্রমিক লইয়া এডুকেশন গেজেটে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন।

রজনীকান্তের এই সময়ে প্রায় নিঃস্ব অবস্থা। তথাপি তাঁহার প্রবল সাহিত্যানুরাগ দমিত হয় নাই। এই অবস্থাতেও তিনি পাঠের জন্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করিতেন। এই অবস্থাতেই সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস লিখিবার সঙ্কল্প করেন। ১২৮৮ সালে বঙ্গবাসী সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা হইলে, ঐ সংবাদপত্রের নিয়মিত লেখক-শ্রেণীর মধ্যে রজনীকান্তের নাম বাহির হয়। ঐ বৎসর পরলোকগত রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের যত্নে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক এণ্ট্রান্স পরীক্ষার অন্যতম পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েন ও তৎপর বৎসর তাঁহার সঙ্কলিত সংস্কৃতগ্রন্থ এণ্ট্রান্সে পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্ধারিত হয়। এই ঘটনার পর হইতে আর তাঁহাকে জীবিকার জন্য ক্লেশ পাইতে হয় নাই।

বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করিয়া তিনি আর্য্যকীর্ত্তি নামে প্রকাশ করেন। উহাই তাঁহার বালকপাঠ্য প্রথম রচনা। তৎপরে তিনি বিদ্যালয়ের ব্যবহারের জন্য ও বালকগণের পাঠের জন্য অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। অনেকগুলি গ্রন্থ টেক্‌ষ্ট-বুক্ কমিটীর অনুমোদিত হইয়াছিল। কোন কোন গ্রন্থ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইত। এইরূপে স্কুলপাঠ্য পুস্তক প্রচারে তাঁহার

যে আয় দাঁড়াইয়াছিল, তাহার সাহায্যে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে আর সংসার চালাইবার জন্য চিন্তা করিতে হয় নাই।

গত ৩রা বৈশাখ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি চারিজন বন্ধুর সহিত তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে কাশীমবাজার গিয়াছিলেন। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের নিকট বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গৃহ-নির্ম্মাণের নিমিত্ত ভূমি প্রার্থনা উদ্দেশ্য ছিল। সে সময়ে তাঁহার হাতে গোটা দুই সামান্য ব্রণ হইয়াছিল। কাশীমবাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়া আরও গোটা দুই সামান্য ব্রণ হয়। পরে পিঠের উপর একটা ব্রণ হইয়া বৈশাখ মাসটা কিছু কষ্ট পান। পিঠের ব্রণকে কার্বঙ্কল স্থির করায় তাঁহার মনে কিছু আশঙ্কা হয়। সেই ব্রণ ভাল হইলে, সিপাহীযুদ্ধের শেষ ফর্ম্মা ছাপাখানায় দিয়া জ্যৈষ্ঠমাসে পীড়িত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দেখিবার জন্য বাড়ী যান। বাড়ীতে থাকিতে বাম হাতের তলে একটা ব্রণ হয়। সেই ব্রণ অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ও ক্রমে প্রাণসংহারক হইয়া উঠে। ২৪শে জ্যৈষ্ঠ দারুণ পীড়ায় পীড়িত হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। তখন বহুমূত্র রোগের পূর্ণাবস্থা! ৩০শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার রাত্রি দেড়টার সময় পত্নী, দুই কন্যা ও এক পুত্র রাখিয়া রজনীকান্ত পরলোক গমন করিয়াছেন। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস-রচনা তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। ঐ কার্য্য সম্পাদিত করিয়াই যেন তিনি আর ইহলোকে অবস্থিতি আবশ্যক বোধ করিলেন না।

রজনীকান্তের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক ছিল। তাঁহার অমায়িক ভদ্রস্বভাবে ও উদার সরল ব্যবহারে তাঁহার বন্ধুগণ মুগ্ধ ছিলেন। এমন শান্ত স্বভাবের ও সরল ব্যবহারের দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল। যিনি একবার অল্প সময়ের জন্য, তাঁহার স্পর্শে আসিতেন, তিনি তাঁহার অকৃত্রিম সারল্যে মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে তাঁহার বন্ধুগণ আত্মীয় বিয়োগের ব্যথা পাইয়াছেন। তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকিত; যেখানে

তিনি উপস্থিত থাকিতেন, সে স্থানকে আনন্দময় করিয়া তুলিতেন। সকল সময় সাহিত্যের আলোচনায় ও সদালাপে অতিবাহিত করিতেন। বঙ্গসাহিত্যে রজনীকান্তের অভাব, তদপেক্ষা ক্ষমতাশালী পণ্ডিত জনকর্তৃক পূর্ণ হইবে ; কিন্তু সেই অকপট, শ্রদ্ধাশীল, অমায়িক, অনুরক্ত, সদানন্দ বন্ধুর অকালমরণে তাঁহার বন্ধুসমাজ যে অভাব বোধ করিলেন, তাহা আর পূর্ণ হইবার নহে।

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ স্থাপিত হওয়া অবধি রজনীকান্ত গুপ্ত উহার অনুগত সেবক ছিলেন। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের আশ্রয়ে যখন Bengal Academy of Literature বিজাতীয় বেশ ত্যাগ করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রূপান্তরিত হয়, রজনীবাবু তদবধি উহার সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার তিনিই প্রথম সম্পাদক। প্রথম দুই বৎসর তিনি দক্ষতার সহিত পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ রচনা ও প্রবন্ধসংগ্রহ হইতে মুদ্রণ কার্য্যের তত্ত্বাবধান ও প্রুফ দেখা পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যই তাঁহাকে একাকী সম্পন্ন করিতে হইত। এইজন্য তাঁহাকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইত। পরিষদের প্রতিষ্ঠার ও উন্নতির জন্যও তিনি প্রচুর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। বোধ করি, আর কোন সদস্যের নিকট সাহিত্য-পরিষৎ এতটা ঋণী নহেন। রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর ও তদানীন্তন সভাপতি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় রজনী বাবুর পরামর্শ না লইয়া পরিষদের জন্য কোন কাজই করিতেন না। পরিষদের কার্য্য-প্রণালীর আলোচনায় তিনি প্রচুর সময়ক্ষেপ করিতেন। পরিষদের উদ্দেশ্য কিরূপ হওয়া উচিত, পরিষৎ-পত্রিকার আলোচনার বিষয় কিরূপ হওয়া উচিত, এই সকল বিষয় লইয়া সর্ব্বদাই আন্দোলন করিতেন। আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগ তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষণ ছিল ; যে কাজে তিনি হাত দিতেন, শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সহিত তাহা সম্পাদন করিতেন। মুখ্যতঃ খ্যাতিলাভের প্রয়ো-

চনায় তিনি কোন কাজ করিতেন না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার শ্রদ্ধার ও অনুরাগের আস্পদ হইয়াছিল। সাহিত্য-পরিষৎ যে যে প্রধান কার্য্যে এ পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, রজনীকান্ত সেই সকল কার্য্যেই প্রধান উদ্‌যোগী ছিলেন। তাঁহারই প্রস্তাবে পরিষদের পরিভাষাসমিতি ও ব্যাকরণসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশ দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্যকে পরিপূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে পরিষদে গ্রন্থরচনা-সমিতি স্থাপনের প্রস্তাব করেন। তাঁহারই প্রস্তাবে সাহিত্যপরিষৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলাভাষার ও বাঙ্গলা-সাহিত্যের আলোচনা প্রবেশ করাইবার জন্য চেষ্টা করেন। পরিষদের প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক সর্ব্বাংশে গৃহীত হয় নাই; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ফার্ষ্ট আর্টস্ ও বি. এ. পরীক্ষায় বাঙ্গালা রচনার পরীক্ষা প্রচলিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থা প্রণয়নের পর হইতেই রজনীকান্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক বাঙ্গালা-রচনা বিষয়ে অন্যতম পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়া আসিতেছিলেন। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে অর্থ-সাহায্য করিবার জন্য পরিষৎ-কর্ত্তৃক ও পরিষদের বাহিরে যে চেষ্টা হয়, রজনীবাবু তাহাতে আন্তরিক উৎসাহের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। এই চেষ্টার আংশিক সফলতা তাঁহার নিরতিশয় আনন্দের কারণ হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরবর্ত্তী রবিবারে সাধারণ অধিবেশনে সাহিত্যপরিষৎ তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। ১৭ই আষাঢ় তারিখে এই উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। উহার কার্য্যবিবরণ যথা-স্থানে প্রকাশিত হইবে।

যে কোন সৎকার্য্যে সাধ্যমত সাহায্য করিতে পাইলে, তাঁহার যথেষ্ট আনন্দ হইত। তিনি কোনরূপ সঙ্কীর্ণভাব বা গোড়ামির প্রশ্রয় দিতেন না। ভিন্নমতাবলম্বীকে তিনি শ্রদ্ধা করিতে পারিতেন।

বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসে রজনীকান্তের স্থান কোথায়, তাহার নির্ণয়ের এ সময় নহে। স্বাধীনভাবে ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাস

আলোচনায় তিনিই পথপ্রদর্শক। তৎপূর্ব্বে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু রামদাস সেন প্রভৃতি ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্বের স্বাধীন আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন; রজনীকান্তের প্রথম গ্রন্থ জয়দেবচরিত ও পাণিনি দেখিলে মনে হয়, তাঁহারও বোধ করি সেই পুরাতত্ত্ব আলোচনার দিকেই প্রথমতঃ প্রবৃত্তি ছিল। কিন্তু শীঘ্রই তিনি সে পথ ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মুসলমান ও ইংরাজ-অধিকারে ভারতবর্ষের অবস্থা তাঁহার পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক গ্রন্থমাত্রেরই বিষয়।

বাঙ্গলা সাহিত্যের জন্য রজনীকান্ত যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহার মূলে একটা কথা পাওয়া যায়;—স্বজাতির প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ। এই অনুরাগই প্রথমতঃ তাঁহাকে পুরাতত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল। এই অনুরাগই তাঁহাকে পরে ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের স্বাধীন সমালোচনায় প্রবৃত্ত করে। ঐতিহাসিকের হস্তে স্বজাতির চরিত্রে অযথা কলঙ্কলেপন দেখিয়া তিনি ব্যথিত হইয়াছিলেন। সেই কলঙ্ক প্রক্ষালনের জন্য তিনি লেখনী ধারণ করেন। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস নূতন করিয়া লিখিবার জন্য এই কারণে তাঁহার সঙ্কল্প হয়। আধুনিক ইতিহাসের সমগ্র ভাগ হইতে সিপাহীযুদ্ধের অংশ নির্ব্বাচন করিয়া লওয়ায় তাঁহার মনে আন্তরিকতার আবেগের কতক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

বাঙ্গালীর পক্ষে স্বাধীনভাবে ইতিহাস আলোচনার পথ নিতান্ত সরল পথ নহে। প্রথমতঃ ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের জন্য বৈদেশিক লেখকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আপন দেশে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা বা স্মরণে রাখা আমাদের স্বভাব নহে। সিপাহীযুদ্ধের মত নিতান্ত আধুনিক ঘটনা সম্বন্ধেও এদেশের লোক কোন্ কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য বোধ করে নাই। তৎকালবর্ত্তী

প্রাচীন লোক যাঁহারা বর্ত্তমান আছেন. তাঁহাদেরও স্মৃতিশক্তির উপর কোন ঐতিহাসিক সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন না। ইংরাজীতে এই একটা ঘটনা লইয়া এত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে যে, তাহাতে একটা লাইব্রেরী হয়। রজনীকান্ত তাঁহার উৎকৃষ্ট লাইব্রেরীতে বৈদেশিকের লিখিত এই সমস্ত গ্রন্থই প্রায় সংগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু স্বদেশীয়ের নিকট তিনি কোন সাহায্যই পান নাই। রজনীকান্ত যাঁহাদের রচিত ইতিহাসের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কথার উপরেই তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, তিনি যে বিষয়ের আলোচনায় হাত দিয়াছিলেন, সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ বর্ত্তমান সময়ে দুঃসাহসের কাজ। ঝাঁসীর রাণী, কুমারসিংহ ও নানা সাহেবের সম্বন্ধে তিনি কথা কহিতে সাহস করিয়াছিলেন। তিনি কেমন নির্ভীকভাবে কথা কহিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পাঠকবর্গ অবগত আছেন। তিনি তাঁহার বন্ধুগণ কর্ত্তৃক ও তাঁহার পরিচিত উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক তাঁহার মনের আবেগ সংযত করিতে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু কেহ তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারেন নাই। দরিদ্র বাঙ্গলা-গ্রন্থজীবী গৃহস্থের পক্ষে ইহা সামান্য কথা নহে।

জাতীয়ভাবের রক্ষণ ও পরিপুষ্টি রজনীকান্তের মূলমন্ত্র ছিল। দুর্ব্বলের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। আমাদের আত্মসম্মান-রক্ষার অন্য উপায় নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের স্বজাতির মধ্যে, আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে, আমাদের পদস্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে—এই আত্মসম্মান-বুদ্ধির নিতান্ত অসদ্ভাব। রজনীকান্ত যেমন এক দিকে আমাদের জাতীয় চরিত্রের কলঙ্ককালিমা প্রক্ষালিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, অন্য দিকে আমাদের প্রাচীনকালের মহাপুরুষগণের চরিত্রের চিত্র উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়া স্বজাতির গৌরবখ্যাপনের সহিত জাতীয় ভাবের উদ্দীপনা করিয়া আপনাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা

করিতে শিখাইতেছিলেন। তাঁহার আর্য্যকীর্ত্তি, ভারতকাহিনী, প্রবন্ধ-মঞ্জরী প্রভৃতি ক্ষুদ্র পুস্তিকা ঐ উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল। বিদ্যালয়স্থিত বালকগণের মনে ও জনসাধারণের মনে এই স্বজাতির প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি ও অনুরাগ উদ্রেক করিবার চেষ্টা রজনীকান্তের পূর্ব্বে আর কেহই করেন নাই। "আমাদের জাতীয়ভাব" "আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়" "হিন্দুর আশ্রমচতুষ্টয়" "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর" প্রভৃতি উপলক্ষ করিয়া তিনি সাধারণসভায় যে সকল প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়াছিলেন, জাতীয় ভাবের ও জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের উদ্দীপনাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তিনি এ স্থলে অগ্রণী ও পথ-প্রদর্শক।

রজনীকান্তের প্রদর্শিত পথে আজকাল অনেকেই চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বৈদেশিকের বর্ণিত স্বদেশের কাহিনী বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করা উচিত নহে, এইরূপ একটা ভাব আমাদের স্বদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে সম্প্রতি উপস্থিত হইয়াছে। কতিপয় কৃতবিদ্য লোকে ইংরাজ ইতিহাসলেখকগণের রচনার স্বাধীন সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। রজনীকান্তের পন্থানুবর্ত্তীর আজকাল অভাব নাই; কিন্তু একটা বিষয়ে এখনও রজনীকান্ত অদ্বিতীয় রহিয়াছেন। ইহা রজনীকান্তের ভাষা। তাঁহার ঐতিহাসিক প্রবন্ধে তিনি যে ওজস্বিনী ভাষার অবতারণা করিয়াছিলেন, তেমন ভাষায় কথা কহিতে অপরে সমর্থ হন নাই। তাঁহার ভাষা, তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলি, সাধারণের নিকটে প্রতিপত্তির অন্যতম কারণ। উপরে যে আন্তরিকতা ও সহৃদয়তাকে তাঁহার বিশিষ্ট গুণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, সেই আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা হইতে এই ভাষা উৎপন্ন। তাঁহার মনের আবেগ, বর্ণিত বিষয়ের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ, সেই ভাষায় স্বভাবতঃ প্রকাশ পাইত; তাঁহার মর্ম্ম হইতে সেই ভাষা বহির্গত হইয়া পাঠকের মর্ম্মে গিয়া প্রতিহত হইত। ভাষার বিশুদ্ধির দিকে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।

বাঙ্গলা রচনায় সংস্কৃত ব্যাকরণের কঠোর নিয়ম পালন করা উচিত কি না, এ বিষয়ে তাঁহার মত সম্পূর্ণ উদার ও অসংকীর্ণ ছিল। তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের সর্ব্বতোভাবে অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন না, অথচ তিনি স্বয়ং যেরূপ মার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ ভাষার ব্যবহার করিতেন, তাহা বাঙ্গলা লেখকগণের মধ্যে দুই এক জন ব্যতীত আর কেহ করিয়াছিলেন কি না, জানি না। কিন্তু বিশুদ্ধি-রক্ষার জন্য এই প্রয়াস তাঁহার রচনাকে কখনও কৃত্রিমতাদুষ্ট করে নাই। তাঁহার আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা তাঁহাকে এই দোষ হইতে রক্ষা করিয়াছিল। ভাষাকে তিনি কেবলমাত্র ভাবপ্রকাশের উপায়স্বরূপ মনে করিতেন না। এই কারণে তাঁহার রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি সাহিত্যের শরীর পোষণ করিবে; সাহিত্যমধ্যে উহারা আসন লাভ করিবে। সে স্থান কত উচ্চ, তাহার নির্ণয়ের কাল এখনও উপস্থিত হয় নাই। বঙ্গ-সাহিত্যের বর্ত্তমান দরিদ্র অবস্থায় বাঙ্গলায়-লিখিত অন্য কোন ঐতিহাসিক প্রবন্ধের সম্বন্ধে এতটুকু বলা যাইতে পারে কি না, সন্দেহস্থল।

বঙ্গসাহিত্যের সেবা রজনীকান্তের জীবনের মুখ্যতম ব্রত ছিল; তিনি আপন ক্ষমতানুসারে সেই ব্রত যথাসাধ্য পালন করিয়াছেন; এবং সেই ব্রতের পালনেই আপনার সমগ্র শক্তি অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। জীবনে তিনি আর কোন কাজই করেন নাই। তাঁহার অপেক্ষা প্রতিভাশালী লেখক বঙ্গদেশে অনেক জন্মিয়াছেন; বঙ্গসাহিত্যে তাঁহাদের স্থান অনেক উচ্চে অবস্থিত; তাঁহাদের কার্য্যের সহিত তৎকৃত কার্য্যের তুলনায় কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু একমাত্র বঙ্গ-সাহিত্যের, সুতরাং বঙ্গমাতার সেবাব্রতে সমগ্র জীবন উদ্‌যাপনের উদাহরণ অধিক আছে কি না, জানি না। এই অনুরক্ত সন্তানের অকাল-মরণে দরিদ্রা বঙ্গমাতা সন্তাপিত হইবেন, তাহাতে সংশয় নাই।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩০৭। } শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

আর্য্যকীর্ত্তি।

কুম্ভ।

রাজস্থানের মিবার-ভূমি যথার্থ বীরকুল-প্রসবিনী। মিবারের রাণা কুম্ভ যথার্থ বীরপুরুষ। শত্রুর রাজ্যে যে কোন প্রকারে বিজয়পাতাকা উড়াইয়া দেওয়াই প্রকৃত বীরত্বের লক্ষণ নহে; দেশকালপাত্র বিবেচনা না করিয়া যেখানে সেখানে তরবারির আস্ফালন করাও প্রকৃত বীরত্বের পরিচয় নহে; ন্যায় ও ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া পরাক্রান্ত প্রতিপক্ষের স্বাধীনতা হরণ করাও প্রকৃত বীরত্বের চিহ্ন নহে। যখন দেখিব, কোনও বলিষ্ঠ ব্যক্তি, একটি বলিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নেতা হইয়া, গোপনে নিরস্ত্র বিপক্ষকে সংহার করিতেছে; অসময়ে অতর্কিত-ভাবে অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া সর্ব্বত্র ভয় ও আতঙ্কের বিস্তারে উদ্যত হইতেছে; ন্যায়ের উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া, নরশোণিতস্রোতে চারিদিক্ রঞ্জিত করিয়া তুলিতেছে; তখন আমরা তাহাকে প্রকৃত বীরপুরুষ না বলিয়া, গোঁয়ার বা ক্রূর, সাধুজনের এই বিগর্হিত বিশেষণে বিশেষিত করিব। প্রকৃত বীরপুরুষ কখন এমন হীনতা দেখাইতে অগ্রসর

হয়েন না; তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা উচ্চভাবে পূর্ণ থাকে। তিনি যুদ্ধস্থলে যেমন বীরত্বের পরিচয় দেন, অন্য সময়ে তেমনি কোমলতা দেখাইয়া সকলের প্রীতিসাধন করিয়া থাকেন। কিছুতেই তাঁহার মহত্ত্ব হীনতা-পঙ্কে ডুবিয়া যায় না। ঘোরতর বিঘ্নবিপত্তি উপস্থিত হইলেও, আপনার অভীষ্টসাধন জন্য তিনি কখনও ন্যায় ও ধর্ম্মের অবমাননা করেন না। প্রকৃত বীরপুরুষ সর্ব্বদা সংযতভাবে আপনার পরিশুদ্ধ ধর্ম্মরক্ষা করিতে তৎপর থাকেন। মিবারের রাজপুতগণ এইরূপ বীরপুরুষ ছিলেন। ভারতবর্ষে অনেক বীরপুরুষ আপনাদের বীরত্ব কলঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু রাজপুতের বীরত্বে কখনও কলঙ্কের ছায়াপাত হয় নাই। রাজপুতবীর সর্ব্বদা অকলঙ্কিত-ভাবে অতুল বীরত্বকীর্ত্তি রক্ষা করিয়াছেন।

কৃতজ্ঞতা, আত্মসম্মান ও বিশ্বস্ততা, রাজপুত বীরের সমুদয় ধর্ম্মের ভিত্তি। একজন রাজপুতকে জিজ্ঞাসা কর, পৃথিবীর মধ্যে সকলের অপেক্ষা গুরুতর পাপ কি। সে তখনি উত্তর করিবে যে, "গুণচোর" ও "সৎচোর" হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ। অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির নাম "গুণচোর" আর অবিশ্বস্তের নাম "সৎচোর"। যে গুণচোর ও সৎচোর হয়, রাজপুতের মতে, সে যমরাজ্যে অশেষ যাতনা ভোগ করিয়া থাকে। মিবারের এইরূপ বীরপুরুষের পবিত্র চরিত্রের কথা বিবৃত হইতেছে। বীরত্বের রুদ্রমূর্ত্তি ও মাধুর্য্যের কমনীয় কান্তি কিরূপে একাধারে অবস্থিতি করে, তাহা এই কথায় জানা যাইবে।

রাণা কুম্ভের চরিত্র এইরূপ উন্নতভাবে পরিপূর্ণ। কুম্ভ ১৪১৯ খ্রীষ্টাব্দে মিবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সাহস, পরাক্রম ও শাসনদক্ষতায় এই ক্ষত্রিয় বীর মিবারের ইতিহাসে সবিশেষ প্রসিদ্ধ। কুম্ভ প্রায় পঞ্চাশ বৎসরকাল মিবারের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু তিনি চিরকাল শান্তিসুখ ভোগ করিতে পারেন নাই। দেশে স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য তাঁহাকে

কুম্ভ ও মালবরাজ।

পরাক্রান্ত বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। খিলজীবংশীয় রাজাদিগের পরাক্রম খর্ব্ব হইয়া আসিলে, কয়েকটি মুসলমান-রাজ্য দিল্লীর অধীনতার উচ্ছেদ করিয়া স্বাধীন হয়। ঐ সকলের মধ্যে মালব ও গুজরাট প্রধান ছিল। কুম্ভ যখন মিবারের সিংহাসন গ্রহণ করেন, তখন ঐ দুই প্রদেশের অধিপতিদ্বয় সবিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন। ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে এই দুই ভূপতি একত্র হইয়া বহুসংখ্য সৈন্যের সহিত মিবার আক্রমণ করেন। কুম্ভ একলক্ষ সৈন্য ও চৌদ্দ শত হস্তী লইয়া স্বদেশ রক্ষায় প্রস্তুত হয়েন। মিবারের প্রান্তভাগে—মালবরাজ্যের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে—উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই মহাযুদ্ধে বিপক্ষদিগের পরাজয় হয়; বীরভূমি মিবারের স্বাধীনতা অটল থাকে। মালবের অধিপতি শেষে কুম্ভের বন্দী হয়েন। এই সময়ে মহাবীর কুম্ভের পবিত্র চরিত্রের সৌন্দর্য্য বিকাশ পায়। কুম্ভ পরাজিত শত্রুর প্রতি অসৌজন্য দেখাইলেন না। তিনি বীরধর্ম্ম ও বীরপদ্ধতি অনুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; বিজয়লক্ষ্মীর প্রসাদলাভের আশায় পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন; শেষে বিজয়ী হইয়া সেই বীরধর্ম্মের অবমাননা করিলেন না। কুম্ভ প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় পরাজিত ও পদানত শত্রুর সম্মান রক্ষা করিলেন। মালবরাজকে কেবল বন্দীর অবস্থা হইতে মুক্ত করিলেন না, প্রত্যুত অনেক অর্থ দিয়া স্বরাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন। বীরপুরুষের চরিত্র এইরূপ মহত্ত্ব ও উদারতায় পূর্ণ।

রায়মল্ল।

মিবারের অধিপতি রায়মল্লের চরিত্র দেবভাবে পূর্ণ। এই দেবভাব আজ পর্য্যন্ত মিবারের ইতিহাস উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। যদি স্বার্থত্যাগের কোন মহৎ উদ্দেশ্য থাকে; বংশের পবিত্রতা রক্ষার জন্য যদি কোনরূপ স্থির প্রতিজ্ঞা থাকে; প্রকৃত বীরত্বের নিদর্শন-স্বরূপ যদি হৃদয়ের কোনরূপ তেজস্বিতা থাকে; তাহা হইলে মিবারের রায়মল্ল প্রকৃতপক্ষে ঐরূপ মহৎ উদ্দেশ্য রক্ষা করিয়াছেন,—ঐরূপ স্থির প্রতিজ্ঞা দেখাইয়াছেন এবং তেজস্বিতায় বীরত্বের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। দিমস্থিনিস্ * অদ্বিতীয় বাগ্মী না হইতে পারেন; বাল্মীকি অদ্বিতীয় কবি বলিয়া খ্যাতি লাভ না করিতে পারেন; হাউয়ার্ড † অদ্বিতীয় হিতৈষী বলিয়া সাধারণের নিকট সম্মানিত না

---

* দিমস্থিনিস্ গ্রীস দেশের সর্ব্বপ্রধান বক্তা। ইঁহার পিতা এথেন্স নগরে তরবারির ব্যবসায় করিতেন। খ্রীষ্টের জন্মগ্রহণের ৩৮০ বৎসর পূর্ব্বে দিমস্থিনিসের জন্ম হয়। শৈশবকালে পিতৃহীন হওয়াতে দিমস্থিনিস্ প্রথমে ভালরূপ লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন নাই। সতর বৎসর বয়সে তিনি বক্তৃতার প্রণালী শিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন। ক্রমে এ বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা পরিস্ফুট হয়। ক্রমে তিনি প্রাচীন সময়ে অদ্বিতীয় বাগ্মী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

† জন হাউয়ার্ড ১৭২৬ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী হাক্‌নে নামক স্থানে জন্ম-গ্রহণ করেন। ভূমিকম্পে লিস্‌বন নগরের কিরূপ অবস্থান্তর ঘটিয়াছিল, তাহা দেখিবার জন্য হাউয়ার্ড ১৭৫৬ অব্দে তথায় যাইতেছিলেন, ঘটনাক্রমে তাঁহাদের জাহাজ ফ্রান্সে নীত হয়। হাউয়ার্ড ফরাসীদেশের কারাগারে অবরুদ্ধ হন। কারাগারের দূষিত প্রণালী প্রযুক্ত এই সময়ে কয়েদীদিগকে যাতনার একশেষ ভুগিতে হইত। হাউয়ার্ডকেও এইরূপ যন্ত্রণাভোগ করিতে হয়। এই অবধি হাউয়ার্ড কারা-লয়ের দূষিত প্রণালীর সংস্কারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। তিনি মুক্তিলাভ করিয়া স্বদেশে আসিয়া এ বিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত করেন। হাউয়ার্ড ইউরোপের প্রধান নগরের কারাগার দেখিয়া কয়েদীদিগের অবস্থা বর্ণনা করেন। তিনি লোকহিতৈষী ছিলেন। সংক্রামক রোগাক্রান্তদিগকেও নিজে দেখিতে ত্রুটি করিতেন না। এক সময়ে হাউয়ার্ড একটি সংক্রামক জ্বররোগীকে দেখিতে গমন করেন। ইহাতে তাঁহার ঐ রোগ জন্মে, উহাতেই ১৭৯০ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

হইতে পারেন ; রায়মল্ল তেজস্বীদিগের মধ্যে অদ্বিতীয়। রায়মল্লের ন্যায় কেহই লোকাতীত মহাপ্রাণতা দেখাইতে পারেন নাই এবং রায়মল্লের ন্যায় কেহই পাপের রাজ্যে পুণ্যের আলোক বিস্তার করিয়া, মহত্ত্বের পরিচয় দিতে সমর্থ হন নাই। জগতের ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত আর কোন স্থলে এরূপ আর একটী দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারে নাই। রোমের ব্রূতস্ * অপরাধী পুত্রকে ঘাতকের হস্তে সমর্পণ করিয়া জগতের সমক্ষে স্বার্থত্যাগ ও ন্যায়বুদ্ধির মহান্ ভাব দেখাইয়াছেন ; মিবারের রায়মল্ল অপরাধী পুত্রের হত্যাকারীকে পুরস্কৃত করিয়া উহা অপেক্ষা অধিকতর উচ্চ ভাবের পরিচয় দিয়াছেন।

চারি শত বৎসরের অধিক কাল হইল, বীরভূমি রাজপুতনার একটি লাবণ্যবতী অপূর্ণযুবতী অশ্বারোহণে কোন স্থানে যাইতেছিলেন। অশ্বারোহিণীর যুদ্ধবেশ। ঐ বেশে বালিকা অকুতোভয়ে তীরবেগে অশ্বচালনা করিতেছিলেন। বালিকার সে সময়ের ভীষণ ও মধুর মূর্ত্তি চারিদিকে অপূর্ব্ব প্রভাব বিকাশ করিতেছিল। দূর হইতে একটি ক্ষত্রিয় যুবক এই মনোমোহিনী কান্তি দেখিতে পাইলেন। এই যুবকও অশ্বারূঢ় ও যুদ্ধবেশধারী। মধুরে মধুরে মিলন হইল। অপূর্ব্ব ভীষণ ভাবের সহিত ভীষণতা মিলিয়া গেল। অশ্বারূঢ় যুবক অশ্বারোহিণীর অনুপম লাবণ্যরাশি, অপূর্ব্ব অশ্বচালনাকৌশল দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন।

---

* ব্রূতস্ রোমের প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। রোমে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে, ব্রূতস্ ও কালেতিনস উভয়েই প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। ইঁহাদের উপাধি "কন্সল" হয়। এই সময়ে রোমের সাধারণতন্ত্রের উচ্ছেদের জন্য অনেকে ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত হন। ইহাদের মধ্যে ব্রূতসের দুই পুত্র এবং কালতিনসের তিন ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ইঁহাদের বিচার হয়। কালতিনস্ ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের প্রতি স্নেহ প্রযুক্ত অপেক্ষাকৃত লঘু দণ্ড দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রূতস্ আপনার পুত্রদিগের প্রতি মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়া অপক্ষপাতের পরিচয় দেন।

এই স্থির সৌদামিনী, যুবকের হৃদয়ে যুগপৎ আশা ও নৈরাশ্যের সূত্রপাত করিল। যুবক উহার ঘাতপ্রতিঘাতে অধীর হইয়া পড়িলেন। পাঠক! ইহা উপন্যাসের ভূমিকা নহে; কল্পনার অপূর্ব্ব কাহিনী নহে; ইহা ইতিহাসের কথা। এই যুবক কে? মিবারের ক্ষত্রকুলসূর্য্য মহারাজ রায়মল্লের কনিষ্ঠ পুত্র জয়মল্ল! আর বিদ্যুচ্চঞ্চল অশ্বের আরোহিণী কে? টোডার অধিপতি রাও সুরতনের কন্যা তারাবাই। বাপ্পারাওর বংশধর আজ এই যুদ্ধবেশধারিণী, লাবণ্যময়ী মূর্ত্তির লাবণ্যসাগরে মগ্ন হইলেন।

মহারাজ রায়মল্লের পুত্র তারাবাইর পাণিগ্রহণের অভিলাষী হইলেও রাও সুরতন সহসা তাঁহার আশা পূর্ণ করিলেন না। লিল্লানামক এক্ জন দুরন্ত পাঠান, রাও সুরতনকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া টোডা অধিকার করিয়াছিল। সুরতন নিষ্কাশিত হইয়া কন্যারত্নের সহিত মিবার রাজ্যের অন্তর্গত বেদনোরে গিয়া বাস করিতেছিলেন। সুরতনের প্রতিজ্ঞা ছিল, যিনি বাহুবলে টোডা অধিকার করিতে পারিবেন, বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি তারাবাই তাঁহারই করে সমর্পিত হইবেন। এ প্রতিজ্ঞা রাজপুতের উপযুক্ত। যাঁহারা বসুন্ধরাকে বীরভোগ্যা বলিয়া উল্লেখ করেন, এ প্রতিজ্ঞাবাক্য সেই বীরপুরুষদিগের মুখেই শোভা পায়। জয়মল্ল, রাও সুরতনের কন্যারত্নের অভিলাষী হইয়া, টোডা অধিকার করিতে যাত্রা করিলেন; পাঠানের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। কিন্তু জয়মল্ল সুরতনের কথা রাখিতে পারিলেন না। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া,তিনি ফিরিয়া আসিলেন। পাঠানের পরাক্রমে পরাভূত হইলেও রাজপুত-কলঙ্ক লজ্জিত হইলেন না। শত্রুর সম্মুখে যুদ্ধস্থলে দেহত্যাগ করা তিনি কর্ত্তব্যের মধ্যে গণনা করিলেন না। তাঁহার হৃদয়ে তারার মনোমোহিনী মূর্ত্তি জাগিতেছিল; তিনি পরাজিত হইলেও অম্লানভাবে বেদনোরে গিয়া অবৈধরূপে সেই লাবণ্-

ময়ী ললনাকে অধিকার করিতে উদ্যত হইলেন। এ অপমান রাও সুরতন সহিতে পারিলেন না। রাজপুতের হৃদয় উত্তেজিত হইল। এ উত্তেজনা অমনি তিরোহিত হইল না। রাও সুরতন জয়মল্লকে নিহত করিয়া, আপনার সম্মান রক্ষা করিলেন। রাজপুতের অসি রাজপুত-কলঙ্কের শোণিতে রঞ্জিত হইল।

ক্রমে মিবারে এ সংবাদ পঁহুছিল। ক্রমে মিবারের গৃহে গৃহে এ সংবাদ লইয়া আন্দোলন হইতে লাগিল। এ ভয়ানক সংবাদ মহারাজ রায়মল্লকে শুনাইবে কে? বাপ্পারাওর সন্তানের শোণিতে রাও সুরতনের হস্ত কলঙ্কিত হইয়াছে; তাঁহাকে আজ রক্ষা করিবে কে? সকলেই ভাবিতে লাগিল, আর সুরতনের পরিত্রাণ নাই। রায়মল্লের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র, কনিষ্ঠ সহোদরের পরাক্রমে অজ্ঞাতবাস করিতেছিলেন; দ্বিতীয় পুত্র ঔদ্ধত্যপ্রযুক্ত পিতার আদেশে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন; কেবল এক জয়মল্লই পিতার হৃদয়রঞ্জন ছিলেন। আজ সেই হৃদয়রঞ্জন কুসুম বৃন্তচ্যুত হইল। হায়! আজ নিদারুণ শোকে রায়মল্ল অধীর হইবেন। তাঁহাকে সুস্থির করিবে কে? মিবারের রাজপুতেরা ইহা ভাবিয়া ম্রিয়মাণ হইল। কথা আর দীর্ঘকাল গোপনে রহিল না। অবিলম্বে উহা মহারাজ রায়মল্লের শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইল। রায়মল্ল ধীরভাবে সমস্ত শুনিলেন; অকস্মাৎ তাঁহার ধীরতার ব্যতিক্রম হইল; অকস্মাৎ তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত ও নেত্রদ্বয় আরক্ত হইয়া উঠিল। প্রাণাধিক পুত্রের শোচনীয় পরিণামে তিনি কাতর হইলেন না। রায়মল্ল অকাতর-ভাবে বজ্রগম্ভীর-স্বরে বলিলেন,—"যে কুলাঙ্গার পুত্র পিতার সম্মান নষ্ট করিতে উদ্যত হয়, তাহার এইরূপ শাস্তিই প্রার্থনীয়। সুরতন কুলাঙ্গারকে সমুচিত শাস্তি দিয়া ক্ষত্রোচিত কার্য্য করিয়াছেন।" মহারাজ রায়মল্ল ইহা কহিয়া, পুত্রহন্তা রাও সুরতনকে ক্ষত্রিয়কুলোচিত পুরস্কার-স্বরূপ বেদনোর রাজ্য সমর্পণ করিলেন।

প্রকৃত বীরের চরিত্র এইরূপ উচ্চভাবে পূর্ণ। প্রকৃত বীর এইরূপ মহাপ্রাণতা ও তেজস্বিতায় অলঙ্কৃত।

বীরবালক ও বীর-রমণী।

(পুত্ত—কর্ম্মদেবী, কমলাবতী, কর্ণবতী)

১৫৬৮ খ্রীঃ অব্দে পরাক্রান্ত মোগলসম্রাট্ আক্‌বর শাহ যখন চিতোর নগর আক্রমণ করেন, স্বাধীনতাপ্রিয় বীরগণ যখন অম্লানবদনে গরীয়সী জন্মভূমির জন্য রণভূমির ক্রোড়শায়ী হয়েন, রাজপুত-কুলগৌরব জয়মল্ল যখন শত্রুর হস্তে নিহত হয়েন, ষোড়শবর্ষীয় পুত্ত যখন অসীম উৎসাহে স্বাধীনতার জয়পতাকা উড়াইয়া শত্রুর সম্মুখে আইসেন, তখন বীরভূমি চিতোরের তিনটি বীরাঙ্গনা, স্বদেশের জন্য আত্মপ্রাণের উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কোমল দেহে কঠিন বর্ম্ম পরিয়া, কোমল হস্তে কঠোর অস্ত্র ধরিয়া, মোগলসেনার গতিরোধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। এই ললনাত্রয় শত্রুনিপীড়িত রাজস্থানের প্রকৃত বীরাঙ্গনা; মূর্ত্তিমতী স্বাধীনতা; আত্মত্যাগের অদ্বিতীয় দৃষ্টান্তস্থল।

পরাক্রান্ত জয়মল্ল স্বর্গে গিয়াছেন। অন্যায় সমরে পুরুষসিংহ অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। বীরভূমি বীরশূন্য হইয়াছে। চিতোর রক্ষা করিবে কে? মোগল দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে বাধা দিবে কে? স্বাধীনতার লীলাভূমি পরাধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতেছে, এ দুর্ব্বহ নিগড় ভাঙ্গিবে কে? বীরভূমি আজ হতাশ ও হতোদ্যম। এ সময়ে একটি বীরবালক গরীয়সী জন্মভূমির জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত

হইল।' জয়মল্ল জন্মের মত চিতোর হইতে বিদায় লইয়াছেন ; তাঁহার অভাবে চিতোর শূন্য হইয়াছে ; পুত্ত এই শূন্য স্থান পূরণ করিলেন। পুত্তের বয়স ১৬ বৎসর। বয়সে তিনি বালক ; সাহসে, বিক্রমে ও ক্ষমতায় তিনি বর্ষীয়ান্ পুরুষ। পুত্ত মাতার নিকটে বিদায় লইলেন। কর্ম্মদেবী আশ্বস্তহৃদয়ে প্রিয়তম পুত্রকে যুদ্ধস্থলে যাইতে কহিলেন। পুত্ত প্রিয়তমার নিকটে গেলেন, কমলাবতী প্রফুল্লহৃদয়ে প্রাণাধিক স্বামীকে বিদায় দিলেন ; ভগিনী কর্ণবতী জন্মভূমির রক্ষার নিমিত্ত সহোদরকে উত্তেজিত করিলেন। ষোড়শবর্ষীয় বালক—চিতোরের অদ্বিতীয় বীর, জন্মের মত বিদায় লইয়া অসীম উৎসাহসহকারে পবিত্র কার্য্যসাধনের জন্য পবিত্র ভূমিতে উপস্থিত হইলেন। মোগলসেনা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। আক্‌বর এক ভাগের সেনাপতি হইয়াছিলেন। অন্য ভাগ আর একজন বিচক্ষণ যোদ্ধার অধীনে ছিল ; দ্বিতীয়দলের সহিত পুত্তের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সম্রাট্ অপর দিক্ হইতে পুত্তকে বাধা দিবার জন্য আসিতে লাগিলেন।

বেলা দুই প্রহর। এই সময়ে সহসা আক্‌বরের সৈন্য যুদ্ধস্থলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল ; তাহারা পুত্তের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, সহসা তাহাদের গতিরোধ হইল। সম্মুখে সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্ম ; গিরিবর্ত্মের পুরোভাগে দুই একটি শ্যামলপত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ। ঐ বৃক্ষের পশ্চাদ্ভাগ হইতে গুলির পর গুলি আসিয়া মোগল-সৈন্যের ব্যূহ ভেদ করিতে লাগিল। মোগলেরা স্তম্ভিত হইল! এদিকে অনবরত গুলি আসিতেছিল ; অনবরত গুলির আঘাতে সৈনিকগণ রণভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইতেছিল! আক্‌বর সবিস্ময়ে দেখিলেন, তিনটি বীরাঙ্গনা গিরিবর্ত্ম আশ্রয় করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে। একটি বর্ষীয়সী ; আর দুইটি ঈষৎ উদ্ভিন্ন কমলদলের ন্যায় অপূর্ব্বযুবতী! তিনটিই অশ্বে আরূঢ়, তিনটিই দুর্ভেদ্য কবচে আবৃত এবং তিনটিই অস্ত্রচালনায় সুদক্ষ। মধুরতার সহিত

ভীষণতার এইরূপ সংমিশ্রণ দেখিয়া অকবরের হৃদয় বিচলিত হইল। এই তিনটি বীরাঙ্গনার পরাক্রমে তাঁহার বহুসংখ্য সৈন্যের গতিরোধ হইয়াছে; ইহাদের অব্যর্থ সন্ধানে বহু সৈন্য রণস্থলে দেহত্যাগ করিতেছে; ইহা দেখিয়া ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাট্ ক্ষোভে ও লজ্জায় অধোবদন হইলেন।

এদিকে তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল; তুমুল যুদ্ধে কর্ম্মদেবী, কমলাবতী ও কর্ণবতী আপনাদের লোকাতীত পরাক্রম দেখাইতে লাগিলেন। ষোড়শবর্ষীয় পুত্র—স্নেহের একমাত্র অবলম্বন, প্রবল শত্রুর সহিত একাকী যুদ্ধ করিবে, ইহা কর্ম্মদেবী স্থিরচিত্তে দেখিতে পারেন না; প্রিয়তম স্বামী—পবিত্র প্রেমের অদ্বিতীয় আস্পদ, একাকী শত্রুর অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইবে, একাকী গরীয়সী জন্মভূমির জন্য প্রাণত্যাগ করিবে, ইহা কমলাবতী প্রাণ থাকিতে সহিতে পারেন না; ভালবাসার ও প্রীতির আশ্রয়-ভূমি সহোদর পবিত্রকার্য্যের জন্য দেহ ত্যাগ করিবে, দুরন্ত শত্রু স্বদেশের স্বাধীনতা হরণ করিয়া লইবে, ইহা কর্ণবতী নীরবে দেখিতে পারেন না; পুত্র মোগলসৈন্যের এক দল আক্রমণ করিয়াছেন; আক্‌বর আর এক দল লইয়া পুত্রের বিরুদ্ধে যাইতেছেন; কর্ম্মদেবী, কমলাবতী ও কর্ণবতী হঠাৎ ঐ সৈনিক দলের গতি রোধ করিলেন; তুচ্ছ প্রাণের মমতা ছাড়িয়া স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য শত্রুর ব্যূহভেদে দণ্ডায়মান হইলেন।

এক দিকে ষোড়শবর্ষীয় পুত্র, আর এক দিকে তাঁহার বর্ষীয়সী জননী এবং অপূর্ণবয়স্কা প্রণয়িনী ও সহোদরা। চিতোরের বীর্য্যবহ্নির এই তিনটি উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গ দিল্লীর সম্রাটের সৈন্য ছারখার করিতে উদ্যত।

ঝটিকা বহিতে লাগিল। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তিনটি বীরাঙ্গনার গুলির আঘাতে মোগলসৈন্য নষ্ট হইতে লাগিল। দুই প্রহর হইতে সন্ধ্যা

পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিল, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। দুই প্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বীর্য্যবতী বীরাঙ্গনা দুরন্ত শত্রুর গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। ইঁহাদের অস্ত্রচালনায় অনেক সৈন্য নষ্ট হইল। অকবর প্রকৃত বীরপুরুষ। তিনি এই তিনটি বীরাঙ্গনার বীরত্বে মোহিত হইলেন। এই বীরত্বের যথোচিত সম্মান করিতে তাঁহার আগ্রহ জন্মিল। তিনি ঘোষণা করিলেন, যে বীরাঙ্গনা তিনটিকে জীবিত অবস্থায় ধরিয়া আনিতে পারিবে, তাহাকে বহু অর্থ পারিতোষিক দেওয়া যাইবে। কিন্তু সকলে তখন যুদ্ধে উন্মত্ত ছিল, সম্রাটের এ কথায় কোন ফল হইল না। মোগলেরা জ্ঞানশূন্য হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। তিনটি বীররমণী অসীমসাহসে তাহাদের আক্রমণে বাধা দিতে লাগিলেন। সহসা কর্ণবতীর শরীর অবশ হইল, সহসা কর্ণবতী বৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। কর্ম্মদেবীর দৃক্‌পাত নাই; প্রাণাধিক দুহিতাকে ভূতলশায়িনী দেখিয়াও কর্ম্মদেবী কাতর হইলেন না। তিনি অকাতরভাবে, অবিচলিতহৃদয়ে শত্রুপক্ষের উপর গুলি বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। উহার মধ্যে একটি গুলি আসিয়া কমলাবতীর বাম হস্তে প্রবেশ করিল। ভীষণ আঘাতে কমলাবতী প্রথমে টলিলেন না; স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া বিপক্ষ সৈন্য নষ্ট করিতে লাগিলেন। মোগলেরা উন্মত্ত; গুলির উপর গুলি বৃষ্টি করিতে লাগিল। যখন কমলাবতী ও কর্ম্মদেবী, উভয়ে ভূতলশায়িনী হইলেন, তখন পুত্ত সম্রাটের সৈন্য পরাজিত করিয়া গিরিবর্ত্মের নিকটে আসিলেন। তাঁহার আরাধ্যা জননী, প্রিয়তমা প্রণয়িনী ও প্রাণাধিকা সহোদরার দেহ যুদ্ধস্থলে বিলুণ্ঠিত হইতেছিল। পুত্ত ইহা দেখিলেন, দেখিয়া দুরন্ত মোগলসৈন্যের অনেককে নষ্ট করিলেন। এদিকে কমলাবতী ও কর্ম্মদেবীর বাক্‌রোধ হইয়া আসিতে- ছিল। পুত্ত বাহু প্রসারণ করিয়া, ইঁহাদিগকে তুলিয়া লইলেন; কমলাবতী ধীরভাবে

প্রাণকান্তের দিকে চাহিলেন; ধীরভাবে পতিপ্রাণা সাধ্বী সতী প্রাণেশ্বরের বাহুমূলে মাথা রাখিয়া, অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। কুর্ম্মদেবী প্রিয়তম পুত্রকে আবার যুদ্ধ করিতে কহিলেন, এবং স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁহাদের সহিত স্বর্গে আসিতে অনুরোধ করিয়া, ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন। পুত্র মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে ভীষণ "হর হর" রবে শত্রুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া, বহু সৈন্য নষ্ট করিয়া, ষোড়শবর্ষীয় বীর জন্মভূমির ক্রোড়ে চিরনিদ্রিত হইলেন। পুত্রের দেহ তদীয় প্রণয়িনীর সহিত এক চিতায় দগ্ধ করা হইল। কর্ম্মদেবী ও কর্ণবৃতীর দেহ আর এক চিতায় শায়িত হইল। ইঁহারা অমরলোকে গমন করিলেন। ভূলোকে ইঁহাদের অনন্ত কীর্ত্তি অক্ষয় হইয়া রহিল।

বীরধাত্রী।

(পান্না)

রাজপুতকুলগৌরব পরাক্রান্ত সংগ্রামসিংহ লোকান্তরিত হইয়াছেন। যিনি সাহসে অবিচলিত ও বীরত্বে অতুল্য ছিলেন, অস্ত্রাঘাতের আশীটি গৌরবসূচক চিহ্ন যাঁহার দেহ অলঙ্কৃত করিয়াছিল, যিনি মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধে ভগ্নপদ ও ছিন্নহস্ত হইয়াও আপনার বীরত্বগৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছে; শত্রুর চক্রান্ত-জালে পড়িয়া, পুরুষসিংহ অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। মিবারের অত্যুজ্জ্বল সূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার শিশু

সন্তান আজ শত্রুর হস্তগত। ভবিষ্য বিপদে অনভিজ্ঞ ষড়্‌বর্ষীয় বালক নিশ্চিন্তমনে আহার-পানে পরিতুষ্ট হইতেছে, নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাইতেছে : এদিকে যে দুরন্ত শত্রু তাহার প্রাণনাশের চেষ্টা পাইতেছে, সরল ও অনভিজ্ঞ শিশু তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। দাসীপুত্র বনবীর * মিবারের সিংহাসন অধিকারের আশায় এই কোমল কোরকটিকে বৃন্তচ্যুত করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়াছে, এই ঘোর বিপদ হইতে আজ পরাক্রান্ত সংগ্রামসিংহের শিশু সন্তান উদয়সিংহকে রক্ষা করিবে কে? বাপ্পারাওর পবিত্র বংশ নির্ম্মূল করিবার ষড়্‌যন্ত্র হইয়াছে; এ বংশের আজ উদ্ধার করিবে কে? আজ একটি অসহায় রমণী এই ঘোরতর বিপদ হইতে উদয়সিংহকে উদ্ধার করিতে অগ্রসর হইতেছে; অনাথ বালক আজ একটি তেজস্বিনী ধাত্রীর আশ্রয়ে থাকিয়া আপনার জীবন রক্ষা করিতেছে। ধাত্রী পান্না আজ অশ্রুতপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগবলে বাপ্পারাওর বংশধরকে জীবিত রাখিতে উদ্যত হইয়াছে!

কি উপায়ে পান্না এই দুষ্কর কার্য্য সাধন করিল, কি উপায়ে পিতৃহীন শিশু অক্ষত-শরীরে রহিল, তাহা শুনিলে হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে। রাত্রিকালে উদয়সিংহ আহার করিয়া নিদ্রিত রহিয়াছেন, এমন সময়ে এক জন নাপিত † আসিয়া ধাত্রীকে জানাইল, বনবীর উদয়সিংহকে হত্যা করিতে আসিতেছে। ধাত্রী তৎক্ষণাৎ একটি ফলের চাঙ্গারীর মধ্যে নিদ্রিত উদয়সিংহকে রাখিয়া এবং উহার উপরিভাগ পত্রাদিতে ঢাকিয়া, উক্ত চাঙ্গারী নাপিতের হস্তে সমর্পন করিল। বিশ্বস্ত নাপিত

* বনবীর সংগ্রামসিংহের ভ্রাতা পৃথীরাজের পুত্র। একটি দাসীর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। উদয়সিংহের বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত বনবীরের হস্তে রাজ্যশাসনের ভার সমর্পিত হইয়াছিল; কিন্তু বনবীর আপনার রাজত্ব অব্যাহত রাখিবার জন্য উদয়সিংহের হত্যায় কৃতসঙ্কল্প হয়।

† রাজস্থানে এই জাতি 'বারি' নামে প্রসিদ্ধ। রাজপুতদিগের উচ্ছিষ্ট মোচন করা ইহাদের কার্য্য।

ধাত্রী পান্না।

বনবীর অসিহস্তে সেই গৃহে আসিয়া ধাত্রীকে উদয়সিংহের কথা জিজ্ঞাসা করিল; ধাত্রী বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না, নীরবে ও অধোমুখে স্বীয় নিদ্রিতপুত্রের দিকে অঙ্গুলি প্রসারণ করিল।

সেই চাঙ্গারী লইয়া কোন নিরাপদ স্থানে গেল। এমন সময়ে বনবীর অসিহস্তে সেই গৃহে আসিয়া ধাত্রীকে উদয়সিংহের কথা জিজ্ঞাসা করিল। ধাত্রী বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না, নীরবে ও অধোমুখে স্বীয় নিদ্রিত পুত্রের দিকে অঙ্গুলি প্রসারণ করিল। বনবীর উদয়সিংহবোধে সেই ধাত্রীপুত্রেরই প্রাণ সংহার করিয়া চলিয়া গেল। এ দিকে রাজবংশীয় কামিনীগণের রোদনধ্বনির মধ্যে সেই ধাত্রীপুত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল। ধাত্রী নীরবে ও অশ্রুপূর্ণনয়নে স্বীয় শিশু সন্তানের প্রেতকৃত্য দেখিয়া নাপিতের নিকটে গমন করিল।

এইরূপে পান্না অবলীলাক্রমে ও অসঙ্কোচে আপনার হৃদয়রঞ্জন শিশুসন্তানকে ঘাতকের হস্তে সমর্পন করিয়া, মহারাণা সংগ্রামসিংহের পুত্রের প্রাণ রক্ষা করিল। যে রমণী চিতোরের জন্য, বাপ্পারাওর বংশরক্ষার নিমিত্ত, জীবনের অদ্বিতীয় অবলম্বন, স্নেহের একমাত্র পুত্তলী, নয়নতারা সন্তানকে মৃত্যুমুখে সমর্পণ করে, তাহার স্বার্থত্যাগ কত দূর মহান্! যে রমণী হৃদয়রঞ্জন কুসুমকোরককে বৃন্তচ্যুত দেখিয়াও আপনার কর্ত্তব্যসাধনে বিমুখ না হয়, তাহার হৃদয় কত দূর তেজস্বিতার পরিপোষক! সাধারণে পান্নাকে রাক্ষসী বলিয়া ঘৃণা করিতে পারে। কিন্তু যথার্থ তেজস্বী ও যথার্থ হিতৈষী পুরুষ এই অসামান্য ধাত্রীকে আর একভাবে চাহিয়া দেখিবে। এই অসাধারণ ভাব সাধারণের আয়ত্ত নয়। অসাধারণ লোকেই উহার গৌরব বুঝিতে সমর্থ।

প্রতাপসিংহের বীরত্ব।

আজ ১৬৩২ সংবতের ৭ই শ্রাবণ। আজ মিবারের রাজপুতগণ 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' জন্মভূমির জন্য আপনাদের প্রাণ দিতে উদ্যত। সম্রাট্ অকবরের বহুসংখ্য সৈন্য রাজা মানসিংহের সহিত মিবার অধিকার করিতে আসিয়াছে। মোগল, সূর্য্যবংশে কলঙ্কের কালিমা দিতে উদ্যত হইয়াছে,—মিবারের বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপসিংহ আজ এই বংশ অকলঙ্কিত রাখিতে উদ্যত। প্রকৃত ক্ষত্রিয় বীর আজ প্রকৃত ক্ষত্রিয়ত্বের গৌরবরক্ষায় কৃতসঙ্কল্প। চিরস্মরণীয় হলদিঘাটে মিবারের আশাভরসা-স্থল বাইশ হাজার রাজপুত বীর একত্র হইয়াছে; প্রতাপসিংহ এই বাইশ হাজার রাজপুতের অধিনেতা হইয়া পরাক্রান্ত মোগলসৈন্যের গতিরোধ করিতে দাঁড়াইয়াছেন।

হলদিঘাট একটি গিরিবর্ত্ম; উহার উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ, প্রায় সকল দিকেই সমুন্নত পর্ব্বত লম্বভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ঐ স্থান পর্ব্বত, অরণ্য ও ক্ষুদ্র নদীতে সমাবৃত। প্রতাপসিংহ ঐ গিরিসঙ্কট আশ্রয় করিয়া মোগলসৈন্যের সম্মুখীন হইয়াছেন। হলদিঘাটের যুদ্ধের দিন রাজপুতবীরের অনন্ত উৎসবের দিন। রাজপুতগণ এই উৎসবে মাতিয়া আপনাদের প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিল এবং একে একে এই উৎসবে মাতিয়া অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল। এই উৎসবে মহাবীর প্রতাপসিংহ সকলের আগে ছিলেন। তিনি প্রথমে আম্বেররাজ মানসিংহের দিকে ধাবিত হয়েন; কিন্তু মানসিংহ দিল্লীর বহুসংখ্য সৈন্যের মধ্যে ছিলেন; প্রতাপ সে সৈন্য ভেদ করিতে পারিলেন না; মেঘগম্ভীর স্বরে মানসিংহকে কাপুরুষ, রাজপুতকুলাঙ্গার বলিয়া তিরস্কার করিলেন। রাজা মানসিংহ প্রতাপের এ তিরস্কারে কর্ণপাত করিলেন

না। যাহা হউক, প্রতাপ নির্ভীকচিত্তে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিন তিন বার মোগলসেনার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিন বার তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। রাজপুতগণ আপনাদের প্রাণ দিয়া তাঁহাকে তিন বার আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করে। রাণার প্রাণরক্ষার জন্য তাহারা আত্মপ্রাণ তুচ্ছ বোধ করিয়াছিল। কিন্তু প্রতাপসিংহ নিরস্ত হইলেন না। তাঁহার শরীরের একস্থানে গুলির আঘাত, তিন স্থানে বড়ষার আঘাত এবং তিন স্থানে অসির আঘাত লাগিয়াছিল। তিনি এইরূপে সাত স্থানে আহত হইয়াছিলেন, তথাপি উন্মত্তভাবে শত্রুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজপুতগণ আবার তাঁহার উদ্ধারের চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাদের অনেকে বীরশয্যায় শয়ন করিয়াছিল। মিবারের গৌরবস্থল বীরগণের প্রায় সকলেই গরীয়সী জন্মভূমির রক্ষার জন্য অসি হস্তে করিয়া অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল। প্রতাপের মস্তকোপরি মিবারের রাজচ্ছত্র শোভা পাইতেছে। সেই ছত্র লক্ষ্য করিয়া, মোগলসৈন্য চারিদিক হইতে প্রতাপকে আক্রমণ করিতে লাগিল। ঐ ছত্র হইতে প্রতাপের জীবন তিন বার সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল, তথাপি প্রতাপ উক্ত রাজলক্ষণ পরিত্যাগ করেন নাই। কিন্তু এবার প্রতাপের উদ্ধারসাধন অসাধ্য বোধ হইল। ঝালাকুলশ্রেষ্ঠ মান্না ইহা দেখিলেন, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে সদলে প্রতাপের নিকটে উপস্থিত হইয়া, সেই রাজচ্ছত্র আপনার মস্তকোপরি ধারণ করিলেন। এই ছত্র দেখিয়া মোগলসৈন্য মান্নাকেই প্রতাপসিংহ মনে করিয়া তৎপ্রতি সবেগে ধাবিত হইল। এবার মোগলের ব্যূহ-ভেদ হইল। প্রতাপসিংহ রক্ষা পাইলেন। কিন্তু বীরবর মান্না আর ফিরিলেন না। তিনি প্রভুর জন্য অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়া, সদলে রণভূমির ক্রোড়শায়ী হইলেন। মোগল সৈন্য রাজপুতের বিক্রম দেখিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল। কিন্তু রাজপুতের জয়লাভ হইল না। মোগলসৈন্য পঙ্গপালের ন্যায় চারিদিক

ছাইয়া ফেলিল, তাহারা হটিল না। চৌদ্দহাজার রাজপুতের শোণিতে হল্‌দিঘাটের ক্ষেত্র রঞ্জিত হইল। প্রতাপ জয়লাভে নিরাশ হইয়া, রণস্থল পরিত্যাগ করিলেন।

এইরূপে হল্‌দিঘাটের সমরের অবসান হয়; এইরূপে চতুর্দ্দশ সহস্র রাজপুত হল্‌দিঘাটরক্ষার্থে অম্লানবদনে, অসঙ্কুচিতচিত্তে আপনাদের জীবন উৎসর্গ করে। হল্‌দিঘাট পরম পবিত্র যুদ্ধক্ষেত্র। কবির রসময়ী কবিতায় উহা অনন্তকাল নিবদ্ধ থাকিবে; ঐতিহাসিকের অপক্ষপাত বর্ণনায় উহা অনন্তকাল ঘোষিত হইবে। প্রতাপসিংহ অনন্তকাল বীরেন্দ্রসমাজের পূজা পাইবেন এবং পবিত্রতর হইয়া অনন্তকাল অমরশ্রেণীতে সন্নিবেশিত থাকিবেন। প্রতাপসিংহ অনুচরবিহীন হইয়া, চৈতক-নামক নীলবর্ণ, তেজস্বী অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক রণস্থল ত্যাগ করেন। এই অশ্বও তেজস্বিতায় প্রতাপের ন্যায় রাজস্থানের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। যখন দুই জন মোগল সর্দ্দার প্রতাপের পশ্চাদ্ধাবিত হয়, তখন চৈতক লম্ফ দিয়া একটি ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য সরিৎ পার হইয়া, স্বীয় প্রভুকে রক্ষা করে; কিন্তু প্রতাপের ন্যায় চৈতকও যুদ্ধস্থলে আহত হইয়াছিল। আহত স্বামীকে লইয়া এই আহত বাহন চলিতে লাগিল। অকস্মাৎ প্রতাপ পশ্চাদ্‌ভাগে অশ্বের পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন; ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার সহোদর ভ্রাতা শক্ত আসিতেছেন। শক্ত প্রতাপের শত্রু; তিনি ভ্রাতৃধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিয়া, মোগলের সহিত মিশিয়াছিলেন। প্রতাপ ক্ষত্রকুলকলঙ্ক সহোদরকে দেখিয়া ক্ষোভে ও রোষে অশ্ব স্থির করিলেন। কিন্তু শক্ত কোনরূপ বিরুদ্ধাচরন করিলেন না। তিনি হল্‌দিঘাটে জ্যেষ্ঠের অলৌকিক সাহস ও ক্ষমতা দেখিয়াছিলেন,—এই অপূর্ব্ব দৃশ্যে তাঁহার হৃদয়ে আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি এখন আর ক্ষত্রিয়শোণিত অপবিত্র না করিয়া সজলনয়নে জ্যেষ্ঠের পদানত হইলেন। প্রতাপ সমুদায় ভুলিয়া গেলেন। বহুদিনের শত্রুতা

"চৈতক" পৃষ্ঠে প্রতাপসিংহ।

অন্তর্হিত হইল। প্রতাপ প্রগাঢ়স্নেহে কনিষ্ঠকে আলিঙ্গন করিলেন। এখন ভাইয়ে ভাইয়ে মিলিয়া মিবারের বিলুপ্ত গৌরবের উদ্ধারে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন। এদিকে পথে চৈতকের প্রাণবিয়োগ হয়। প্রিয়-তম বাহনের স্মরণার্থ প্রতাপ ঐ স্থলে একটি মন্দির প্রস্তুত করিয়া দেন। ঐ স্থান "চৈতককা চবুতর"নামে প্রসিদ্ধ হয়।

১৫৭৬খ্রীঃ অব্দের জুলাই মাসে চিরস্মরণীয় হল্‌দিঘাট মিবারের গৌরবস্বরূপ রাজপুতগণের শোণিতস্রোতে প্রক্ষালিত হয়। এদিকে মোগলসৈন্য বিজয়ী হইয়া, রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিল। কমল-মীর * ও উদয়পুর শত্রুর হস্তে পতিত হইল। প্রতাপ সন্তান-বর্গের সহিত এক পর্ব্বত হইতে অন্য পর্ব্বতে, এক অরণ্য হইতে অন্য অরণ্যে, এক গহ্বর হইতে অন্য গহ্বরে যাইয়া, অনুসরণকারী মোগলদিগের হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। বৎসরের পর বৎসর আসিতে লাগিল; প্রতাপের কষ্টের অবধি রহিল না। প্রতি নূতন বৎসর নূতন নূতন কষ্ট সঞ্চয় করিয়া, প্রতাপের নিকটে উপস্থিত হইতে লাগিল। কিন্তু প্রতাপ অটল রহিলেন, মোগলের অধীনতা স্বীকার করিলেন না। ক্রমে মিবারের আকাশ অধিকতর অন্ধকারময় হইতে লাগিল। ক্রমে পরাক্রান্ত শত্রু অনেক স্থানে আধিপত্য স্থাপন করিল; তথাপি প্রতাপ অটল রহিলেন,—বাপ্পারাওর শোণিত কলঙ্কিত করি-লেন না। এই সময়ে প্রতাপসিংহ এমন দুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন যে, একদা বিশ্বাসী ভিলগণ অতিকষ্টে তাঁহার পরিবারবর্গকে কোন নিরা-পদ স্থানে লইয়া গিয়া আহার দিয়া, তাঁহাদের প্রাণ রক্ষা করে।

প্রতাপের এইরূপ অসাধারণ স্বার্থত্যাগ ও অশ্রুতপূর্ব্ব কষ্টে সদাশয় শত্রুর হৃদয়ও আর্দ্র হইল। দিল্লীর প্রধান রাজকর্ম্মচারী ঈদৃশী দেশ-

* কমলমীর মিবারের একটি প্রসিদ্ধ গিরিদুর্গ। উহার প্রকৃত নাম কুম্ভমের। মিবারের রাণা কুম্ভের আদেশে এই দুর্গ নির্ম্মিত হয়।

হিতৈষিতায় মোহিত হইয়া, প্রতাপকে সম্বোধনপূর্ব্বক এইভাবে একটি কবিতা লিখিয়া পাঠাইলেন,—"পৃথিবীতে কিছুই স্থায়ী নহে। ভূমি-সম্পত্তি অদৃশ্য হইবে; কিন্তু মহৎ লোকের ধর্ম্ম কখনও বিলুপ্ত হইবে না। প্রতাপ সম্পত্তি ও ভূমি পরিত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু কখনও মস্তক অবনত করেন নাই। হিন্দুস্থানের রাজগণের মধ্যে তিনিই কেবল স্বীয় বংশের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন।" প্রতাপ এইরূপে বিধর্ম্মী বিপক্ষেরও প্রশংসাভাজন হইয়া বনে বনে বেড়াইতে লাগিলেন। প্রাণাধিক বনিতা ও সন্তানদিগের কষ্ট এক এক সময়ে তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। একদিন তিনি পাঁচ বার খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করেন, কিন্তু সুবিধার অভাবে পাঁচ বারই তাহা পরিত্যাগ করিয়া, পার্ব্বত্য প্রদেশে পলায়নপর হয়েন। একদা তাঁহার মহিষী ও পুত্রবধূ ঘাসের বীজদ্বারা কয়েকখানি রুটী প্রস্তুত করেন। ঐ খাদ্যের একাংশ সকলে সেই সময়ে ভোজন করিয়া অপরাংশ ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দেন। কিন্তু হঠাৎ একটি বন্যবিড়াল সেই অবশিষ্ট রুটী লইয়া পলায়ন করে। অবশিষ্ট খাদ্য অপহৃত হইল দেখিয়া, প্রতাপের একটি দুহিতা কাতরভাবে কাঁদিয়া উঠে। প্রতাপ অদূরে অর্দ্ধশয়ান থাকিয়া আপনার শোচনীয় অবস্থার কথা ভাবিতেছিলেন; দুহিতার রোদনে চমকিত হইয়া দেখেন, রুটীখানি অপহৃত হইয়াছে। বালিকা কাতর হইয়া কাঁদিতেছে। প্রতাপ অম্লানবদনে হল্‌দিঘাটে স্বদেশীয়গণের শোণিতস্রোত দেখিয়াছিলেন, অম্লানবদনে স্বদেশীয়দিগকে স্বদেশের সম্মানরক্ষার্থে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিতে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, অম্লানবদনে রাজপুতবংশের গৌরব-রক্ষার জন্য রণস্থলবর্ত্তিনী করাল কৃতান্তমূর্ত্তির বিভীষিকায় দৃক্‌পাত না করিয়া কহিয়াছিলেন, "এইভাবে দেহ-বিসর্জ্জনের জন্যই রাজপুতগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে" কিন্তু এক্ষণে তিনি স্থিরচিত্তে তনয়ায় কাতরতা দেখিতে সমর্থ হইলেন না। স্নেহাস্পদ

বালিকাকে কাতরস্বরে কাঁদিতে দেখিয়া, তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইল; যেন শত শত কাল-ভুজঙ্গ আসিয়া সর্ব্বাঙ্গে দংশন করিল। প্রতাপ আর যাতনা সহিতে পারিলেন না; আপনার কষ্ট দূর করিবার জন্য অকবরের নিকটে আত্মসমর্পণের অভিপ্রায় জানাইলেন।

প্রতাপের এই অধীনতা-স্বীকারের সংবাদে অকবর নগরমধ্যে মহোল্লাসে উৎসবের অনুষ্ঠান করিতে আদেশ দিলেন। প্রতাপ অকবরের নিকটে যে পত্র পাঠাইয়াছেন, সেই পত্র পৃথ্বীরাজ দেখিতে পাইলেন। পৃথ্বীরাজ বিকানীরের অধিপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি প্রতাপকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। প্রতাপ হঠাৎ দিল্লীশ্বরের নিকটে অবনত হইবেন, ইহা ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইল। পৃথ্বীরাজ আর কালবিলম্ব না করিয়া, নিম্নলিখিত ভাবে কয়েকটি কবিতা রচনাপূর্ব্বক প্রতাপের নিকটে পাঠাইলেন;—

"হিন্দুদিগের আশাভরসা হিন্দুজাতির উপরেই নির্ভর করিয়াছে। রাণা এখন তাহা পরিত্যাগ করিতেছেন। আমাদের সর্দ্দারগণের সে বীরত্ব নাই, নারীগণের সেই সতীত্ব-গৌরব নাই। প্রতাপ না থাকিলে, অকবর সকলকেই এক সমভূমিতে আনয়ন করিতেন। সকলে হতাশ্বাস হইয়া নওরোজের বাজারে * আপনাদের অপমান দেখিয়াছেন, কেবল হামীরের বংশধরকে আজ পর্য্যন্ত সে অপমান দেখিতে হয় নাই। জগৎ জিজ্ঞাসা করিতেছে, প্রতাপের অবলম্বন কোথায়? পুরুষত্ব ও তরবারিই তাঁহার অবলম্বন। তিনি এই অবলম্বন-বলেই ক্ষত্রিয়ের গৌরব রক্ষা করিতেছেন। আকবর কিন্তু চিরদিন জীবিত থাকিবে না, একদিন অবশ্যই ইহলোক হইতে অপসৃত হইবে। তখন আমাদের জাতির সকলেই পরিত্যক্ত ভূমিতে রাজপুতবীজের বপন জন্য প্রতাপের নিকটে

* ইহার আর এক নাম "খোষরোজ" বা আনন্দদিন। আর্য্যকীর্ত্তির পঞ্চম খণ্ডে "বীরাঙ্গনার বীরত্বমহিমা" প্রবন্ধে এই বাজারের বর্ণিত হইয়াছে।

উপস্থিত হইবে। যাহাতে এই বীজ রক্ষা পাইতে পারে, যাহাতে ইহার পবিত্রতা পুনরায় সমুজ্জ্বল হইতে পারে, তাহার জন্য সকলেই প্রতাপের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।”

পৃথ্বীরাজের এই উৎসাহ-বাক্য শতসহস্র রাজপুতের তুল্য বলকারক হইল। ইহা প্রতাপের মুহ্যমান দেহে জীবনীশক্তি দিল. প্রতাপ দিল্লীশ্বরের নিকট অবনতি স্বীকারের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু এই সময়ে বর্ষার এরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল যে,প্রতাপ কিছুতেই পর্ব্বত-কন্দরে থাকিতে পারিলেন না ; মিবার পরিত্যাগপূর্ব্বক মরুভূমি অতি-বাহন করিয়া, সিন্ধু নদের তটে যাইতে ইচ্ছা করিলেন। এই সঙ্কল্প-সিদ্ধির মানসে তিনি পরিবারবর্গ ও মিবারের কতিপয় বিশ্বস্ত রাজপুতের সহিত আরাবলী হইতে নামিয়া, মরুপ্রান্তে উপনীত হয়েন। এই সময়ে প্রতাপের মন্ত্রী স্বকীয় পূর্ব্বপুরুষগণের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ আনিয়া প্রতাপের নিকটে উপস্থিত হয়েন। ঐ অর্থ এত ছিল যে, উহাদ্বারা বার বৎসর কাল, পঁচিশ হাজার ব্যক্তির ভরণপোষণ নির্ব্বাহিত হইতে পারিত। কৃতজ্ঞতার এই মহৎ দৃষ্টান্তে প্রতাপ পুনর্ব্বার সাহস-সহকারে অভীষ্ট মন্ত্র-সাধনে উদ্যত হইলেন। অবিলম্বে অনুচরবর্গ একত্র হইল। প্রতাপ ইহাদিগকে লইয়া, আরাবলী অতিক্রম করিলেন। মোগল সেনাপতি শাহবাজ খাঁ সসৈন্যে দেবীর-নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন ; প্রতাপ প্রবলবেগে আসিয়া মোগলসৈন্য আক্রমণ করিলেন। দেবীরের যুদ্ধে প্রতাপের জয়লাভ হইল। শাহবাজ খাঁ হত হইলেন। ক্রমে কমলমীর ও উদয়পুর হস্তগত হইল। ক্রমে চিতোর, আজমীঢ় ও মণ্ডলগড় ব্যতীত সমস্ত মিবার প্রদেশ প্রতাপের পদানত হইয়া উঠিল। এই বিজয়বার্ত্তা অকবর শুনিলেন। পরাক্রান্ত মোগল দশ বৎসর কাল বহু অর্থ ব্যয় ও বহু সৈন্য নষ্ট করিয়া, মিবারের যে বিজয়লক্ষ্মী অধিকার করিয়াছিলেন, প্রতাপসিংহ এক দেবীরের যুদ্ধে তাহা আপনার করায়ত্ত করিলেন।

ইহার পর মোগলসৈন্য মিবারে আর উপস্থিত হইল না। প্রতাপের বিজয়লক্ষ্মী অটল থাকিল। কিন্তু এইরূপে বিজয়ী হইলেও প্রতাপ জীবনের শেষ অবস্থায় শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই। পর্ব্বত-শিখরে উঠিলেই তাঁহার দৃষ্টি চিতোরের দুর্গ-প্রাচীরের দিকে নিপতিত হইত; অমনি তিনি যাতনায় অধীর হইয়া পড়িতেন। যে চিতোরে বাপ্পারাও অবস্থিতি করিয়াছিলেন; যে চিতোরে রাজপুত-কুলগৌরব সমরসিংহ দৃষদ্বতী নদীর তীরে পৃথ্বীরাজের সহিত দেহত্যাগ করিয়া সমরবেশে সজ্জিত হইয়াছিলেন; যে চিতোরে বাদল, জয়মল্ল ও পুত্ত পবিত্র যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অম্লানবদনে—অক্ষুব্ধহৃদয়ে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, আজ সেই চিতোর শ্মশান,—আজ সেই চিতোরের প্রাচীর অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন ভীষণ শৈলশ্রেণীর ন্যায় রহিয়াছে। প্রতাপ প্রায়ই এইরূপ চিন্তা—এইরূপ কল্পনায় অবসন্ন হইতেন; প্রায়ই তরঙ্গের পর তরঙ্গের আঘাতে তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইত।

এইরূপ অন্তর্দ্দাহে প্রতাপ তরুণবয়সেই ঐহিক জীবনের চরম সীমায় উপনীত হইলেন। দুরন্ত রোগ আসিয়া শীঘ্র তাঁহার দেহ অধিকার করিল। প্রতাপ ও তাঁহার সর্দ্দারগণ দুর্গতির সময়ে আপনাদিগকে ঝড়বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য পেশোলা হ্রদের তীরে যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই কুটীরেই প্রতাপের জীবনের শেষ অংশ অতিবাহিত হয়। প্রতাপ স্বীয় তনয় অমরসিংহের প্রতি আস্থাশূন্য ছিলেন। তিনি জানিতেন, কুমার অমরসিংহ নিরতিশয় সৌখীন যুবক; রাজ্যরক্ষার ক্লেশ কখনই তাঁহার সহ্য হইবে না। পুত্রের বিলাসপ্রিয়তায় প্রতাপ হৃদয়ে নিদারুণ ব্যথা পাইয়াছিলেন; অন্তিম সময়েও এই যাতনা তাঁহা হইতে অন্তর্হিত হইল না। এই দুঃসহ মনোবেদনায় আসন্নমৃত্যু প্রতাপের মুখ হইতে বিকৃত স্বর বাহির হইতে লাগিল। একজন সর্দ্দার ইহা দেখিয়া প্রতাপকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

তাঁহার এমন কি কষ্ট হইয়াছে যে, প্রাণবায়ু শান্তভাবে বাহির হইতে পারিতেছে না। প্রতাপ উত্তর করিলেন,—"যাহাতে স্বদেশ তুরুকের হস্তগত না হয়, তদ্বিষয়ে কোন প্রতিশ্রুতি জানিবার জন্য আমার প্রাণ এখনও অতিকষ্টে বিলম্ব করিতেছে।" পরিশেষে তিনি কুটীর লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"হয় ত এই কুটীরের পরিবর্ত্তে বহুমূল্য প্রাসাদ নির্ম্মিত হইবে; আমরা মিবারের যে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছি, হয় ত তাহা এই কুটীরের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইবে।" সর্দ্দারগণ প্রতাপের এই বাক্যে শপথ করিয়া কহিলেন,—"যে পর্য্যন্ত মিবার স্বাধীন না হইবে, সে পর্য্যন্ত কোনও প্রাসাদ নির্ম্মিত হইবে না।" প্রতাপ আশ্বস্ত হইলেন; নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় তাঁহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইল। মিবার আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিবে শুনিয়া, তিনি শান্তভাবে অনন্তনিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

এইরূপে স্বদেশবৎসল প্রতাপসিংহের পরলোকপ্রাপ্তি হইল। যদি মিবারের থিউকিদিদিস্ অথবা জেনোফন থাকিতেন, তাহা হইলে "পেলপনিসসের সমর" * অথবা "দশ সহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন" † কখনও এই রাজপুতশ্রেষ্ঠের অবদান অপেক্ষা ইতিহাসে অধিকতর মধুরভাবে

* গ্রীসের দুইটি নগর—স্পার্টা ও এথিনা। এথিনা পারস্যের সহিত যুদ্ধে সবিশেষ গৌরবান্বিত হইলে, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী স্পার্টা অসূয়াপরবশ হইয়া সমরসজ্জার আয়োজন করে। ইহাতে স্পার্টার সহিত এথিনার তিনটি সংগ্রাম হয়। ইহাই "পেলপনিসসের যুদ্ধ" বলিয়া বিখ্যাত প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক থিউকিদিদিস্ এই মহাসমরের সবিস্তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

† পারস্যের রাজা দ্বিতীয় দরায়ুস্ লোকান্তরিত হইলে, তাঁহার পুত্র অর্ত্তক্ষত্র পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু অর্ত্তক্ষত্রের ভ্রাতা কাইরস্ রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য দশ সহস্র গ্রীকসৈন্যের সাহায্যে সমরে প্রবৃত্ত হন। খ্রীঃ পূঃ ৪০১ অব্দে কাইরস্ সমরে নিহত হইলে, গ্রীক্ সেনাপতি জেনোফন তাঁহার দশ সহস্র সৈন্যের সহিত বিশিষ্ট পরাক্রম ও কৌশল-সহকারে স্বদেশে প্রত্যাগত হয়েন। ইহাই "দশ সহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন" বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। গ্রীক্ সেনাপতি ও ইতিহাসলেখক জেনোফন ইহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ লিখিয়াছেন।

পরিকীর্ত্তিত হইত না। অনমনীয় বীরত্ব, অবিচলিত দৃঢ়তা ও অশ্রুত-পূর্ব্ব অধ্যবসায় সহকারে প্রতাপ দীর্ঘকাল প্রবলপরাক্রান্ত, উন্নতাকাঙ্ক্ষ, সহায়সম্পন্ন সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। এজন্য আজ পর্য্যন্ত প্রতাপসিংহ প্রত্যেক রাজপুতের হৃদয়ে অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ভাবে বিরাজ করিতেছেন। যত দিন রাজপুতের হৃদয়ে স্বদেশহিতৈষিতা থাকিবে, তত দিন প্রতাপসিংহের এই দেবভাবের ব্যত্যয় হইবে না।

প্রতাপসিংহ স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য, যে সমস্ত মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, রাজস্থানের ইতিহাসে তৎসমুদয়ের বিবরণ চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। শতাব্দের পর শতাব্দ অতীত হইয়াছে, আজ পর্য্যন্ত রাজস্থানের লোকের স্মৃতিতে ঐ বৃত্তান্ত জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। পূর্ব্বপুরুষের ঐ গৌরবকাহিনী বলিবার সময়ে রাজপুতের হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব তেজস্বিতার আবির্ভাব হয়, ধমনীমধ্যে রক্তের গতি প্রবল হয় এবং নয়নজলে গণ্ডদেশ প্লাবিত হইয়া থাকে। ফলতঃ প্রতাপসিংহের কার্য্যপরম্পরা রাজস্থানের অদ্বিতীয় গৌরব ও অদ্বিতীয় মহত্ত্বের বিষয়। কোন ব্যক্তি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্য-সম্পত্তির অধিকারী হইয়া, প্রতাপের ন্যায় দুর্দ্দশা-পন্ন হয়েন নাই; কোন ব্যক্তি স্বাধীনতা-রক্ষার্থ বনে বনে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়াইয়া প্রতাপের ন্যায় কষ্টভোগ করেন নাই। আরাবলী পর্ব্বতমালার সমস্ত দরী, সমস্ত উপত্যকাই প্রতাপসিংহের গৌরবে উদ্ভাসিত রহিয়াছে। চিরকাল ঐ গৌরবস্তম্ভ উন্নত থাকিয়া, রাজ-স্থানের মহিমা প্রকাশ করিবে। ভারত মহাসাগরের সমগ্র বারিতেও উহা নিমগ্ন হইবে না, হিমালয়ের সমগ্র অভ্রস্পর্শী শৃঙ্গপাতেও উহা বিচূর্ণিত হইবে না।

আত্মত্যাগ।

(মিবারের কুলপুরোহিত)

উপস্থিত গ্রন্থে মিবারের বীরপুরুষ ও বীররমণীর তেজস্বিতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। জগতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। যদি ইতিহাসের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করা যায়, পৃথিবীর মধ্যে কোন্ জাতি বহু শতাব্দীর অত্যাচার সহিয়াও আপনাদের সভ্যতা অক্ষত এবং আপনাদের জাতীয় গৌরবের প্রাধান্য অপ্রতিহত রাখিয়াছে, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ এই উত্তর পাওয়া যাইবে, মিবারের রাজপুতগণই সেই অদ্বিতীয় জাতি। যুদ্ধের পর যুদ্ধে মিবার হৃতসর্ব্বস্ব ও হতবীর হইয়াছে; অসির পর অসির আঘাতে রাজপুতের দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে; বিজেতার পর বিজেতা আসিয়া আপনাদের সংহারিণী শক্তির পরিচয় দিয়াছে; কিন্তু মিবার কখনও চিরকাল অবনত থাকে নাই। মানবজাতির ইতিহাসে কেবল মিবারের রাজপুতেরাই বহুবিধ অত্যাচার ও দৌরাত্ম্য সহিয়া বিজেতার পদানত হয় নাই এবং বিজেতার সহিত মিশিয়া আপনাদের জাতীয় গৌরবে বিসর্জ্জন দেয় নাই। রোমকগণ ব্রিটনদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিলে, ব্রিটনের বিজেতার সহিত একেবারে মিশিয়া যায়। তাহাদের পবিত্র বৃক্ষের সম্মান, তাহাদের পবিত্র বেদীর মর্য্যাদা, তাহাদের পুরোহিত-(ড্রুইড) গণের প্রাধান্য সমস্তই অতীত সময়ের গর্ভে বিলীন হয়। মিবারের রাজপুতেরা কখনও এরূপ রূপান্তর পরিগ্রহ করে নাই; তাহারা অনেক বার আপনাদের ভূসম্পত্তি হইতে স্খলিত হইয়াছে, কিন্তু কখনও আপনাদের পবিত্র ধর্ম্ম বা পবিত্র আচার-ব্যবহার হইতে বিচ্যুত হয় নাই। তাহাদের অনেক রাজ্য পরহস্তগত

হইয়াছে; অনেক বংশ অনন্ত কালসাগরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে; মিবার আপনার ধর্ম্মে বিসর্জ্জন দেয় নাই। এই বীরভূমি দীর্ঘকাল প্রবল তরঙ্গের আঘাত সহ্য করিয়াছে, তথাপি আপনার বিমুক্তির জন্য আত্মসম্মান বিনষ্ট করে নাই। মিবারের বীরপুরুষ ঘোরতর যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছেন, স্বতন্ত্রতা-রক্ষায় ঔদাসীন্য দেখান নাই, মিবারের বীররমণী সংগ্রামস্থলে দেহত্যাগ করিয়াছেন, বিজেতার পদানত হয়েন নাই; মিবারের বীরবালক জন্মভূমির জন্য রণস্থলে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন, স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দেন নাই; মিবারের বীর-ধাত্রী স্নেহের অদ্বিতীয় অবলম্বন প্রাণাধিক শিশু পুত্রকে নিষ্ঠুর ঘাতকের তরবারির মুখে সমর্পণ করিয়াছে, প্রভুর বংশরক্ষায় পরাঙ্মুখ হয় নাই; মিবারের অধিপতি আপনার হৃদয়রঞ্জন তনয়ের হত্যাকারীকে পুরস্কৃত করিয়াছেন, ন্যায়ের পবিত্র রাজ্যে পাপের কালিমা ছড়াইতে উদ্যত হয়েন নাই; মিবারের কুলপুরোহিত রাজবংশের মঙ্গলের জন্য অম্লান-বদনে স্বীয় হস্তে আত্মজীবন নষ্ট করিয়াছেন, আপনার মহৎ উদ্দেশ্যের রক্ষায় কাতর হয়েন নাই।

কুলপুরোহিতের এই অপূর্ব্ব আত্মত্যাগের কথা অনির্ব্বচনীয় মহত্ত্বে পূর্ণ। যদি জগতে কোনরূপ নিঃস্বার্থভাব থাকে, তাহা হইলে এই পুরোহিত তাহার জীবন্ত মূর্ত্তি; যদি কোনরূপ উদার মহান্ ভাবের আশ্রয়স্থান থাকে, তাহা হইলে তাহা এই পুরোহিতের হৃদয়। মিবার যথার্থ এ আত্মত্যাগ-গরিমার লীলাভূমি। আর কোন ভূখণ্ড এ অংশে মিবারের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। নিজের জীবন দিয়া পরের জীবন রক্ষা করা নিঃসন্দেহ অলৌকিক কার্য্য। মিবারের পুরোহিত এ অলৌকিক কার্য্য করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এ নশ্বর জগতে, এ জীবলোকের ক্ষণপ্রভাবৎ ক্ষণিক বিকাশে, কাহারও সহিত এই "দানবীরের" তুলনা হয় না।

আত্মত্যাগ

মিবারের মঙ্গলবিধাত্রী কুলদেবতা যুদ্ধোন্মুখ ভ্রাতৃযুগলের প্রাণ রক্ষার জন্য অম্লানবদনে আত্মজীবন বিসর্জ্জন দিলেন। প্রতাপ ও শক্ত ইহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে একদা দুইটি ক্ষত্রিয় যুবক মৃগয়ার আমোদে পরিতৃপ্ত হইতেছিলেন। যুবকদ্বয়ের মধ্যে আকৃতিগত কোনরূপ বৈষম্য নাই। উভয়ের দেহই বীরত্বব্যঞ্জক। উভয়েই সুগঠিত, সুশ্রী ও যৌবনসুলভ তেজস্বিতায় পরিপূর্ণ। এই তেজস্বিতার প্রখর দীপ্তির সহিত অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের স্নিগ্ধ আলোক উভয়ের মুখমণ্ডলেই বিকাশ পাইতেছিল। যুবকদ্বয়ের মধ্যে দীর্ঘকাল সদ্ভাব ছিল, দীর্ঘকাল উভয়েই প্রীতির আদানপ্রদানে সুখানুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু মিবারের মৃগয়াভূমিতে হঠাৎ এই সদ্ভাবের ব্যতিক্রম হইল। হঠাৎ প্রীতির স্থলে বিদ্বেষ স্থান পরিগ্রহ করিল। যুবকদ্বয় কোন কারণে সহসা উভয়ে, উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিলেন। এই দুইটি তেজস্বী ক্ষত্রিয় বীর, মহারাণা উদয়সিংহের পুত্র। একটির নাম প্রতাপসিংহ, অপরটির নাম শক্তসিংহ। একটি অতুল্য বীরত্ব দেখাইয়া এবং চিরকাল স্বাধীনতার উপাসনা করিয়া প্রাতঃ-স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন; অপরটি, স্বজাতির শোণিতে আপনার বিদ্বেষবুদ্ধির তৃপ্তিসাধন করিয়াছেন। একটি জাতীয় গৌরবের অদ্বিতীয় অবলম্বন; অপরটি জাতীয় কলঙ্কের আশ্রয়ভূমি। আজ এই তেজস্বী ভ্রাতৃযুগলের মধ্যে বিরোধ ঘটিল। আজ ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইতে উদ্যত হইল। যে বীরত্ব ও তেজস্বিতা একত্র থাকিলে, মিবারের গৌরবসূর্য্য উজ্জ্বলতর হইতে পারিত, হায়! আজ তাহা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া আপনার বলক্ষয় করিল।

প্রতাপসিংহ মহারাণা উদয়সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র; সুতরাং মিবারের গদি তাঁহারই হস্তগত হইয়াছিল। উদয়সিংহের দ্বিতীয় পুত্র শক্তসিংহ, ভ্রাতার আশ্রয়ে কালাতিপাত করিতেছিলেন। তেজস্বিতা ও কঠোরতায় শক্ত কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না। একদা, একখানি তরবারি প্রস্তুত হইয়া আসিলে, উহাতে ধার আছে কি না, জানিবার জন্য কতকগুলি

মোটা স্থতা একত্র করিয়া তরবারির আঘাতে উহা দ্বিখণ্ড করিবার প্রস্তাব হয়। শক্ত নিকটে ছিলেন, তিনি গম্ভীরভাবে কহিলেন,—"যে তরবারি অতঃপর মাংস অস্থি ছেদন করিবে, স্থতা কাটিয়া তাহার পরীক্ষা করা উচিত নহে।" শক্ত ইহা কহিয়াই পূর্ব্বের ন্যায় গম্ভীর-ভাবে তরবারি লইয়া নিজের অঙ্গুলিতে আঘাত করিলেন। আহত স্থান হইতে অনর্গল শোণিত নির্গত হইতে লাগিল। এই সময়ে শক্তের বয়স পাঁচ বৎসর। পঞ্চমবর্ষীয় শিশু যে সাহস ও তেজস্বিতা দেখাইয়াছিল, বয়োবৃদ্ধির সহিত সে সাহস ও তেজস্বিতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে; কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপর যে বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল, তাহা শক্তের হৃদয় হইতে দূর হয় নাই। প্রতাপসিংহও কনিষ্ঠের উপর জাতক্রোধ ছিলেন। কিছুতেই এই বিদ্বেষ ও ক্রোধ তিরোহিত হইল না। কিছুতেই পূর্ব্বতন সদ্ভাব ও প্রীতি আসিয়া উভয়কে একতাসূত্রে সংবদ্ধ করিতে পারিল না। ক্রমে এই বিদ্বেষ ও ক্রোধ গাঢ়তর হইল, ক্রমে উভয়ে উভয়ের শোণিতপাতে সচেষ্ট হইলেন। একদা প্রতাপসিংহ চক্রাকার অস্ত্র-ক্রীড়া-ভূমিতে অশ্বচালনা করিতে-ছিলেন। তাঁহার হস্তে শাণিত বর্শা দীপ্তি পাইতেছিল। তিনি এই ক্রীড়াভূমিতে আপনার অস্ত্রচালনার কৌশলের পরিচয় দিতেছিলেন। এমন সময়ে শক্ত তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। প্রতাপ গম্ভীরস্বরে কনিষ্ঠকে কহিলেন,—"আজ এই ক্রীড়াভূমিতে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আমাদের বিবাদের মীমাংসা হইবে। আজ দেখিব, শাণিত বর্শাচালনায় কাহার অধিকতর ক্ষমতা আছে।" শক্ত হটিলেন না, দ্বন্দ্বযুদ্ধের আয়োজন হইলে, তিনি জ্যেষ্ঠকে গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"তুমি কি আরম্ভ করিবে?" অবিলম্বে উভয়ে বর্শা লইয়া উভয়ের সম্মুখীন হইলেন; মিবারের আশাভরসাস্থল তেজস্বী বীর-যুগলের জীবন আজ সংশয়-দোলায় আরোহণ করিল। ঠিক এই সময়ে উভয় ভ্রাতার মধ্যে

একটি কমনীয় মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। সমাগত পুরুষ তেজস্বিতা ও মধুরতা উভয়েরই আশ্রয়স্থল! উভয়েই তাঁহার দেহলক্ষ্মীকে অধিকতর গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। সাহসী আগন্তুক ধীরভাবে বিরাট পুরুষের ন্যায় যুদ্ধোদ্যত দুই ভাইর মধ্যস্থলে দাঁড়াইলেন। এই মাধুর্য্যময় তেজস্বী পুরুষ মিবারের পবিত্র কুলের মঙ্গল-বিধাত্রী দেবতার স্বরূপ কুলপুরোহিত। তিনি আজ দুই ভাইর যুদ্ধ-নিবারণে উদ্যত—আজ দুই ভাইর মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া দুইয়ের জীবনরক্ষায় কৃতসঙ্কল্প। পুরোহিত ধীরভাবে গম্ভীরস্বরে দুই ভাইকে কহিলেন,—"এ ক্রীড়াভূমি, প্রকৃত যুদ্ধস্থল নহে। ভাই ভাই যুদ্ধ করা প্রকৃত ক্ষত্রিয়ত্বের লক্ষণ নহে। যুদ্ধে ক্ষান্ত হও। তোমাদের তেজস্বী অশ্ব শত্রুর শোণিত-তরঙ্গিণীতে সন্তরণ করুক। বংশের মর্য্যাদা নষ্ট করিও না। মহাপুরুষ বাপ্পারাওর পবিত্র কুল কলঙ্কিত করিতে উদ্যত হইও না। দেখিও, ভ্রাতার শোণিতে যেন ভ্রাতার অস্ত্রের পবিত্রতা নষ্ট না হয়। কিন্তু পুরোহিতের এ কথায় কোন ফল হইল না। বীরযুগল পরস্পরের জীবনসংহারে সমুত্থিত হইলেন। শাণিত বর্শা পূর্ব্বের ন্যায় উভয়ের হস্তে দীপ্তি পাইতে লাগিল। পবিত্রকুলের হিতার্থী পবিত্র স্বভাব পুরোহিত ইহা দেখিলেন। মুহূর্ত্তমাত্র তাঁহার ভ্রূযুগল আকুঞ্চিত ও লোচনদ্বয় দীপ্তিময় হইল,—মুহূর্ত্তমাত্র তিনি কি যেন চিন্তা করিলেন। আর কোন কথা তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল না। নিমেষমধ্যে তিনি ক্ষুদ্র তরবারি বাহির করিয়া, আপনার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। শোণিতস্রোত প্রবাহিত হইল। মিবারের মঙ্গলবিধাত্রী কুল-দেবতা যুদ্ধোন্মুখ ভ্রাতৃযুগলের প্রাণরক্ষার জন্য অম্লানভাবে আত্মজীবন বিসর্জ্জন দিলেন।

প্রতাপ ও শক্ত ইহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহাদের অঙ্গ

অবশ ও হস্ত শিথিল হইয়া পড়িল। পুরোহিতের শব তাঁহাদের মধ্যস্থলে পড়িয়া রহিয়াছিল। তাঁহার পবিত্র শোণিত তাঁহাদের দেহ স্পর্শ করিয়াছিল। প্রতাপসিংহ মর্ম্মপীড়ায় কাতর হইলেন। আর তিনি কনিষ্ঠকে অস্ত্রাঘাত করিলেন না। প্রতাপ হস্তোত্তোলন করিয়া, তীব্রস্বরে কনিষ্ঠকে আপনার রাজ্য ছাড়িয়া যাইতে কহিলেন। শক্ত জ্যেষ্ঠের আদেশের নিকটে মস্তক অবনত করিলেন, এবং মিবার পরিত্যাগপূর্ব্বক মোগল-সম্রাট্ আকবরের সহিত সম্মিলিত হইয়া প্রতিহিংসার তৃপ্তি-সাধনের উপায় দেখিতে লাগিলেন। এই বিচ্ছিন্ন ভ্রাতৃযুগলের মধ্যে আবার প্রণয় স্থাপিত হইয়াছিল। মিবারের সেই ধর্ম্মপল্লীতে—হলদিঘাটের গিরিসঙ্কটে—সেই প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যপুঞ্জময় মহাতীর্থে, শক্ত, জ্যেষ্ঠের অসামান্য সাহস, জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য লোকাতীত পরাক্রম দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন; যুদ্ধের অবসানে কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের পদানত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন; দুই জন আবার প্রীতিভরে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।

বীরবালা।

(কর্ম্মদেবী।)

চতুর্দ্দশ শতাব্দী অতীত হইয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দী কালের পরিবর্ত্তনশীলতা দেখাইতে বিশ্বসংসারে পদার্পণ করিয়াছে। পরাধীন পরপীড়িত ভারতবর্ষ দুরন্ত তিমুরলঙ্গের আক্রমণে মহাশ্মশানের আকারে পরিণত হইয়াছে। দিল্লীর ভূপতি মহম্মদ তগলক জীবন্মৃতের ন্যায় ঐ মহাশ্মশানের এক প্রান্তে পড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহার ক্ষমতা,

তাঁহার প্রভাব, সমস্তই অন্তর্ধান করিয়াছে। তাঁহার রাজধানী মহানগরী দিল্লী নিষ্ঠুর আক্রমণকারীর অশ্রুতপূর্ব্ব অত্যাচারে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া, শোকের, দুঃখের ও দারিদ্র্যের হৃদয়বিদারক দৃশ্য বিকাশ করিয়া দিতেছে। ভারতের এই দুর্দ্দশার সময়ে বীরভূমি রাজস্থান আপনার চিরন্তন বীরত্বের গৌরবে উদ্ভাসিত রহিয়াছিল। রাজস্থানের বীরবালা আপনার অসাধারণ চরিত্রগুণ ও অসাধারণ তেজস্বিতা দেখাইয়া, পতির উদ্দেশে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। বীরভূমির এই তেজস্বিনী বীরবালার নাম কর্ম্মদেবী।

রাজস্থানে যশলমীর নামে একটি জনপদ আছে। ঐ জনপদ মরুভূমির মধ্যভাগে অবস্থিত। উহার চারিদিকে বিশাল বালুকাসাগর ভীষণভাবে পরিপূর্ণ থাকিয়া পথিকের হৃদয়ে ভীতির উৎপাদন করিতেছে। প্রকৃতির ঐ ভীষণ রাজ্যে কেবল যশলমীর, শ্যামল তরুলতায় পরিশোভিত রহিয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যশলমীরের অন্তর্গত পুগলনামক ভূখণ্ডে অনঙ্গদেব আধিপত্য করিতেন। তাঁহার পুত্রের নাম সাধু। ভট্টিজাতির মধ্যে সাধু সর্ব্বপ্রধান বীরপুরুষ ছিলেন। তাঁহার সাহস, তাঁহার বীরত্বের নিকটে সকলেই মস্তক অবনত করিত। তিনি বিশাল মরুভূমি হইতে সিন্ধু নদের তট পর্য্যন্ত আপনার প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তাঁহার ভয়ে কেহই পার্শ্ববর্ত্তী ভূখণ্ডে আত্মপ্রাধান্য ঘোষণা করিতে পারিত না। পুগলকুমার এই-রূপে ভীষণ মরুভূমির মধ্যে অসীম প্রতাপ ও অবিচলিত সাহসের সহিত স্বীয় আধিপত্য বদ্ধমূল রাখিয়াছিলেন।

একদা সাধু জনপদ-বিজয়-প্রসঙ্গে কোন যুদ্ধস্থল হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে বহুসংখ্য অশ্ব, উষ্ট্র ও সৈন্যের সহিত অরিন্তনগরে উপনীত হইলেন। অরিন্তনগর মহিলবংশীয় মাণিকরাওর রাজধানী। মাণিকরাও ১,৪৪০ খানি গ্রামে আধিপত্য করিতেন।

তিনি আদরের সহিত পুগল-কুমারকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সাধুও প্রসন্নচিত্তে মহিলরাজের অতিথি হইলেন। এই সময়ে তাঁহার বীরত্ব-মহিমা অধিকতর বর্দ্ধিত হইল। সৌন্দর্য্যলীলাময়ী উদ্যানলতা সুদৃঢ় আরণ্য তরুবরকে আশ্রয় করিতে ইচ্ছা করিল। মহিলরাজ মাণিক-রাওর দুহিতা কর্ম্মদেবী সাধুর গুণপক্ষপাতিনী হইয়া উঠিলেন। রাঠোরবংশীয় মন্দোররাজকুমার অরণ্যকমলের সহিত মহিলরাজকুমারী কর্ম্মদেবীর বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে কর্ম্মদেবীর ইচ্ছা হইল না। পুগলরাজকুমারের অতুল্য বীরত্ব ও সাহসের কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল; এখন তিনি সেই বীর-বরের বীরত্বব্যঞ্জক অনির্ব্বচনীয় দৃঢ়তার পরিচয় পাইলেন। বীরবালা বীরত্বকীর্ত্তির অবমাননা করিলেন না; অরণ্যকমলকে অতিক্রম করিয়া মরুভূবিহারী পুরুষসিংহের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে উৎসুক হইলেন।

সাধু এ প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন না। অরণ্যকমলের ভয়ে তাঁহার হৃদয় কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। তিনি আপনার সাহস ও বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া ঐ লাবণ্যবতী কামিনীকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। যথাসময়ে বিবাহের দিন অবধারিত হইল। যথাসময়ে মাণিকরাও স্বীয় রাজধানী অরিন্তনগরে কন্যারত্নকে সাধুর হস্তে সমর্পণ করিলেন। উদ্যানশোভিনী নবীনলতা আরণ্য তরুবরকে আশ্রয় করিয়া, তাঁহার দেহলক্ষ্মীর গৌরব বৃদ্ধি করিল।

এ বিবাহে অরণ্যকমলের হৃদয়ে আঘাত লাগিল। তাঁহার হতাশ হৃদয় হইতে আশার সম্মোহন দৃশ্য অন্তর্হিত হইল। যে কল্পনা তাঁহার সম্মুখে ধীরে ধীরে সুখের, শান্তির ও প্রীতির রাজ্য বিস্তার করিতেছিল, তাহা অতর্কিতভাবে কোথায় যেন মিশিয়া গেল। অরণ্যকমল প্রতি-হিংসার কঠোর দংশনে অধীর হইলেন। আশার সম্মোহন দৃশ্যের স্থলে,

মোহিনী কল্পনার অনন্ত উৎসময় রাজ্যের পরিবর্ত্তে অরণ্যকমল হিংসার তীব্র হলাহলপূর্ণ বিকটমূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। তিনি বৈরনির্য্যাতনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; প্রতিজ্ঞা করিলেন, কিছুতেই এ সাধনা হইতে অণুমাত্রও বিচলিত হইবেন না। যতদিন ক্ষত্রিয়শোণিতের শেষবিন্দু ধমনীতে বর্ত্তমান থাকিবে, প্রতিজ্ঞা করিলেন, ততদিন প্রতিদ্বন্দ্বী সাধুকে নির্জ্জিত করিতে বিমুখ থাকিবেন না। বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি, অপূর্ণ বিকশিত কামিনীকুসুম লাভে বঞ্চিত হওয়াতে অরণ্যকমলের হতাশ হৃদয় এইরূপ কালীময় হইয়াছিল। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, দৃঢ় সঙ্কল্প তাঁহাকে এইরূপ ভয়ঙ্কর কার্য্যসাধনে উত্তেজিত করিয়াছিল। সাধুর ভবিষ্য-সুখের পথ এইরূপে কণ্টকিত হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল।

অরিন্তরাজ জামাতাকে যৌতুকস্বরূপ বহুমূল্য মণি, মুক্তা, স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্র, একটি স্বর্ণময় বৃষ এবং তেরটি কুমারী দিয়া স্নেহসহকারে বিদায় দিলেন। তিনি জামাতার সঙ্গে চারি হাজার মহিলসৈন্য দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সাধু উহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া সাত শত মাত্র ভট্টিসেনা এবং আপনার অসাধারণ সাহসের উপর নির্ভর করিয়াই নবপরিণীতা প্রণয়িনীকে স্বকীয় রাজ্যে লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন। শেষে অরিন্তরাজের সবিশেষ অনুরোধে তাঁহাকে পঞ্চাশ জন মাত্র মহিলসৈন্য সঙ্গে লইতে হইল। কর্ম্মদেবীর ভ্রাতা মেঘরাজ এই সৈন্যের অধিনেতার পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

সকলে অরিন্তনগর হইতে যাত্রা করিল। সকলে একই উৎসব ও একই আহ্লাদের স্রোতে ভাসিয়া পুগলনগরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। পথে চন্দন-নামক স্থানে সাধু যখন বিশ্রাম করিতে-ছিলেন, তখন দূর হইতে মরুভূমির ধূলিরাশি উড়াইয়া একদল সৈন্য প্রবলবেগে তাঁহার অভিমুখে আসিতে লাগিল। সৈনিকদল দেখিতে দেখিতে ভীষণ মরু-প্রান্তর অতিক্রম করিল; দেখিতে দেখিতে মহা-

দর্পে সাধুর বিশ্রামভূমির সম্মুখবর্ত্তী হইল। সাহসী সাধু চাহিয়া দেখিলেন, বহুসংখ্য সৈন্য তাঁহার নিকটে আসিতেছে। অরণ্যকমল আক্রোশ সহকারে তরবারির আস্ফালন করিতে করিতে এই সৈনিক-দল পরিচালনা করিতেছেন। দেখিবামাত্র সাধু ধীরভাবে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। ধীরভাবে আপনার সৈনিকদিগকে আত্মবিসর্জ্জন অথবা বিজয়লক্ষ্মীর অধিকারের জন্য প্রস্তুত হইতে কহিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে চারি হাজার রাঠোর সৈন্য উপস্থিত হইয়াছে; তাঁহার প্রতি-দ্বন্দ্বী তেজস্বী অরণ্যকমল তদীয় শোণিতে স্বকীয় বিদ্বেষ-বুদ্ধির তৃপ্তি-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন; ইহাতে সাধু কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না; ধীরতার সীমা অতিক্রম করিয়া কিছুমাত্র আত্ম-চাপল্যের পরিচয় দিলেন না। বীরত্বাভিমানী, বীরযুবকবীর ধর্ম্মের সম্মান-রক্ষায় উদ্যত হইলেন। দেখিতে দেখিতে চারি হাজার রাঠোরসৈন্য মহাবিক্রমে ভট্টি সেনার মধ্যে আসিয়া পড়িল। সাহসী রাঠোরগণ সংখ্যায় অধিক ছিল; তাহারা অল্পসংখ্যক ভট্টিসেনাকে একেবারে আক্রমণ করিল না। এরূপ আক্রমণে তাহারা সর্ব্বদা ঘৃণা প্রদর্শন করিত। প্রথমে প্রতিদ্বন্দ্বীতে প্রতিদ্বন্দ্বীতে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আরম্ভ হইল। প্রতি-দ্বন্দ্বী প্রতিদ্বন্দ্বীকে মুহুর্মুহুঃ আক্রমণ করিয়া আপনার সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিতে লাগিল। ১৪০৭ খ্রীঃ অব্দে রাজস্থানের মরু-প্রান্তবর্ত্তী চন্দননামক ভূখণ্ডে লাবণ্যবতী রাজপুতবালার জন্য এইরূপে দলে দলে যুদ্ধ হইল। অবশেষে সাধু অশ্বারূঢ় হইয়া সমরভূমিতে প্রবেশ করিলেন। তিনি দুইবার অস্ত্রচালনা করিতে করিতে পরাক্রান্ত রাঠোর-সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন; দুইবার তাঁহার অস্ত্রাঘাতে বহু-সংখ্য রাঠোর বীরশয্যায় শয়ন করিল। অসময়ে অতর্কিতভাবে এই যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে কর্ম্মদেবী ভীত হয়েন নাই, আশঙ্কায় আত্মবিহ্বল হইয়া পড়েন নাই। তাঁহার সুখ-দুঃখের অদ্বিতীয় অবলম্বন প্রাণাধিক

স্বামী বহুসংখ্য শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন ; প্রিয়তমের জীবন ভীষণ মরুপ্রান্তরে সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে ; তাহাতে কর্ম্মদেবী কাতর হই- লেন না। তিনি সাহসের সহিত প্রিয়তমকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। প্রিয়তমের অদ্ভুত সমর-চাতুরী ও অদ্ভুত সাহস দেখিয়া মনে মনে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। সাধুর পরাক্রমে ছয় শত রাঠোর সমরভূমির ক্রোড়শায়ী হইল। সাধুর সৈন্যেরও প্রায় অর্দ্ধাংশ অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। কর্ম্মদেবী পূর্ব্বের ন্যায় অটলভাবে রহিলেন, পূর্ব্বের ন্যায় অটলভাবে স্বামীকে কহিলেন,— "আমি তোমার রণপারদর্শিতা দেখিব, তুমি যদি রণশায়ী হও আমিও তোমার অনুগামিনী হইব।" সাধু বালিকার অপরিস্ফুট কুসুমসুকুমার দেহে এইরূপ অসাধারণ তেজস্বিতা ও অটলতার আবির্ভাব দেখিয়া প্রীত হইলেন, এবং অপরিসীম প্রীতির সহিত স্নেহমাখা দৃষ্টিতে বালি- কার সেই তেজস্বিতার সম্মান করিয়া অরণ্যকমলকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। অরণ্যকমল এই যুদ্ধ শীঘ্র শেষ করিয়া ফেলিতে একান্ত উৎসুক ছিলেন ; এখন প্রতিদ্বন্দ্বীর শোণিতে আপনার অসম্মানের চিহ্ন প্রক্ষালন করিতে সাধুর সম্মুখীন হইলেন। মুহূর্ত্তকাল উভয়ে বিনয়ের সহিত সম্ভাষণ করিলেন। এ পবিত্র যুদ্ধে প্রতারণার আবেশ নাই ; চাতুরীর পঙ্কিলভাব নাই ; অধর্ম্মের ছায়াপাত নাই। তেজস্বী ক্ষত্রিয়-যুবকদ্বয় আত্মপ্রাধান্য, আত্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্য মুহূর্ত্তকাল উভয়ে উভয়কে বিনয়ের সহিত সম্ভাষণ করিয়া অসি উত্তোলন করি- লেন। অস্ত্রের সংঘর্ষণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উঠিল। সাধু অরণ্যকমলের স্কন্ধে তরবারির আঘাত করিলেন, অরণ্যকমলও সাধুর মস্তক লক্ষ্য করিয়া, বিদ্যুদ্বেগে অসিচালনা করিলেন। কর্ম্মদেবী দেখিলেন, তাঁহার প্রাণেশ্বরের মস্তকে অসি নিপতিত হইয়াছে, যুবকদ্বয় অচৈতন্য হইয়া যুদ্ধস্থলে পড়িয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অরণ্যকমলের চেতনালাভ
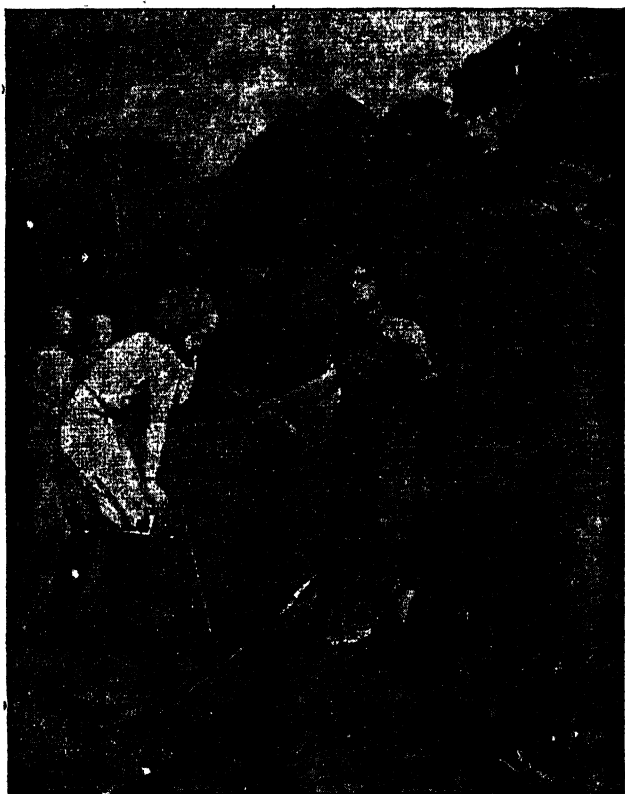
বীরবালা।

কর্ম্মদেবী ধীরভাবে অসি গ্রহণ করিলেন, এবং ধীরভাবে উহাদ্বারা নিজ হাতে নিজের এক বাহু কাটিয়া কহিলেন—"এই বাহু প্রিয়তমের পিতাকে দিয়া যেন বলা হয় যে, তাঁহার পুত্রবধূ এইরূপই ছিল।

হইল। কিন্তু সাধু আর এ নিদ্রা হইতে উঠিলেন না। তেজস্বী পুগলকুমার তেজস্বিতার সম্মান-রক্ষার জন্য অনন্তনিদ্রায় অভিভূত হইলেন। কর্ম্মদেবীর আশা ভরসা শেষ হইল। যে কল্পনার তরঙ্গে দুলিতে দুলিতে তেজস্বিনী বালা মাতা পিতার নিকটে বিদায় লইয়া হৃষ্টচিত্তে পুগলে আসিতেছিল, তাহা চিরদিনের জন্য অন্তর্ধান করিল। বালিকার প্রাণের অধিক ধন আজ ভীষণ মরু-প্রান্তরে অপহৃত হইল। কিন্তু কর্ম্মদেবী ইহাতে কাতর হইলেন না। তিনি ধীরভাবে অসি গ্রহণ করিলেন, এবং ধীরভাবে উহাদ্বারা নিজ হাতে নিজের এক বাহু কাটিয়া কহিলেন,—"এই বাহু প্রিয়তমের পিতাকে দিয়া যেন বলা হয় যে, তাঁহার পুত্রবধূ এইরূপই ছিল।" তিনি আর এক বাহুও এই ভাবে কাটিয়া ফেলিতে আদেশ দিলেন। আদেশ প্রতিপালিত হইল। কর্ম্মদেবীর ঐ ছিন্ন বাহু তাঁহার বিবাহের মণিমুক্তার সহিত মহিলকবিকে উপহার দিতে কহিলেন। অনন্তর যুদ্ধক্ষেত্রে চিতা প্রস্তুত হইল। পতিপ্রাণা সাধ্বী বালা প্রাণাধিক ধনকে বুকে রাখিয়া প্রশান্তভাবে প্রজ্বলিত চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন।

কর্ম্মদেবীর ছিন্ন বাহু যথাসময়ে পুগলে পঁহুছিল। বৃদ্ধ পুগলরাজ উহা দগ্ধ করিতে অনুমতি দিলেন। দাহস্থলে একটি পুষ্করিণী খনন করা হইল। ঐ পুষ্করিণী "কর্ম্মদেবীর সরোবর" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল। অরণ্যকমলের ক্ষতস্থান ভাল হইল না। ছয় মাসের মধ্যে তিনিও সাধুর অনুগমন করিলেন।

শিখদিগের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়।

শিখদিগের বিবরণ সহৃদয় ইতিহাস-পাঠকের একটি অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়। যখন ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ; যখন ভারতবর্ষ পরাধীনতা-শৃঙ্খলে দৃঢ়তর আবদ্ধ; তখন কে মনে করিয়াছিল, সেই পরাধীনতার সময়ে ভারতের একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় বিষয়নিস্পৃহ তপস্বীর ন্যায় ধীরে ধীরে যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া, পরিশেষে প্রতাপশালী প্রকাণ্ড জাতিতে পরিণত হইবে? যে সলিলরেখা একটি সূক্ষ্ম রজতমালার ন্যায় পৃথিবীর দেহের একাংশে শোভা পাইতেছিল, কে মনে করিয়াছিল, কালে তাহা আবর্ত্তময়ী মহাতরঙ্গিণীতে পরিণত হইয়া, মানবের শক্তিকে উপহাস করিতে করিতে বেগে ধাবমান হইবে এবং আপনার ক্ষমতায় উন্মত্ত হইয়া তরঙ্গ-বাহুর আঘাতে তটদেশ ভাঙ্গিয়া ফেলিবে? কালের পরাক্রমে শিখসম্প্রদায়ে ঐরূপ অসাধারণ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়াছিল। লোকে প্রথমে যে সম্প্রদায়কে বিস্ময়-স্তিমিতনেত্রে একবার চাহিয়াও দেখে নাই, কালে সে সম্প্রদায় সমরভূমিতে অলৌকিক বীরত্ব মহিমার পরিচয় দিয়া বীরেন্দ্রসমাজের বরণীয় হইয়াছে।

এই প্রসিদ্ধ সম্প্রদায়ের উৎপত্তির পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে সকল প্রধান প্রধান ধর্ম্মসম্প্রদায় ছিল, এ স্থলে তৎসমুদয়ের বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে।

সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসের ন্যায় ভারতের ইতিহাস অনেক ঘটনা-বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। রোমক সাম্রাজ্যের পতন অথবা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে যেমন বিচিত্র ঘটনাবলী স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে, ভারতবর্ষে হিন্দুরাজ্যের উত্থান ও পতন, বৌদ্ধরাজত্বের আবির্ভাব ও তিরোভাব এবং মুসলমান অধিকারের উদয় ও বিলয়েও তেমনি বিচিত্র ঘটনাসমূহ রাশীকৃত হইয়া রহিয়াছে। খ্রীষ্টের এক হাজার বৎসর পরে মুসলমানেরা উদ্বেল-সাগরের ন্যায় ভারতবর্ষে আসিয়া সমস্ত ভাসাইয়া দেয়। বহুকাল পূর্ব্বে পারসীকগণ একবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে তাদৃশ অনিষ্ট হয় নাই; বাহ্লীকের গ্রীকগণও পঞ্জাব হইতে অযোধ্যায় উপনীত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল অস্থির থাকে নাই; আরবগণও একবার দলবল সহ উপস্থিত হইয়া সিন্ধুদেশে কলঙ্ক লেপন করিয়াছিল, কিন্তু তাহাও কাসেমের মৃত্যুর পর চিরকাল অপ্রক্ষালিত থাকে নাই। কিন্তু খ্রীঃ ১০০০অব্দে যেরূপ দৌরাত্ম্য সংঘটিত হয়, তাহাতে ভারতবর্ষ বিব্রত হইয়া পড়ে; সুলতান মহ্‌মুদ দ্বাদশ বার ভারতবর্ষে আসিয়া বিভিন্ন জনপদ উৎসন্ন করেন। ভারতের ধনসম্পত্তি দেশান্তরে নীত হইতে থাকে। এ পর্য্যন্ত মুসলমানগণ কেবল অর্থবিলুণ্ঠনেই ব্যাপৃত ছিল; ভারতবর্ষের কোন অংশ হস্তগত করিতে তাদৃশ যত্ন করে নাই। কিন্তু মহম্মদ গোরী মধ্য এসিয়ার পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে আসিয়া সুলতান মহমুদের অসম্পন্ন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তুলেন। আর্য্যগণ আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অনেক প্রয়াস পাইয়াছিলেন; যতক্ষণ ক্ষত্রিয়শোণিতের শেষ-বিন্দু ধমনীতে প্রবাহিত ছিল, ততক্ষণ তাঁহারা মুসলমানদিগের সহিত

যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমানের অসীম চাতুরীর প্রভাবে তাঁহাদের পরাজয় হইল ; পুণ্যসলিলা দৃষদ্বতীর তীরে ক্ষত্রিয়ের শোণিত-সাগরে ভারতের সৌভাগ্যরবি ডুবিয়া গেল।

এই সময় হইতে ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের আধিপত্যের আরম্ভ হইল, এই সময় হইতে ভারতের এক রাজ্যের পর আর এক রাজ্য মুসলমানের অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত পতাকায় চিহ্নিত হইতে লাগিল। ক্রমে নূতন নূতন বংশের লোক দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিতে লাগিলেন। ঐ নূতন নূতন বংশের সহিত নূতন নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায়ও ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। ভারতে মুসলমানদিগের আধিপত্যের পূর্ব্বে রামানুজ শক্তির উপাসনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া বৈষ্ণব মত প্রচার করিয়াছিলেন ; পরে উত্তর-ভারতবর্ষে রামানন্দ ও গোরক্ষনাথ রামসীতা ও যোগের মাহাত্ম্যকীর্ত্তনে যত্নবান্ হইলেন এবং মধ্য ভারতবর্ষে কবীর, বেদ ও কোরাণ, উভয়েরই বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া, ঐশ্বরিক তত্ত্বঘোষণা করিতে লাগিলেন। এই সাম্প্রদায়িক স্রোত ইহাতেও নিরুদ্ধ হইল না। কিছুকাল পরে নবদ্বীপের একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ যুবক স্বর্গীয় প্রেমের অমৃতপ্রবাহে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিলেন। এই প্রেমপ্লাবনে সমগ্র ভারতবর্ষ প্লাবিত হইল। এই সময়ে ইউরোপের মহামতি লুথর প্রজ্বলিত বহ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত ছিলেন। এই ঘটনার কিছুকাল পূর্ব্বে পঞ্জাবে আর একজন দরিদ্র ক্ষত্রিয় যুবক ধর্ম্মরাজ্যে আর এক নূতন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে সমুত্থিত হইলেন।

মহামতি নানক যে সময়ে আপনার মত প্রচার করেন, যে সময়ে তাঁহার প্রতিভাবলে পঞ্জাবে একটি নূতন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার বহু পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ধর্ম্মবিপ্লবের সঞ্চার হইয়াছিল। দৃষদ্বতীর তটে হিন্দুদিগের বিজয়পতাকা ধরাশায়ী হইলে, যে নূতন জাতির লোক ভারতবর্ষে প্রবেশ করে, তাহাদের সংস্রবে "ঐ বিপ্লবের সূত্রপাত হয়।

তাহারা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিরুদ্ধে অস্ত্র সঞ্চালন করিল; বেদের অবমাননায় প্রবৃত্ত হইল এবং ধর্ম্মপ্রচারে হিন্দুদিগকে অধঃকৃত করিয়া তুলিল। তাহাদের মোল্লা, মৌলবী ও সৈয়দগণ আপনাদিগকে ঈশ্বরনিষ্ঠ ও পবিত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন এবং হিন্দুদিগের পরিশুদ্ধ ভক্তি, পবিত্র ঈশ্বরপ্রীতি ও জাতি-বিচার সমস্তই পদদলিত করিয়া, কোরাণের মাহাত্ম্যপ্রচারে উদ্যত হইলেন। ক্রমে কোরাণের প্রকৃত তত্ত্ব ভ্রান্তিজালে জড়িত হইয়া পড়িল; এইরূপ আচারের পর আচার, মতের পর মত, অনুশাসনের পর অনুশাসনের আবর্ত্তে পড়িয়া লোকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সম্প্রদায়ের এই ক্ষীণতা ও সাম্প্রদায়িক মতের এই অস্থিরতায় তাহাদের হৃদয় অস্থির হইল; শান্তি দূরে পলায়ন করিল; পরিশেষে তাহারা ব্রাহ্মণ ও মোল্লা, মহেশ্বর ও মহম্মদ, কিছুতেই তৃপ্তিলাভ না করিয়া, নূতনের জন্য উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

এই উত্তেজনার সময়ে যিনি ধর্ম্মবিষয়ের সরলতা ও উদারতার পরিচয় দিয়াছেন, লোকে বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া, দলে দলে তাঁহারই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। নানাবিধ কুসংস্কারে রোম যখন ভারাক্রান্ত হয়, রোমের ধর্ম্মমত যখন উৎসাহ ও উদারতার অভাবে শিথিল হইয়া পড়ে, তখন পরিশুদ্ধ ও উদার ধর্ম্মের জন্য রোম আপনা হইতে লালায়িত হইয়া উঠে। রোমের পুরোহিতগণ ঐ সময়ে আপনাদের ধর্ম্মমন্দিরের অন্তঃপ্রকোষ্ঠেই নিরুদ্ধ থাকিতেন; ধ্যানধারণাদি কোনও বিষয়ে তাঁহাদের কিছুমাত্র উৎসাহ বা অনুরাগ ছিল না। সহস্র সহস্র দেবতার উপাসনা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে কোন উপাসনাতেই তাঁহাদের হৃদয়ের একাগ্রতা, সরলতা বা সজীবতা লক্ষিত হইত না। রোমীয়গণ ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়া অন্য কোন অভিনব উপাসনাপদ্ধতির নিমিত্ত ব্যগ্র হয়। নানা মতের ঘাতপ্রতিঘাতে রোম এইরূপ তরঙ্গায়িত হইলে, খ্রীষ্টধর্ম্মতত্ত্ব ক্রমে

লোকের হৃদয়ে প্রসারিত হইতে থাকে; শেষে প্রতিকূলতায় প্রবৃদ্ধতেজ হইয়া জুপিতরের ভগ্নদশাপন্ন মন্দিরের শিরোদেশে আপনার বিজয়-পতাকা উড়াইয়া দেয়। ভারতবর্ষও এইরূপে হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্ম্মের তরঙ্গে আহত হইয়া অনেকাংশে রোমের ন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। এই চাঞ্চল্যের সময়েই নূতন নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপে ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত হিন্দুদিগের মন ক্রমেই নূতন নূতন ধর্ম্মপদ্ধতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিগ্রহে নিপীড়িত হইয়া, হিন্দুগণ নূতন নূতন ধর্ম্মতত্ত্বের প্রচার ও তাহার সংস্কারে অভিনিবিষ্ট হয়েন; রামানন্দ যাহা উদ্ভাবিত করেন, কবীর তাহা পরিমার্জ্জিত করেন, চৈতন্য তাহাতে তাড়িত বেগ সঞ্চারিত করেন, পরিশেষে বল্লভাচার্য্য তাহাতে আর একটি নূতন রেখাপাত করিয়া দেন। ঐ সমস্ত সাম্প্রদায়িক মতের পর নানকের প্রতিভাগুণে আর একটি ধর্ম্মমতের প্রচার হয়। রামানন্দ, গোরক্ষনাথ ও কবীর যাহা অসম্পন্ন করিয়া যান, নানক তাহা সম্পন্ন করিয়া তুলেন। তাঁহার ধর্ম্মমত পঞ্চসরিদ্বিধৌত বিস্তৃত জনপদে প্রতিষ্ঠিত হয়। গোবিন্দ সিংহ ঐ ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক লঘু গুরু, ক্ষুদ্র বৃহৎ, স্থূল সূক্ষ্ম, সকলকেই এক ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান করাইয়া ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করেন এবং সকলের শিরায় শিরায় অচিন্ত্যনীয় উৎসাহশক্তি সঞ্চারিত করিয়া দেন।

শিখসম্প্রদায়ের উৎপত্তি।

(গুরু নানক)

নানকের জীবনী ও নানকের ধর্ম্মমত শিখজাতির ইতিহাসের একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। নানক শাহ অথবা বাবা নানক খ্রীঃ ১৪৬৯ অব্দে লাহোরের দশ মাইল দক্ষিণ কাণাকুচা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কালুবেদী। তিনি ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব বলিয়া প্রসিদ্ধ। নানকের বিবরণ অনেক কাল্পনিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। যখন যিনি পরিদৃশ্যমান জগতের সমক্ষে আপনার প্রতাপ প্রকাশ করেন, মানবকল্পনা তখনই নানাভাবে তাঁহার বিষয়ে নানাবিধ ঘটনার প্রচার করিতে থাকে। নানক ধর্ম্মরাজ্যে যেরূপ ক্ষমতা দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তৎসম্বন্ধে যে, নানাপ্রকার কিংবদন্তী প্রচারিত হইবে, তাহা বিস্ময়জনক নহে। শিখগণ আপনাদের ধর্ম্মগুরুর মহিমা বাড়াইবার জন্য যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া থাকেন, তৎসমুদয়ে কখনও বিশ্বাস জন্মিতে পারে না। যাহা হউক, নানক অল্প বয়সে, অল্প সময়ের মধ্যে গণিত ও পারস্য ভাষা আয়ত্ত করেন। তিনি স্বভাবতঃ শুদ্ধাচার ও চিন্তাশীল ছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই সাংসারিক কার্য্যে ও সাংসারিক বিষয় ভোগে তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিল। কালুবেদী পুত্রকে সংসারধর্ম্মে আনয়ন করিতে অনেক চেষ্টা পাইলেন; নিজে ৪০টি টাকা দিয়া তাঁহাকে লবণের ব্যবসায় আরম্ভ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী বা সে অনুরোধ প্রতিপালিত হইল না। নানক পিতৃদত্ত মুদ্রায় খাদ্যসামগ্রী কিনিয়া ক্ষুধার্ত্ত উদাসীন ফকীরদিগকে ভোজন করাইলেন।

নানক যৌবনাবস্থাতেই হিন্দু ও মুসলমানদিগের অনুশাসন এবং

গুরু নানক।

বেদ ও কোরাণের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিলেন। ইহার পর আপনার তীক্ষ্ণ প্রতিভা ও প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞানবলে আত্মমতপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি লৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের উপর সাতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। যাহাতে হৃদয়ের শান্তিলাভ হয়, যাহাতে পবিত্র ঐশ্বরিক তত্ত্ব প্রচারিত হয়, তাহাই সারধর্ম্ম বলিয়া তাঁহার নিকটে বিবেচিত হইল। নানক সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রে ও ধর্ম্মপদ্ধতিতে নানাবিধ কুসংস্কারের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইলেন। তিনি সন্ন্যাসিবেশে ভারতবর্ষের নানা স্থানে বেড়াইলেন। অনেক সাধু ও যোগীর সহিত আলাপ করিলেন, আরবের উপকূল অতিবাহিত করিয়া ফকীরদিগের কার্য্য-কলাপ দেখিলেন; কিন্তু কোথাও পবিত্র সত্যের নিদর্শন পাইলেন না। সকল স্থানেই কুসংস্কারের ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি, সকল স্থানেই কর্ম্মকাণ্ডের শোচনীয় বিকার, দেখিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। স্বদেশে আসিয়া নানক সন্ন্যাসধর্ম্ম ও সন্ন্যাসিবেশ পরিত্যাগ করিলেন। গুরুদাসপুর জেলায়, ইরাবতীর তটে "করতারপুর" নামে একটি ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত হইল। নানক ঐ ধর্ম্মশালায় স্বীয় পরিবার ও শিষ্য-সম্প্রদায়ে পরিবৃত থাকিয়া জীবনের শেষ ভাগ অতিবাহিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; খ্রীঃ ১৫৩৯ অব্দে সপ্ততিবর্ষ বয়সে ঐ স্থানেই বাবা নানকের পরলোক-প্রাপ্তি হইল। নানক লোদীবংশের অভ্যুদয়-সময়ে প্রাদুর্ভূত হয়েন এবং মোগলবংশের অভ্যুদয়ের পর কলেবর ত্যাগ করেন। ধর্ম্মচিন্তায় তাঁহার জীবিতকালের ষাটিবৎসর, পাঁচ মাস ও সাত দিন অতিবাহিত হইয়াছিল।

নানকের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মপদ্ধতির আলোক প্রথমে পঞ্জাবের দৃঢ়কায় সরলস্বভাব জাঠগণের মধ্যে প্রসারিত হয়। ক্রমে মুসলমানগণও এই ধর্ম্ম অবলম্বন করে। নানকের একটি বিশ্বস্ত মুসলমান শিষ্যের নাম মর্দ্দানা। ঐ ব্যক্তি ছায়ার ন্যায় নানকের সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। সংস্কৃত

নাটকের বিদূষকগণ যেমন নিমিষে নিমিষে উদরের চিন্তায় "হা হতো-হস্মি" বলিয়া আক্ষেপ করে, মর্দ্দানাও তেমনি কথায় কথায়, ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িত। সঙ্গীতশাস্ত্রে মর্দ্দানার সবিশেষ অনুরাগ ছিল। সে সর্ব্বদা বীণা বাজাইয়া ঈশ্বরের গুণগান করিত। নানক যখন মুদ্রিত-নয়নে ঈশ্বরের ধ্যান করিতেন, বাহ্য জগতের সহিত কোনও সংস্রব না রাখিয়া, যখন ঈশ্বরচিন্তায় অভিনিবিষ্ট হইতেন, তখন মর্দ্দানা ক্ষুৎপিপা-সায় কাতর হইয়াও তদ্‌গতচিত্তে মধুর বীণা-সংযোগে গান গাইত।

যাহাতে দেশ হইতে বাহ্য ক্রিয়াকলাপ ও জাত্যভিমানের উন্মূলন হয়, যাহাতে লোকে পরস্পর ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া, পরিশুদ্ধ ধর্ম্ম ও সাধুচিত্ত অবলম্বন করে, নানক তাহার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেন। তাঁহার মতে নানা জাতিতে ও নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া থাকা উচিত নহে। দেবালয়ে গিয়া যাগযজ্ঞ করা এবং তদুপলক্ষে ব্রাহ্মণ ভোজন করানও কর্ত্তব্য নহে। ইন্দ্রিয়দমন ও চিত্তসংযমই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর। আত্মশুদ্ধি নানকের মূলমন্ত্র। বিশুদ্ধহৃদয়ে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা করিলেই ধর্ম্মাচরণ করা হয়। নানক কহিতেন,—"ঈশ্বর এক ভিন্ন বহু নহেন এবং প্রকৃত বিশ্বাস এক ভিন্ন নানাপ্রকার নহে। তবে যে, ভিন্ন জাতির মধ্যে নানাপ্রকার ধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কেবল মনুষ্যের কল্পিত মাত্র।" তিনি সমভাবে মোল্লা ও পণ্ডিত, দরবেশ ও সন্ন্যাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া, যে ঈশ্বর অসংখ্য মহম্মদ, বিষ্ণু ও শিবকে আসিতে ও যাইতে দেখিয়াছেন, সেই ঈশ্বরের ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে ও তৎপ্রতি চিত্ত স্থাপন করিতে অনুরোধ করিতেন। তাঁহার মতে ধর্ম্ম, দয়া, বীরত্ব ও সংগৃহীত জ্ঞান বস্তুতঃ কিছুই নহে। যে জ্ঞানবলে ঈশ্বরের তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, তাহাই লাভ করিতে চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য। ঈশ্বর এক, প্রভুর প্রভু ও সর্ব্বশক্তিমান্। সৎকার্য্যে ও সদাচারে সেই এক প্রভুর প্রভু ও সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের

আশীর্ব্বাদভাজন হওয়া যায়। নানকের মতে সংসার-বিরাগ ও সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অনাবশ্যক। তিনি কহিতেন, "সাধু যোগী ও পরমাত্মনিষ্ঠ গৃহী, উভয়েই সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের চক্ষে তুল্য।" ধর্ম্মানুযায়ী মত-সম্বন্ধে নানকের আর কতকগুলি উক্তি আছে। সেই উক্তিগুলি সবিশেষ প্রসিদ্ধ। এ স্থলে তাহার কয়েকটি উল্লেখ করা যাইতেছে। একদিন ব্রাহ্মণেরা স্নান করিয়া পূর্ব্ব ও দক্ষিণমুখ হইয়া তর্পণ করিতেছিলেন; এই সময়ে নানক জলে দাঁড়াইয়া পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া জল সেচিতে লাগিলেন। সকলে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, নানক কহিলেন,—"তাঁহার করতারপুরের ক্ষেত্র পশ্চিমদিকে আছে, তিনি সেই ক্ষেত্রে জল সেচিতেছেন।" ঐ কথা শুনিয়া সকলে উপহাসপূর্ব্বক বলিয়া উঠিলেন,—"করতারপুর বহু শত ক্রোশ দূরে আছে, এই জল কিরূপে ততদূর যাইবে?" নানক গম্ভীরভাবে কহিলেন,—"তবে তোমরা ইহলোকে জল সেচিয়া পরলোকগত পূর্ব্বপুরুষগণের তৃপ্তি জন্মাইবার আশা করিতেছ কেন?" ১৫২৬ কি ২৭ খ্রীঃ অব্দে নানক প্রথম মোগল সম্রাট্ বাবর শাহের দ্রব্য-সামগ্রী বহন করিবার জন্য ধৃত হয়েন। বাবর নানকের আকার-প্রকার, সাধুতা ও বাক্‌চাতুরীতে প্রীত হইয়া, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে আদেশ দেন এবং তাঁহার ভরণপোষণের জন্য অনেক সম্পত্তি দিতে চাহেন। নানক ঐ দান-গ্রহণে অসম্মত হইয়া কহেন,—"আমার কিছুই অভাব নাই, আমার সঞ্চয় এমন অক্ষয় যে, কখন উহার হ্রাস হইবে না।" বাবর শাহ এই কথার ভাবার্থ বুঝাইয়া দিতে অনুরোধ করিলে, নানক স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করেন যে, তাঁহার হৃদয় কেবল পরমেশ্বরের সাধনাতেই পরিপূর্ণ রহিয়াছে। সময়ান্তরে নানক আর একবার কহিয়াছিলেন,—"ঈশ্বরের নামামৃত পান করিয়া, তাঁহার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সমুদয়েরই একেবারে শান্তি হইয়া গিয়াছে। তিনি কেবল সেই অমৃতেই পরিতৃপ্ত রহিয়াছেন।" কথিত আছে, নানক

মক্কায় গিয়া একদিন কাবা-নামক উপাসনামন্দিরের দিকে পা রাখিয়া শয়ন করেন। উহাতে পবিত্র মন্দিরের অবমাননাকারী বলিয়া সেখানে তাঁহার বড় নিন্দা হয়। নানক এজন্য ক্ষুব্ধ হইয়া তত্রত্য মুসলমানদিগকে কহিয়াছিলেন,—"ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, যে দিকে পা ফিরাই, সেই দিকেই তাঁহার অবমাননা হইতে পারে। এখন কোন্ দিকে পা রাখিয়া নিস্তার পাই, বল?" নানক অন্য সময়ে কহিয়াছিলেন,—"এক লক্ষ মহম্মদ, দশ লক্ষ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এবং এক লক্ষ রাম, সেই সর্ব্বশক্তিমানের দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই মৃত্যুর শাসনাধীন. কেবল ঈশ্বরই অমর। তথাপি এই ঈশ্বরের উপাসনাতে সম্মিলিত হইয়াও লোকে পরস্পর বাদানুবাদ করিতে লজ্জিত হয় না। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে, কুসংস্কার এখনও সকলকে বশীভূত করিয়াছে। যাঁহার হৃদয় সৎ, তিনিই প্রকৃত হিন্দু, যাঁহার জীবন পবিত্র, তিনিই প্রকৃত মুসলমান।" নানক আপনার ধর্ম্মমত ও উপাসনা-পদ্ধতির জন্য কখনও স্পর্দ্ধা বা অহঙ্কার প্রকাশ করেন নাই। তিনি আপনাকে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের একজন দাস ও বিনয়ী আদেশবাহক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। নিজের লিখিত ধর্ম্মানুশাসন জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে পূর্ণ হইলেও, তিনি কখনও উহার উল্লেখ করিয়া, আত্মগরিমার বিস্তারে উন্মুখ হয়েন নাই এবং নিজের ধর্ম্মপ্রচারের অসাধারণ ভাবের বিকাশ থাকিলেও কখন উহা অমানুষী ঘটনায় কলঙ্কিত করেন নাই। তিনি কহিতেন,—"ঈশ্বরের কথা ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্রে যুদ্ধ করিও না। আপনাদের মতের পবিত্রতা ব্যতীত সাধু ধর্ম্মপ্রচারকগণের অন্য কোন অবলম্বন নাই।"

গুরু নানক এইরূপে আত্মমত প্রচার করিয়া, অনেক শিষ্য সংগ্রহ করিলেন। এইরূপে শিষ্যগণ তাঁহার ধর্ম্মপদ্ধতির উপর স্থাপিত হইয়া, ধীরে ধীরে একটি নিষ্কলঙ্ক, ধর্ম্মপরায়ণ সম্প্রদায় হইয়া উঠিল। শিষ্য

শব্দের অপভ্রংশে "শিখা" শব্দের উৎপত্তি হইল। কেহ কেহ বলেন যে, শিখা হইতে "শিখ" নাম হইয়াছে। যে সকল পঞ্জাবীর মস্তকে শিখা আছে, অনেকের মতে তাহারাই "শিখ"। যাহা হউক, নানকের শিষ্যগণ অতঃপর সাধারণের নিকটে শিখ নামেই পরিচিত হইতে লাগিল।

শিখদিগের জাতীয় উন্নতি।

(গুরু গোবিন্দসিংহ)

দেবর্ষি নারদ একদা যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"মহারাজ! আপনি বল প্রকাশপূর্ব্বক দুর্ব্বল শত্রুকে সাতিশয় পীড়িত করেন না ত?" নারদের এই উক্তিতে একটি গুরুতর রাজনৈতিক উপদেশ নিহিত রহিয়াছে। দুর্ব্বল সম্প্রদায় নিপীড়িত হইলে, ক্রমে আপনার বল সংগ্রহ করিতে থাকে এবং এক সময়ে পীড়নকারীর বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া, তাহার ক্ষমতা নষ্ট করে। এই জন্য দেবর্ষি নারদ উপদেশ দিয়াছেন, রাজা দুর্ব্বল শত্রুকে সাতিশয় পীড়িত করিবেন না; যেহেতু, দুর্ব্বল নিপীড়িত হইলে. ক্রমে সবল হইয়া এক সময়ে রাজার সহিত শত্রুতাচরণে উদ্যত হইবে। অনেক রাজা এই নারদীয় উপদেশে ঔদাসীন্য দেখাইয়া সমুচিত শিক্ষা পাইয়াছেন। ইতিহাস উহার উদাহরণ প্রদর্শনে অসমর্থ নহে। কিন্তু এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ভারতে মুসলমান-রাজত্বের ইতিহাসে পাওয়া যায়। মুসলমান সম্রাট্‌গণের অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া, দক্ষিণাপথের নিরীহ কৃষাণগণ যুদ্ধবীরের

পদে অধিরোহণপূর্ব্বক প্রাতঃস্মরণীয় শিবাজীর পতাকার অধীনে সজ্জিত হয়, এবং আর্য্যাবর্ত্তের শিখেরা ধীরে ধীরে শক্তি ও সাহস সংগ্রহ করিয়া, উৎপীড়নকারী মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইতে থাকে। শিখদিগের এই সমুত্থানের বিবরণ বৈচিত্র্যপূর্ণ। নানকের মৃত্যুর পর অমরদাস প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি শিখসম্প্রদায়ের অধিনায়কতা করেন। এ পর্য্যন্ত শিখগণ সংযতচিত্ত যোগীর ন্যায় নিরীহভাবে আপনাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুমোদিত কার্য্যানুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিল। কালক্রমে মুসলমানদিগের অত্যাচারে এই ধর্ম্মাবলম্বীদিগের হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। ইহারা পশুর ন্যায় বধ্যভূমিতে নীত হইতে লাগিল; অসামান্য অত্যাচারে, অশ্রুতপূর্ব্ব যন্ত্রণায় অনেকের প্রাণবায়ুর অবসান হইতে লাগিল। শিখদিগের অন্যতম গুরু অর্জ্জুন মোগল-সম্রাট্ জাহাঁগীরের আদেশে কারারুদ্ধ হইলেন। কারাগারের অসহনীয় যাতনার মধ্যে সর্দ্দিগর্মিতে অর্জ্জুনের মৃত্যু হইল। অর্জ্জুনের পর তদীয় পুত্র হরগোবিন্দ গুরুর পদে সমাসীন হইয়া মুসলমানদিগের একান্ত বিদ্বেষী হইয়া উঠিলেন। এ পর্য্যন্ত শিখগণ নিরীহভাবে কালাতিপাত করিতেছিল; অর্জ্জুনের মৃত্যুতে সে নিরীহভাব দূর হয়। প্রতিহিংসা-বৃত্তি হরগোবিন্দকে অস্ত্রধারণে ও যুদ্ধকার্য্যে উত্তেজিত করিয়া তুলে। হরগোবিন্দ সর্ব্বদাই তরবারি ধারণ করিতেন। কেহ উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি অম্লানভাবে উত্তর দিতেন,—"পিতার অপমৃত্যুর প্রতিশোধ জন্য।" হরগোবিন্দ শিখসমাজে অস্ত্রশিক্ষার প্রথম প্রবর্ত্তক। কিন্তু হরগোবিন্দের অস্ত্রবলে শিখদিগের অভীষ্ট বিষয় সিদ্ধ হয় নাই। এই অভীষ্ট বিষয়ের সিদ্ধির জন্য শিখসমাজে আর এক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইলেন। তিনি স্বশ্রেণীর—স্বজাতির অসহনীয় যন্ত্রণা দেখিয়া অধ্যবসায় ও উৎসাহ সহকারে উহার প্রতিবিধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার তেজস্বিতা, সাহস ও মহাপ্রাণতা শিখদলে প্রবেশ করিল।

গুরু গোবিন্দসিংহ।

তাহাদের মধ্যে জীবনীশক্তির সঞ্চার করিল। এই অবধি একপ্রাণতা, বেদনাবোধ প্রভৃতি জাতীয় জীবনের সমুদয় লক্ষণ শিখদিগের হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইতে লাগিল; এই অবধি ঐ মহাপুরুষের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, শিখগণ মহাপ্রাণ হইয়া উঠিল। এই মহাপুরুষ ও মহামন্ত্রদাতার নাম গোবিন্দসিংহ।

গোবিন্দসিংহই প্রথমে শিখদিগকে সাম্যসূত্রে সংবদ্ধ করেন, গোবিন্দসিংহের প্রতিভাবলেই হিন্দু ও মুসলমান, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল, এক ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করে। গোবিন্দসিংহই শিখদিগের হৃদয়ে জাতীয় জীবনের প্রথম পরিপোষক। শিখগণ যে তেজস্বিতা, স্থিরপ্রতিজ্ঞতা ও যুদ্ধকুশলতায় ইতিহাসের বরণীয় হইয়া রহিয়াছে, গোবিন্দসিংহই তাহার মূল। তেজস্বিতা ও মহাপ্রাণতায় শিখগুরুসমাজে গোবিন্দসিংহের কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। ভারতবর্ষের সকলকে এক মহাজাতিতে পরিণত করিতে নানকের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে গোবিন্দসিংহের ন্যায় আর কেহই যত্ন করেন নাই।

গোবিন্দসিংহের জীবনের সহিত শিখদিগের জাতীয় অভ্যুত্থানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। ১৬৬১ খ্রীঃ অব্দে পাটনা নগরে গোবিন্দসিংহের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম তেগবাহাদুর। তেগ শব্দের অর্থ তরবারি। তরবারির অধিস্বামীকে তেগবাহাদুর বলা যায়। যাহা হউক, হরগোবিন্দের ন্যায় তেগবাহাদুরও কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমশীল ছিলেন। যখন শিষ্যগণ তাঁহাকে গুরুর পদে বরণ করে, তখন তেগবাহাদুর নম্রভাবে কহিয়াছিলেন যে, তিনি হরগোবিন্দের অস্ত্রধারণের উপযুক্ত পাত্র নহেন। তেগবাহাদুর তদীয় প্রতিদ্বন্দ্বী রামরায়ের চক্রান্তজালে জড়িত হইয়া দিল্লীর অধিপতির বিরাগভাজন হইয়া উঠেন। পরিশেষে তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হয়।

তেগবাহাদুর পরাভূত ও বন্দীভূত হইয়া দিল্লীতে আনীত হইলে, ধর্ম্মান্ধ আওরঙ্গজেব তাঁহার মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করেন।

দিল্লীতে যাইবার সময়ে তেগবাহাদুর গোবিন্দসিংহকে পিতৃদত্ত তরবারি দিয়া গুরুর পদে বরণপূর্ব্বক কহেন,—"পুত্র! শত্রুগণ আমাকে দিল্লীতে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছে। যদি তাহারা আমাকে নিহত করে, তাহা হইলে আমার মৃত্যুর জন্য শোকে অধীর হইও না। তুমি আমার উত্তরাধিকারী হইলে। দেখিও, মৃত্যুর পর আমার দেহ যেন শৃগালকুক্কুরে নষ্ট না করে; দেখিও, এক সময়ে যেন এই মৃত্যুর প্রতিশোধ লওয়া হয়।"

গোবিন্দ পিতার এই শেষ আদেশপালনে প্রতিশ্রুত হয়েন। তেগবাহাদুর পুত্রের প্রতিশ্রুতিতে প্রফুল্ল হইয়া দিল্লীতে যাত্রা করেন। কথিত আছে, তিনি দিল্লীতে উপনীত হইলে, সম্রাট অবজ্ঞা ও উপহাস-সহকারে তাঁহাকে কোন অলৌকিক ঘটনা দ্বারা স্বীয় ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রতিপন্ন করিতে অনুরোধ করেন। তেগবাহাদুর ইহাতে গম্ভীরভাবে কহেন,—"সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের উপাসনা করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য। তথাপি একটি বিষয় প্রদর্শিত হইতেছে। আমি একখণ্ড কাগজে কয়েকটি কথা লিখিয়া গলায় বাঁধিয়া রাখিতেছি, গলদেশের যে অংশে এই লিখিত কাগজ নিবদ্ধ থাকিবে, ঘাতকের অসি যেন সে স্থান স্পর্শ না করে।" তেগবাহাদুর ইহা কহিয়া, লিখিত কাগজ গলায় বাঁধিয়া, ঘাতকের দিকে মাথা বাড়াইয়া দিলেন! নিমিষমধ্যে উত্তোলিত অসি তাঁহার স্কন্ধে নিপতিত হইল; নিমিষমধ্যে তেজস্বী শিখগুরুর দেহবিচ্ছিন্ন মস্তক মৃত্তিকায় বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। এই অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ এবং এই অপূর্ব্ব নির্ভীকতা দেখিয়া, দিল্লীর ধর্ম্মান্ধ সম্রাট্ বিস্মিত হইলেন। ইহার পর যখন সেই লিখিত কাগজ খোলা হইল, তখন তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। আওরঙ্গজেব সবিস্ময়ে, ভীতিবিহ্বলচিত্তে দেখিলেন, লেখা রহিয়াছে—

"শির্ দিয়া সার্ না দিয়া"

"মাথা দিলাম, কিন্তু ধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্ব দিলাম না।"

এইরূপে ১৬৭৫ অব্দে তেগবাহাদুরের প্রাণবায়ুর অবসান হইল। এইরূপে তেগবাহাদুর লোকাতীত মহাপ্রাণতা দেখাইয়া ধীরভাবে ঘাতকের হস্তে জীবন সমর্পণ করিলেন। এইরূপ অসাধারণ আত্মত্যাগ ধর্ম্মবীরের পবিত্র জীবন উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। বিনশ্বর জগতে বিনশ্বর শরীরীর এই অবিনশ্বর কীর্ত্তির কাহিনী চিরকাল লোককে উপদেশ দিবে।

পিতার মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া, গোবিন্দ সাতিশয় শোকগ্রস্ত হইলেন। তিনি শিষ্যদিগকে একত্র করিয়া কহিলেন,—"বন্ধুগণ! তোমরা শুনিয়াছ, আমার পিতা দিল্লীতে নিহত হইয়াছেন। আমি এখন এই সংসারে একাকী রহিলাম। কিন্তু আমি যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন তাঁহার মৃত্যুর প্রতিশোধ দিতে ক্ষান্ত থাকিব না। এই কার্য্যে আমি মৃত্যুকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিব। পিতার দেহ এখন দিল্লীতে রহিয়াছে। তোমাদের মধ্যে কেহ কি উহা আনিতে পারিবে না?" গুরুর এই কথায় একটি শিষ্য তেগবাহাদুরের দেহ আনিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইল। গোবিন্দ তাহাকে বিদায় দিলেন। শিষ্য দিল্লীতে যাইয়া তেগবাহাদুরের দেহ লইয়া পাঞ্জাবে ফিরিয়া আসিল। এদিকে দিল্লীর শিখগণ যথাবিধি তেগবাহাদুরের মস্তকের সৎকার করিল।

যখন তেগবাহাদুরের মৃত্যু হয়, তখন গুরু গোবিন্দের বয়স পনর বৎসর। পিতার শোচনীয় হত্যাকাণ্ড, স্বজাতির ও স্বদেশের অধঃপতন, গোবিন্দের মনে এমন গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল যে, অত্যাচারী মুসলমানদিগের হস্ত হইতে স্বদেশের উদ্ধারসাধনই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিল। তিনি সকলকে এক ভূমিতে আনয়ন করিয়া একটি সম্প্রদায়ে পরিণত করিতে উদ্যত হইলেন। বয়সের অল্পতায়

তাঁহার ধীরতা বিচলিত হইল না ; বুদ্ধির কোমলতায় তাঁহার দৃঢ়তা অন্তর্দ্ধান করিল না ; মতির মৃদুতায় তাঁহার ভোগস্পৃহা প্রকাশ পাইল না। তিনি পিতার প্রেতকৃত্য সম্পাদন করিয়া যমুনার নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশে গমন করিলেন। এইখানে মৃগয়ায়, পারস্য ভাষার অধ্যয়নে এবং স্বজাতির গৌরবকাহিনী শ্রবণে তাঁহার সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল।

খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীর অধিকাংশ অতীত হইয়াছে। ভারতে মোগলরাজত্বের পূর্ণ বিকাশ দেখা যাইতেছে। অক্‌বরের উদারতা, অক্‌বরের সমবেদনার চিহ্ন বিলুপ্ত হইলেও উহা লোকের স্মৃতিতে মুহুর্ম্মুহুঃ জাগিয়া উঠিতেছে। শাহজহাঁর শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া লোকে অশ্রুপাত করিতেছে। আওরঙ্গজেব ভারতভূমিশাসনে উদ্যত হইয়াছেন। পূর্ব্বদিকে পরাক্রান্ত রাজসিংহ ঐ শক্তির গতিরোধে উদ্যত হইয়াছে ; দক্ষিণে প্রাতঃস্মরণীয় শিবাজী হিন্দুর গৌরব-রক্ষার জন্য অলৌকিক বীরত্বমহিমার পরিচয় দিতেছেন ; আর উত্তরে একটি তরুণ যুবক ঐ শক্তির মূলে আঘাত করিবার জন্য দুর্গম গিরিকন্দরে সমাসীন হইয়া, ধ্যানস্তিমিতনেত্রে গভীর তপস্যায় নিযুক্ত রহিয়াছেন।

যুবক সংযতচিত্তে তপস্যা করিতেছেন। তাঁহার মূর্ত্তি প্রশান্ত, গম্ভীর। তাহাতে বিলাসের কালিমা নাই ; সাংসারিক প্রলোভন-চিহ্নের বিকাশ নাই ; আত্মস্বার্থের চাতুরী নাই। যুবক ভোগবিলাসের পঙ্কিল ক্ষেত্র হইতে দূরে থাকিয়া, নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় অচল, অপার বারিধির ন্যায়, স্থিরভাবে পরপীড়িত মাতৃভূমির হিতসাধনের উদ্দেশে আত্মসংযম, আত্মত্যাগ শিক্ষার জন্য বরণীয় দেবতার আরাধনা করিতেছেন। এ চিত্র কল্পনার তুলিকায় প্রতিফলিত হয় নাই ; উপন্যাসের মোহিনী মায়ায় প্রতিবিম্বিত হয় নাই। ইহা প্রকৃত ঐতিহাসিক চিত্র। পাঠক ! তুমি মাজিনীর কীর্ত্তির কথা পড়িয়াছ ; গারিবল্‌দির বীরত্বে

স্তম্ভিত হইয়াছ ; ওয়াশিংটনের দৃঢ়তার নিকটে মস্তক অবনত করিয়াছ ; শেষে বক্তৃতা-ভূমিতে জলদগম্ভীরস্বরে মাজিনীর আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সকলকে মাতাইয়া তুলিতেছ ; গারিবল্‌দির গরীয়সী প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছ, কিন্তু এক সময়ে তোমার মাতৃভূমিতে ঐরূপ আত্মত্যাগ, ঐরূপ দৃঢ়তার উন্মেষ হইয়াছিল। ইতিহাসের অনুসরণ কর, বুঝিতে পারিবে।

মোগল-সাম্রাজ্য আওরঙ্গজেবের সময়েই উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হয়। আওরঙ্গজেব বলে ও কৌশলে অনেককে দিল্লীর শাসনাধীন করেন। যে কয়েকটি পরাক্রান্ত রাজ্য পূর্ব্বে স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছিল, আওরঙ্গজেবের সময়ে তাহার অনেকগুলি নানা কারণে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে। দক্ষিণাপথে শিবাজী স্বাধীনতার গৌরব রক্ষা করিতেছিলেন ; কিন্তু অসময়ে তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তি হওয়াতে আওরঙ্গজেবের প্রতাপ অনেকের ভীতিস্থল হইয়া উঠে। মোগল-সাম্রাজ্যের এই প্রতাপের সময়ে গুরুগোবিন্দ শিখদিগের উপর নূতন রাজত্ব স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন।

যমুনার পার্ব্বত্য প্রদেশে অপরিজ্ঞাত অবস্থায় গোবিন্দ বোধ হয় প্রায় ২০ বৎসর যাপন করেন। ইহার মধ্যে তাঁহার অনেক শিষ্য সংগৃহীত হয়। গোবিন্দ এক্ষণে পঞ্জাবে আসিয়া, এই শিষ্যদল লইয়া আপনার উদ্দেশ্যসাধনে উদ্যত হইলেন। শিক্ষা তাঁহার অন্তঃকরণ প্রশস্ত করিয়াছিল, ভূয়োদর্শন তাঁহার বিচার-শক্তি পরিমার্জ্জিত করিয়াছিল, এবং প্রগাঢ় কর্ত্তব্যজ্ঞান তাঁহার স্বভাব সমুন্নত করিয়াছিল। এখন একতা ও স্বার্থত্যাগ তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য হইল। তিনি সাধনায় অটল, সহিষ্ণুতায় অবিচলিত ও মন্ত্রসিদ্ধিতে অনলস হইলেন।

গোবিন্দ সাহসী, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও স্বজাতি-বৎসল ছিলেন। তিনি পৃথিবীর পাপাচার দেখিয়া দুঃখিত হইতেন এবং মুসলমান রাজগণের

অত্যাচারে আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া, ক্রোধ প্রকাশ করিতেন। তিনি মনে করিতেন, মানবজাতি সাধনাবলে মহৎ কার্য্য সাধন করিতে পারে। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, একাগ্রতা ও তেজস্বিতা লাভের জন্য এখন প্রগাঢ় সাধনার সময় উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার স্মৃতি বিগত সময়ের ঋষি ও বীরপুরুষদিগের কার্য্যালাপে পরিপূর্ণ থাকিত; তাঁহার বুদ্ধি পৃথিবীর শিক্ষার পথ পরিষ্কৃত করিবার উপায় উদ্ভাবনে নিয়োজিত হইত এবং তাঁহার অন্তঃকরণ সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার উন্মূলিত করিতে চেষ্টা করিত। তিনি শিষ্যদিগকে মহাপ্রাণ করিবার জন্য তাহাদের সম্মুখে পূর্ব্বতন কাহিনীর কীর্ত্তন করিতেন। দেবতাগণ কিরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া, দৈত্যগণের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন; সিদ্ধগণ কিরূপে আপনাদের সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; গোরক্ষনাথ ও রামানন্দ কিরূপে আপনাদের মত প্রচারিত করিয়াছেন; মহম্মদ কিরূপ বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রমপূর্ব্বক আপনাকে ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া লোকের মনের উপর আধিপত্য-স্থাপনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন; ইহাই তাঁহার বর্ণনীয় বিষয় ছিল। তিনি আপনাকে শর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের ভৃত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন এবং কহিতেন,—"ঈশ্বর কোনও নির্দ্দিষ্ট পুস্তকে আবদ্ধ নহেম, হৃদয়েয় সরলতা ও মনের সাধুতাতেই তিনি বিরাজ করিতেছেন।"

গোবিন্দ এইরূপে আপনার মত প্রচার করিলেন; এইরূপে তাঁহার শিষ্যগণ পৌরাণিক কাহিনী ও উপদেশ শুনিয়া মহাপ্রাণ হইতে লাগিল। গোবিন্দ যত্নপূর্ব্বক বৈদিক তত্ত্ব ও বৈদিক ক্রিয়া-কলাপের পর্য্যালোচনা করিতেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াও তিনি শারীরিক তেজস্বিতা-লাভে ঔদাসীন্য দেখান্ নাই। তাঁহার অসাধারণ কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও মানসিক স্থিরতা ছিল। তিনি নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে যাইয়া অর্জ্জুনের বিক্রম ও অর্জ্জুনের তেজস্বিতা লাভের নিমিত্ত সংযতচিত্তে

গভীর তপস্যায় নিমগ্ন থাকিতেন। ঈদৃশ আত্মসংযম ও ঈদৃশী গভীর চিন্তায় শিখ-সমাজে গোবিন্দের সম্মান ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

গোবিন্দ আপনার মহামন্ত্রে সিদ্ধ হইবার জন্য পার্থিব ভোগসুখে ঔদাস্য দেখাইতে লাগিলেন। অস্থায়ী সম্পত্তিতে তাঁহার হৃদয় আকৃষ্ট হইল না। আপনার বিষয়নিস্পৃহা দেখাইবার জন্য, শিষ্যদিগকে ভোগ বিলাস হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিয়া মহামন্ত্রসাধনে মহাবল করিবার নিমিত্ত তিনি স্বকীয় অর্থ শতদ্রুতে নিক্ষেপ করিলেন। একদা একজন শিখ সিন্ধুদেশ হইতে প্রায় ৫০,০০০ টাকা মূল্যের দুইখানি সুন্দর হস্তাভরণ আনিয়া তাঁহাকে দিল। গোবিন্দ প্রথমে ঐ আভরণ লইতে অসম্মত হইলেন, কিন্তু শেষে শিষ্যের আগ্রহ দেখিয়া অগত্যা হস্তে ধারণ করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার কিছুকাল পরেই তিনি নিকটবর্ত্তী নদীতে যাইয়া সেই আভরণের একখানি জলে ফেলিয়া দিলেন। শিষ্য গুরুর এক হাত আভরণ শূন্য দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, গোবিন্দ কহিলেন,—"একখানি অলঙ্কার জলে পড়িয়া গিয়াছে।" শিষ্য ইহা শুনিয়া একজন ডুবরী আনিয়া তাহাকে কহিল, "যদি সে অলঙ্কার তুলিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে পাঁচশত টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে।" ডুবরী সম্মত হইল। শিষ্য কোন্ স্থানে অলঙ্কার পড়িয়া গিয়াছে, তাহা ডুবরীকে দেখাইয়া দিবার জন্য গুরুকে বিনয়ের সহিত অনুরোধ করিল। গোবিন্দ নদীতে অবশিষ্ট অলঙ্কার-খানি ফেলিয়া দিয়া কহিলেন—"ঐখানে পড়িয়া গিয়াছে।" শিষ্য ভোগ-সুখে গুরুর এইরূপ অসাধারণ বিতৃষ্ণা দেখিয়া বিস্মিত হইল; শেষে আপনিও সর্ব্বপ্রকার ভোগবিলাস পরিত্যাগপূর্ব্বক জীবনের উদ্দেশ্য-সাধনে প্রতিজ্ঞা করিল।

গোবিন্দ এইরূপে বিষয়-বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক নূতন পদ্ধতিতে শিখ-সমাজ সংগঠিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি শিখদিগকে একত্র

করিয়া কহিলেন,—সর্ব্বান্তঃকরণে একেশ্বরের উপাসনা করিতে হইবে, কোনরূপ পার্থিব পদার্থ দ্বারা সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমপিতার মাহাত্ম্য বিকৃত করা হইবে না। সকলেই সরলহৃদয়ে ও একান্ত মনে ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া থাকিবে। সকলেই একতাসূত্রে সংবদ্ধ হইবে। এই সমাজে জাতির নিয়ম থাকিবে না; কুলমর্য্যাদার প্রাধান্য রক্ষিত হইবে না। ইহাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, ভদ্র, ইতর সকলেই সমভাবে পরিগৃহীত হইবে; সকলেই এক পঙ্‌ক্তিতে এক হাঁড়িতে ভোজন করিবে। ইহা তুরুকদিগকে বিনাশ করিতে যত্নপর থাকিবে এবং সকলকেই সজীব ও সতেজ হইতে শিক্ষা দিবে।” গোবিন্দ ইহা কহিয়া, স্বহস্তে একজন ব্রাহ্মণ, একজন ক্ষত্রিয় ও তিনজন শূদ্রজাতীয় বিশ্বস্ত শিষ্যের গাত্রে চিনির সরবৎ প্রক্ষেপ পূর্ব্বক তাহাদিগকে “খাল্‌সা” অর্থাৎ পবিত্র ও বিমুক্ত বলিয়া সম্বোধন করিলেন এবং যুদ্ধকার্য্য ও বীরত্বের পরিচয়সূচক “সিংহ” উপাধি দিয়া, আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ নিজেও এই উপাধি ধারণ করিয়া, গোবিন্দসিংহ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন।

গোবিন্দসিংহ এইরূপে জাতিগত পার্থক্য দূর করিয়া, সকলকেই এক সমভূমিতে আনিলেন, এবং সকলের হৃদয়েই নূতন শক্তি সঞ্চারিত করিলেন। জাতিভেদ রহিত হওয়াতে, উচ্চবর্ণের শিষ্যগণ প্রথমে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল; কিন্তু গোবিন্দসিংহের তেজস্বিতা ও কার্য্যকুশলতায় সে অসন্তোষ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না; শিষ্যগণ গুরুর অনির্ব্বচনীয় তেজোমহিমা দর্শনে বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া যথানির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা একেশ্বরবাদী হইয়া আদি-গুরু নানক ও তাঁহার উত্তরাধিবর্গের প্রতি যথোচিত সম্মান দেখাইতে লাগিল; রাজপুতদিগের ন্যায় “সিংহ” উপাধি ধারণ করিয়া দীর্ঘ কেশ ও দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখিতে লাগিল এবং অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া,

প্রকৃত যোদ্ধার পদে সমাসীন হইল। তাহাদের পরিচ্ছদ নীলবর্ণ হইল, "ওয়া গুরুজি কা খাল্‌সা ; ওয়া গুরুজি কা ফতে।" [খাল্‌সাই গুরু ; তাঁহার জয় হউক] তাহাদের সম্ভাষণবাক্য হইল। গোবিন্দসিংহ গুরুমঠ নামে একটি শাসন-সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অমৃতসরে ঐ সমিতির অধিবেশন হইতে লাগিল। যাহাতে সমুদয় অনৈক্যের মূলোচ্ছেদ হয়, যাহাতে শিখশাসন অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে অটল থাকে, সংক্ষেপে শিখগণ যাহাতে একপ্রাণতা, সমবেদনা প্রভৃতি জাতীয় জীবনের সমুদয় লক্ষণবিশিষ্ট হয়, তাহাই গুরুমঠের লক্ষ্য হইল।

গোবিন্দসিংহ এরূপে ধীরে ধীরে নূতন উপাদান লইয়া, শিখ-সমাজের সাধারণতন্ত্র স্থাপন করিলেন। শিখগণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকিয়া, সংযতচিত্ত যোগীর ন্যায় নিরীহভাবে কালাতিপাত করিত। তাহারা এক্ষণে একপ্রাণ হইয়া সাধারণতন্ত্রসমাজে সম্মিলিত হইল। গোবিন্দসিংহ জীবনের এক সাধনায় সিদ্ধ হইলেন, কিন্তু উহা অপেক্ষা উৎকট সাধনা অসিদ্ধ রহিল। তিনি পরাক্রান্ত মোগলদিগের মধ্যে সশস্ত্র খাল্‌সাদিগকে "সিংহ" উপাধি দিয়াছেন ; পণ্ডিত ও মৌলবী-দিগের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানদিগকে এক সমাজে নিবেশিত করিয়া-ছিলেন। গোবিন্দসিংহ আসন্নমৃত্যু পিতার বাক্য, পিতৃসমীপে স্বকীয় প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিলেন, এবং কালবিলম্ব না করিয়া, পিতৃহন্তা অত্যাচারী মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইলেন।

ভারতবর্ষের সমুদয় স্থলে মোগলশাসন সর্ব্বাংশে বদ্ধমূল ছিল না। অন্তর্বিদ্রোহ প্রভৃতিতে মোগল সাম্রাজ্য প্রায়ই বিশৃঙ্খল থাকিত। মোগল সাম্রাজ্যের স্থাপনকর্ত্তা বাবর শাহ নিরুদ্বেগে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। তৎপুত্র হুমায়ুন পাঠানবংশীয় সের সাহের পরাক্রমে রাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া দেশান্তরে ষোল বৎসর অতিবাহিত করেন। অক্‌বর যদিও প্রগাঢ় রাজনীতিজ্ঞতা ও যুদ্ধকুশলতায় প্রায়

পঞ্চাশ বৎসর কাল ভারতবর্ষে আধিপত্য করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাকে স্বীয় তনয় সলিমের কঠোর ব্যবহারে ও বঙ্গদেশের বিদ্রোহে বিব্রত হইতে হইয়াছিল। জাহাঁগীর ক্রূর ও ইন্দ্রিয়পর ছিলেন। তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারীরাও তাঁহার বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইতে কাতর হয়েন নাই। এক সময়ে তাঁহাকে তদীয় কর্ম্মচারী মহব্বৎ খাঁর বন্দিত্বও স্বীকার করিতে হইয়াছিল। শাহজহাঁ আপনার জীবদ্দশাতেই সিংহাসন লইয়া পুত্রদিগকে পরস্পর বিবাদ করিতে দেখেন, পরিশেষে তাঁহাদের মধ্যে অধিকতর ক্ষমতাপন্ন আওরঙ্গজেবের ক্রূরাচারে কারাগারে নিরুদ্ধ হয়েন। তিনি আপনার সন্দিগ্ধতা ও কঠোর ব্যবহারে অনেক শত্রু সংগ্রহ করেন। এক দিকে রাজসিংহ ও দুর্গাদাস স্বজাতির অপমানে উত্তেজিত হইয়া, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন; অপর দিকে শিবাজী মোগলের কঠোর শাসনে উত্তেজিত হইয়া, স্বদেশীয়ের নিস্তেজ শরীরে তেজস্বিতার সঞ্চার করেন। এক্ষণে গোবিন্দসিংহ পুনর্ব্বার ঐ তেজস্বিতার সঞ্চার করিয়া, জাঠদিগের উপর নূতন রাজ্য স্থাপন করিতে উদ্যত হইলেন।

গোবিন্দসিংহ এই উৎকট সাধনায় সিদ্ধ হইবার জন্য শিষ্যদিগকে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া, বিভিন্ন সৈনিকদল প্রস্তুত করিলেন। অপেক্ষাকৃত বিশ্বস্ত শিষ্যদিগের উপর এই সৈনিকদলের অধ্যক্ষতা সমর্পিত হইল; এতদ্ব্যতীত গোবিন্দসিংহ শিক্ষিত পাঠান সৈন্য আনিয়া আপনার দলবৃদ্ধি করিলেন। শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতের পাদদেশে তিনটি দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হইল। পার্ব্বত্য প্রদেশে সৈন্য স্থাপনপূর্ব্বক যুদ্ধ করা সুবিধাজনক ভাবিয়া, তিনি এ সকল দুর্গ সুব্যবস্থিত করিলেন; পরে উক্ত প্রদেশের সর্দ্দারদিগের উপর আধিপত্য-বিস্তারে উদ্যত হইলেন। এইরূপে গোবিন্দসিংহ মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করেন। তিনি ধর্ম্মপ্রচারক ও ধর্ম্মোপদেষ্টা হইয়া নানা স্থান হইতে শিষ্য

সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এখন যুদ্ধবীর সৈন্যাধ্যক্ষের পদে সমাসীন হইয়া সেনানিবাস নিরাপদ করিতে ও দুর্গ-সমূহের শৃঙ্খলাবিধানে যত্নশীল হইলেন।

প্রথমে মোগলদিগের সহিত কয়েক যুদ্ধে গোবিন্দসিংহের জয়লাভ হইল। কিন্তু শেষ যুদ্ধে গোবিন্দসিংহ পরাজিত হইলেন। তাঁহার জননী এবং দুইটি শিশুপুত্র সর্হিন্দের শাসনকর্ত্তার হস্তে পতিত হইল। এই শাসনকর্ত্তা ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমান ছিলেন। তিনি গোবিন্দসিংহের জননী ও পুত্রদ্বয়ের প্রাণসংহারে সম্মত হইলেন না। তাঁহার দেওয়ান পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, তথাপি তিনি ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্যে সম্মতি প্রকাশ করিলেন না। একদা গোবিন্দসিংহের পুত্রদ্বয় দরবারে উপস্থিত ছিল। নবাব তাহাদের সুদর্শন আকৃতি ও কমনীয় মাধুরী দেখিয়া সন্তুষ্টচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বালকগণ! যদি তোমাদের মুক্তিলাভ হয়, তাহা হইলে তোমরা কি করিবে?" বালক দুইটি গম্ভীরভাবে উত্তর দিল,— "আমাদের সৈন্য সংগ্রহ করিব; তাহাদিগকে অস্ত্রাদি দিব; এবং হয় যুদ্ধ করিয়া আপনাদিগকে পরাজয় করিব, নয় আমরাই পরাজিত হইব।" নবাব বালকদিগের এইরূপ তেজস্বিতা দর্শনে সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া, তাহাদিগকে দেওয়ানের হস্তে সমর্পণ করিলেন। দেওয়ান তাহাদের প্রাণসংহার করিল। গোবিন্দসিংহের জননী উহাদের শোকে দেহত্যাগ করিলেন। এইরূপ শোচনীয় ঘটনায় গোবিন্দসিংহ নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু স্বকীয় কর্ত্তব্যসম্পাদনে নিরস্ত হইলেন না। তাঁহার শিষ্যগণ যুদ্ধে যেরূপ পরাক্রম দেখাইয়াছিল, তাহাতে তিনি আশ্বস্ত হইয়া, মোগলদিগের মধ্যে শিখদিগের প্রাধান্য স্থাপন করিতে সবিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আওরঙ্গজেব এই তেজস্বী শিখগুরুর তেজস্বিতায় বিস্মিত হইয়া, তাঁহাকে আপনার নিকটে আসিতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু গোবিন্দসিংহ প্রথমে ঐ অনুরোধ রক্ষা

করেন নাই; তিনি নানকের ধর্ম্মসংস্কার, অর্জ্জুন ও তেগবাহাদুরের শোচনীয় পরিণাম এবং নিজের অপুত্রাবস্থার উল্লেখ করিয়া কহেন,—"আমি এখন কোনরূপ পার্থিব বন্ধনে আবদ্ধ নই; স্থিরচিত্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছি। সেই রাজার রাজা অদ্বিতীয় সম্রাট্ ব্যতীত কেহই আমার ভীতিস্থল নহেন। এই উত্তর পাইয়াও আওরঙ্গজেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন; গোবিন্দসিংহ এবার সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত হয়েন। কিন্তু তাঁহার উপস্থিতির পূর্ব্বেই বৃদ্ধ মোগল-সম্রাটের পরলোকপ্রাপ্তি হয়। আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারী বাহাদুর শাহ গোবিন্দসিংহের প্রতি বিলক্ষণ সৌজন্য প্রদর্শন করেন। কিন্তু গোবিন্দসিংহ দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া জগতে আপনার অসাধারণ কৃতকার্য্যতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও আয়ুষ্কাল পূর্ণ হয়। গোবিন্দসিংহ যখন দক্ষিণাপথে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন একজন পাঠান তাঁহার হস্তে নিহত হয়। এই পাঠানের পুত্রগণ একদা গোপনে গোবিন্দসিংহের শিবিরে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাকে অস্ত্রাঘাত করে। এই আঘাতেই গোবিন্দের মৃত্যু হয়। ১৩০৮ অব্দে গোদাবরীর তীরবর্ত্তী নাদর-নামক স্থানে এই শোচনীয় কাণ্ড ঘটে। এই সময় গোবিন্দসিংহের বয়স ৪৮ বৎসর মাত্র হইয়াছিল।

গোবিন্দসিংহ শিখ-সমাজের জীবন-দাতা। তাঁহার সময় হইতেই শিখগণ মহাসত্ত্ব বলিয়া বিখ্যাত হয়। গুরু নানক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রসিদ্ধ। গোবিন্দসিংহ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের একপ্রাণতা ও স্বাধীনতার নিদান। তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ; তাঁহার সাধনা গভীর; তাঁহার বীরত্ব অসাধারণ এবং তাঁহার মানসিক স্থিরতা অতুল্য। তিনি হিন্দু ও মুসলমানকে এক ভূমিতে আনয়ন করেন; এই জন্যই তিনি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকে এক শ্রেণীতে নিবেশিত করেন; এবং এই জন্যই তিনি গর্ব্বসহকারে সম্রাট্ আওরঙ্গজেবকে লিখেন,—"তুমি হিন্দুকে মুসলমান

করিতেছ, কিন্তু আমি মুসলমানকে হিন্দু করিব। তুমি আপনাকে নিরাপদ ভাবিতেছ, কিন্তু সাবধান, আমার শিক্ষাবলে চটক শ্যেনকে ভূতলে পাতিত করিবে।" তেজস্বী শিখ-গুরুর এই তেজোগর্ভ বাক্য নিষ্ফল হয় নাই! তাঁহার মন্ত্রবলে চটকগণ যথার্থই শ্যেনকে যথোচিত শিক্ষা দিয়াছে।

গোবিন্দসিংহ তরুণ বয়সে নিহত হয়েন। তিনি আরও কিছুদিন জীবিত থাকিলে, অনেক মহৎকার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারিতেন। মহম্মদ নিরাপদে মদিনায় পলায়ন করিতে না পারিলে, পৃথিবীর ইতিহাস বোধ হয়, প্রায় বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইত। গোবিন্দসিংহ আপনার মহামন্ত্রসাধনে উদ্যত না হইলে, শিখদিগের নাম, বোধ হয়, ইতিহাস হইতে প্রায় বিলুপ্ত হইত। গোবিন্দসিংহ অল্পবয়সে ও অল্পসময়ের মধ্যে শিখসমাজে যে জীবনী-শক্তি ও যে তেজস্বিতা প্রসারিত করেন, তাহাতে নির্জীব, নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয় ভারতে শিখগণ আজ পর্য্যন্ত সজীব রহিয়াছে; তাহাতে নওশেরা, রামনগর ও চিনিয়াবালার নাম আজ পর্য্যন্ত ইতিহাসে বিরাজ করিতেছে। গোবিন্দসিংহের নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তির বিলয় হয় নাই। যখন জলকোলাহল-পূর্ণ সুশোভন নগরী বিজন অরণ্যে পরিণত হইবে, যখন শত্রুর দুরধিগম্য রাজপ্রাসাদ অজ্ঞাত, অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অদীন-পরাক্রম বৈদেশিকের বিজয়-পতাকায় শোভিত রহিবে, যখন তরঙ্গাবর্ত্তময়ী বিশাল তরঙ্গিণী স্বল্পতোয় গোষ্পদের আকার ধারণ করিবে, অথবা স্বল্পতোয় গোষ্পদ ভীষণমূর্ত্তি তরঙ্গিণীতে পরিণত হইয়া ভৈরব-রবে জলধির উদ্দেশে প্রধাবিত হইবে, তখনও গোবিন্দসিংহের মহাপ্রাণতা, কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও উদারতা পৃথিবীতে জাজ্বল্যমান রহিবে; তখনও গোবিন্দসিংহের পবিত্র নাম পবিত্র ইতিহাসে অঙ্কিত থাকিবে।

শিখদিগের স্বাধীনতা।

(রণজিৎ সিংহ)

খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে মোগল-সাম্রাজ্যের অধোগতির সূত্রপাত হয়। সম্রাটের পর সম্রাট্, দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত, পদচ্যুত ও নিহত হইতে থাকেন; শাসনকর্ত্তার পর শাসনকর্ত্তা সম্রাটের আদেশে অবজ্ঞা দেখাইয়া, আপনাদের ইচ্ছানুসারে শাসনদণ্ডের পরিচালনায় প্রবৃত্ত হয়েন। পরাক্রান্ত নাদির শাহের আক্রমণে মোগল-সম্রাটের প্রিয়-নিকেতন দেয়ানিখাশ ও দেওয়ানি আম সভা-গৃহের লীলাভূমি সুশোভন দিল্লী মহাশ্মশানের আকারে পরিণত হয়। ইহার পর দোর্‌রাণী ভূপতি আহম্মদ শাহ সাহসী আফগান সৈন্যের সহিত ভারতবর্ষে সমাগত হয়েন। ইঁহার পরাক্রমে পাণিপথের প্রসিদ্ধ যুদ্ধে মহাবল মহারাষ্ট্রীয়দের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত হয়। দিল্লীর সম্রাট্ রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া হীনভাবে বিহার প্রদেশে উপনীত হয়েন। এই বিশৃঙ্খলতার সময়ে—বিলুণ্ঠন, বিপ্লব ও বিধ্বংশের ভয়াবহ রাজ্যে শিখগণ আপনাদের তেজস্বিতা অক্ষত রাখিয়াছিল। গোবিন্দসিংহ তাহাদিগকে যে মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, তাহারা সে মন্ত্র হইতে কখনও বিচ্যুত হয় নাই। তাহাদের মধ্যে সাহসী সেনাপতি ও সুদক্ষ শাসনকর্ত্তার অধীনে সজ্জিত হইয়া, আপনাদের অধিকার সুরক্ষিত করিতেছিল। যাহারা অস্ত্রচালনায় তৎপর ও অশ্বারোহণে নিপুণ না হইত, খালসাদিগের মধ্যে তাহাদের সম্মান বা প্রাধান্য থাকিত না। সুতরাং প্রত্যেক খালসাকেই অস্ত্রসঞ্চালনে ও অশ্বারোহণে নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে হইত। ক্রমে খালসারা অনেক দলে বিভক্ত হয়। প্রত্যেক দলের এক এক জন সর্দ্দার এক একটি নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। এইরূপে সমগ্র শিখ জনপদ অনেকগুলি

খণ্ড-রাজ্যে বিভক্ত হইয়া উঠে। এই সকল খণ্ড "মিসিল" নামে অভিহিত হয়। প্রত্যেক মিসিলের অধিপতি সর্ব্বাংশে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। খাল্‌সারা এইরূপ বহু মিসিলে বিভক্ত হইলেও ভ্রাতৃভাব হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই। তাহাদের সকলেই পরস্পর দুশ্ছেদ্য জাতীয় বন্ধনে আবদ্ধ থাকিত এবং সকলেই প্রতি বৎসর অমৃতসরের পবিত্র মন্দিরে সমাগত হইয়া, আপনাদের উন্নতি-সাধনের উপায় নির্দ্ধারণ করিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন ইংরেজ বণিকেরা দক্ষিণাপথে ফরাসীদিগের প্রাধান্য বিলুপ্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, একজন বর্ষীয়ান্ মুসলমান সৈনিক পুরুষ মহীশূরের সিংহাসন অধিকার করিয়া, যখন সকলের হৃদয়ে বিস্ময় ও আতঙ্কের সঞ্চার করিতেছিলেন, তখন শিখদিগের খণ্ড-রাজ্যে একজন ক্ষমতাশালী ও কার্য্যকুশল ব্যক্তির আবির্ভাব হয়। এই মহাপুরুষের আবির্ভাবে শিখেরা আবার বলীয়ান্ হইয়া উঠে। ইঁহার নাম রণজিৎ সিংহ। সমগ্র পৃথিবীতে যত ক্ষমতাপন্ন মহৎ ব্যক্তি আবির্ভূত হইয়াছেন, মহারাজ রণজিৎ সিংহ তাঁহাদের অন্যতম। রণজিৎ সিংহের পিতা মহাসিংহ একটি মিসিলে কর্ত্তৃত্ব করিতেন। রণজিৎ সিংহ ১৭৮০ অব্দের ২রা নবেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। মহাসিংহ অতিশয় সাহসী ও রণ-পণ্ডিত ছিলেন। রণজিৎ সর্ব্বাংশে পিতার ঐ সাহস ও রণপাণ্ডিত্য অধিকার করেন। বাল্যকালে বসন্ত-রোগে তাঁহার একটি চক্ষু নষ্ট হয়; এজন্য তিনি সাধারণের মধ্যে "কাণা রণজিৎ" নামে প্রসিদ্ধ হয়েন। রণজিৎ সিংহের বয়স আট বৎসর, এমন সময়ে মহাসিংহের দেহাত্যয় হয়। রণজিৎ এই সময় তাঁহার মাতা এবং পিতার দেওয়ান লক্ষ্মীপৎ সিংহের রক্ষাধীন হয়েন। রণজিৎ খর্ব্বকায় ছিলেন। কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি, সাহস ও পরাক্রম অসাধারণ ছিল। তিনি বুদ্ধি, সাহস ও পরাক্রমের উপর নির্ভর করিয়া আপনার

পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ।

প্রাধান্য স্থাপনে উদ্যত হয়েন। এই সময়ে পঞ্জাবে দোর্‌রাণী ভূপতির আধিপত্য ছিল। ইংরেজেরা ক্রমে প্রবল হইয়া, আপনাদের অধিকার প্রসারিত করিতেছিলেন। সিন্ধিয়া ও হোলকার বল সংগ্রহ করিয়া ক্রমে ইংরেজদিগের ক্ষমতাস্পর্দ্ধী হইয়া উঠিয়াছিলেন। রণজিৎ সিংহ ইঁহাদের মধ্যে আপনার আধিপত্য স্থাপন করেন। তিনি আহম্মদ শাহ দোর্‌রাণীর পৌত্র জেমান শাহের বিশেষ সাহায্য করাতে পুরস্কারস্বরূপ লাহোরের আধিপত্য প্রাপ্ত হয়েন। ক্রমে শিখদিগের মণ্ডলে তাঁহার ক্ষমতা বর্দ্ধিত হয়। ক্রমে সমগ্র মণ্ডল তাঁহার আয়ত্ত হইয়া উঠে।

পাঠানেরা যেরূপে ভারতবর্ষে সমাগত হয়, হিন্দুরাজগণের মধ্যে অনৈক্য দেখিয়া, যেরূপ চাতুরী অবলম্বন পূর্ব্বক দেব-বাঞ্ছনীয় পবিত্র ভূমি হস্তগত করে, তাহা ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নাই। মহারাজ রণজিৎ সিংহ পাঠানদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। যাহারা শঠতার বলে ভারতবর্ষে অধিকার স্থাপন করিয়াছিল, তাহাদের হস্ত হইতে ভারতের খণ্ড-রাজ্য সকল উদ্ধার করিতে তিনি যথাশক্তি প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রয়াস অনেকাংশে সফল হইয়াছিল। তিনি প্রথমে আফগানদিগকে দূরীভূত করিয়া মুলতান অধিকার করেন; পরে ভারতের নন্দন-কানন কাশ্মীরে জয়-পতাকা উড়াইয়া দেন। কাশ্মীরে অধিকার-স্থাপন-সময়ে মহারাজ রণজিৎ সিংহের পুত্র খড়্গ সিংহ সৈনিকদলের অগ্রভাগে ছিলেন। রণজিতের সাহসী অশ্বারোহিগণ পদাতি সৈনিকগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া, পদব্রজে দুরারোহ পর্ব্বত অতিক্রমপূর্ব্বক কাশ্মীরে উপস্থিত হয়। শিখদিগের বিক্রমে আফগান-সেনাপতি জব্বর খাঁ পরাজয় স্বীকার করেন। বহুদিনের পর হিন্দু নরপতির বিজয়-পতাকায় কাশ্মীর আবার শোভিত হইয়া উঠে। ইহার পর রণজিৎ সিংহ পেশাবর অধিকার করিতে উদ্যত হয়েন। ১৮১৩ অব্দের ২৩শে মার্চ্চ ভারতবর্ষের একটি স্মর-

নীয় দিন। যাহারা দৃশদ্বতীর তীরে হিন্দুদিগকে পরাজিত করিয়া ভারতবর্ষে আধিপত্যের সূত্রপাত করে, শিখেরা এই দিনে তাহাদের দেশে আপনাদের জয়-পতাকা স্থাপন করিতে অগ্রসর হয়। আর্য্যাবর্ত্তের হিন্দু নৃপতি এই দিনে এই শেষ বার, সিন্ধুনদের অপর পারে হিন্দু-বিজয়ী পাঠানের শোণিত-জলে, পৃথ্বীরাজ ও সমরসিংহের আত্মার পরিতর্পণ করিতে উপস্থিত হয়েন। মহারাজ রণজিৎ সিংহ অকুতোভয়ে ও বিপুল সাহসে পাঠানের রাজ্যে উপনীত হইলেন। আফগানিস্তানের প্রধান সর্দ্দার মহম্মদ আজিম খাঁ বহুসংখ্য সৈন্য একত্র করিয়াছিলেন, বহুসংখ্য সৈন্য আফগানিস্তানের পার্ব্বত্য প্রদেশে উপনীত হইয়াছিল। ১৪ই মার্চ্চ কাবুল নদীর পার্শ্ববর্ত্তী নওশেরার নিকটবর্ত্তী থেরাই-নামক স্থানে ইহাদের সহিত রণজিৎ সিংহের যুদ্ধারম্ভ হইল। এই মহাসমরে মহাবীর রণজিৎ সিংহ অশ্বারোহীদিগের অগ্রভাগে থাকিয়া বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। বিশালদেহ আফগানগণ অটল পর্ব্বতের ন্যায় দাঁড়াইয়া অপ্রতিহত-বিক্রমে এই আক্রমণে বাধা দিতে লাগিল। সমস্ত দিন যুদ্ধ হইল; বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই; সমস্ত দিন শিখেরা অতুল্য বিক্রমের সহিত আফগানদিগের ব্যূহ ভেদ করিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি সমাগত হইল। ক্রমে গভীর অন্ধকার গভীরতর হইয়া রণস্থল ঢাকিয়া ফেলিল। শোণিতনদী এই অন্ধকারের মধ্যে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তথাপি রণজিৎ সিংহ যুদ্ধে বিরত হইলেন না; তিনি পূর্ব্বের ন্যায় লোকাতীত বিক্রমে বিপক্ষসৈন্য নির্ম্মূল করিতে লাগিলেন। শেষে আফগানেরা পঞ্জাব-কেশরীর পরাক্রম সহিতে পারিল না। তাহারা অন্ধকারে আত্মগোপন-পূর্ব্বক রণস্থল হইতে পলায়ন করিল। পঞ্জাব-কেশরীর বিজয়-পতাকা পাঠানদিগের অধিকৃত জনপদে উড্ডীন হইয়া, নৈশ সমীরণে দুলিতে দুলিতে বিপক্ষদিগকে তর্জ্জন করিতে লাগিল। খ্রীঃ উনবিংশ শতাব্দীতে

ভারতের বীরপুরুষ এইরূপ পরাক্রম দেখাইয়াছিলেন। এইরূপে পাঠানগণ ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিখদিগের পরাক্রমের নিকটে মস্তক অবনত করিয়াছিল।

মহারাজ রণজিৎ সিংহ জাতি-প্রতিষ্ঠার বলে এইরূপে দুর্জ্জেয় হইয়া পঞ্জাব শাসন করেন। তাঁহার অধিকার তদীয় রাজধানী লাহোর হইতে উত্তরে কাশ্মীর, পশ্চিমে পেশাবর, দক্ষিণে মুলতান এবং পূর্ব্বে শতদ্রু পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়; তাঁহার যুদ্ধকুশল সৈন্য ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে শিক্ষা পাইয়া বীরেন্দ্র-সমাজের বরণীয় হইয়া উঠে। রণজিৎ সিংহ ইংরেজদিগের সহিত সান্ধস্থত্রে আবদ্ধ ছিলেন; তিনি পরাক্রান্ত হইলেও ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া মিত্রতা কলঙ্কিত করেন নাই।

রণজিৎ সিংহের জীবনী-লেখক বলিয়াছিলেন,—"রণজিৎ সিংহ যথার্থ সিংহের মত ছিলেন, এবং সিংহের মতই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।" এই সিংহবিক্রম বীরপ্রবরের সমস্ত কথা এ স্থলে আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করা সম্ভব নহে। যাঁহারা যথানিয়মে শিক্ষা পাইয়া, জগতের সমক্ষে অসাধারণ কার্য্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত এই মহাপুরুষের তুলনা করাও উচিত নহে। রণজিৎ সিংহের সাহস, ক্ষমতা ও বুদ্ধি অন্যের প্রদত্ত শিক্ষায় পরিস্ফুট হয় নাই। এগুলি আপনা হইতেই বিকাশ পাইয়াছিল। রণজিৎ সিংহ স্বভাবসিদ্ধ প্রতিভা ও দক্ষতা-গুণে জগতে মহৎ লোকের সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। আপনার সৈনিকদিগকে সুশিক্ষিত ও রণপারদর্শী করা, তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্যকার্য্য ছিল। তিনি এই কর্ত্তব্যকর্ম্মে কখনও ঔদাসীন্য দেখান নাই। ফরিদ খাঁ শূর একাকী ব্যাঘ্র বধ করিয়া 'শের শাহ' নাম ধারণপূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। অস্তাজিলো নামক একজন বীরপুরুষ এক সময়ে ঐরূপ সাহস দেখাইয়া,

'শের আঁফগান' নাম পরিগ্রহপূর্ব্বক অতুল লাবণ্যবতী নূরজাহানের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ইতিহাস এই দুই বীরের সাহসের কথায় আজ পর্য্যন্ত সকলের বিস্ময় জন্মাইতেছে। কিন্তু রণজিতের সাহসী শিখ মৃগয়াসময়ে একাকী পশুরাজ সিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়া, তাহার ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত করিতেও কাতর হয় নাই। তাহারা ইহা অপেক্ষাও অধিকতর সাহস ও ক্ষমতা দেখাইয়াছে। তাহারা অশ্বারোহণে, অস্ত্রসঞ্চালনে ও শত্রুপক্ষের ব্যূহভেদে পৃথিবীর যে কোন যুদ্ধবীরের তুল্য যোগ্যতা দেখাইয়াছে।

বস্তুতঃ রণজিৎ সিংহ বীর-লীলাস্থল ভারতবর্ষের যথার্থ বীরপুরুষ। খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে তাঁহার ন্যায় বীরপুরুষের আবির্ভাব হয় নাই। হিন্দুরাজচক্রবর্ত্তী পৃথ্বীরাজ যখন তিরৌরীর পবিত্র ক্ষেত্রে পাঠানদিগকে পরাজিত ও দূরীভূত করিয়াছিলেন, এবং শেষে যখন পুণ্যসলিলা দৃশদ্বতীর তটে গিয়া গরীয়সী জন্মভূমির জন্য অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার বীরত্বে শত্রুর হৃদয়েও বিস্ময়ের আবির্ভাব হইয়াছিল; অদীন-পরাক্রম প্রতাপসিংহ যখন ভারতের থর্ম্মাপলি, পুণ্যপুঞ্জময় মহাতীর্থ—হল্‌দিঘাটে স্বদেশীয়গণের শোণিত-তরঙ্গিণীর তরঙ্গোচ্ছ্বাস দেখিয়াও ধীর গম্ভীর স্বরে কহিয়াছিলেন,—"এই ভাবে দেহ বিসর্জ্জনের জন্যই রাজপুতগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে।" তখন তাঁহার মহাপ্রাণতা ও স্বদেশের জন্য তাঁহার অনির্ব্বচনীয় আত্মত্যাগ দেখিয়া বিধর্ম্মী শত্রুও শতমুখে তদীয় প্রশংসাগীতি গাইয়াছিল; মহাবিক্রম শিবাজী যখন পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতে যাইয়া, বিজয়ভেরীর গভীর নিনাদে ভারতকে জাগাইয়াছিলেন, তখন ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাট্ও তাঁহার স্বদেশভক্তি ও বীরত্বে মোহিত হইয়াছিলেন। ভারতভূমি এক সময়ে এইরূপ বীরপুরুষগণের অনন্ত মহিমায় গৌরবান্বিত হইয়াছিল; উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম এক হইয়া এক সময়ে এই বীরপুরুষ-

গণের অনন্ত ও অক্ষয় কীর্ত্তির কাহিনী ঘোষণা করিয়াছিল। কিন্তু এই বীরত্ববৈভব শিবাজীর সহিতই তিরোহিত হয় নাই। যে বীর্য্যবহ্নির উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গে ভারতের মুসলমান-রাজগণের হৃদয় দগ্ধ হইয়াছিল; তাহা মহাশক্তির ভক্ত শক্তিশালী ভূপতির সঙ্গে সঙ্গেই নির্ব্বাপিত হয় নাই। শিবাজীর পর গুরু গোবিন্দ সিংহের মহামন্ত্রে সঞ্জীবিত হইয়া, রণজিৎ সিংহ আবার ভারতে ঐ মহাশক্তির উদ্বোধন করিয়াছিলেন; আবার বীরত্বমহিমা প্রসারিত করিয়া শিখদিগকে প্রমত্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

বালকের বীরত্ব।

(বাদল)

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে খিলজী সম্রাট্ আলাউদ্দীন যখন চিতোর অবরোধ করেন, চিতোরের অপ্রাপ্তবয়স্ক অধিপতি লক্ষ্মণসিংহের খুল্লতাত ভীম-সিংহ যখন আপনার শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রের রাজ্যরক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েন. তখন একটি বীর বালক অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দেয়; আত্ম-সম্মান—আত্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্য, গরীয়সী বীরভূমির গৌরববৃদ্ধির নিমিত্ত, নির্ভয়ে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, বিপক্ষসৈন্য পরাজিত ও নির্ম্মূল করে। এই বীরবালকের বীরত্বকাহিনী কবির রসময়ী কবিতায়, ঐতিহাসিকের অপক্ষপাত বর্ণনায় গ্রথিত হইবার যোগ্য।

পাঠান বীরভূমির দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে, ভীমবেশে ভীম-সিংহের বনিতার মর্য্যাদানাশ করিতে হস্ত প্রসারণ করিয়াছে। আজ বীরভূমি উন্মত্ত—আজ রাজপুতবীরেরা বংশের গৌরবরক্ষায় প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ। পাঠানভূপতি পদ্মিনীর অসামান্য রূপলাবণ্যের কথায় মোহিত

হইয়াছেন; অলৌকিক গুণগৌরবের বর্ণনায় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন; এ মোহ, এ উত্তেজনার আবেগে তিনি আজ চিতোর আক্রমণ করিতে সমুদ্যত; অকলঙ্ক রাজপুতবংশে কলঙ্কের কালিমা সমর্পণে সমুত্থিত। কিন্তু তাঁহার আশা ফলবতী হইল না। চিতোরের অধিকারে অকৃতকার্য্য হইয়া, আলাউদ্দীন অবশেষে পদ্মিনীকে ক্ষণকালমাত্র দেখিবার অভিপ্রায় জানাইলেন। রাজপুতবীর, দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব দেখাইবার প্রস্তাব করিলেন। এ প্রস্তাবে আলাউদ্দীন অসম্মত হইলেন না; বন্ধুভাবে চিতোরের প্রাসাদে আসিয়া, পদ্মিনীর পদ্মকান্তির প্রতিবিম্ব দেখিলেন। মুহূর্ত্তমাত্র তাঁহার লোচনদ্বয় বিস্ফারিত হইল। মুহূর্ত্তমাত্র লাবণ্যময়ী ললনার অনুপম লাবণ্যসাগরে তাঁহার হৃদয় ডুবিয়া গেল। আলাউদ্দীনের আশা চরিতার্থ হইল; কিন্তু তাঁহার হৃদয় হইতে পদ্মিনীর চিত্তবিমোহিনী মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল না; আলাউদ্দীন কৃত্রিম বন্ধুতা দেখাইয়া ভীমসিংহকে চিতোরের গিরিদুর্গের বাহিরে লইয়া গেলেন। সরলহৃদয় রাজপুত পাঠানের চাতুরী বুঝিতে পারিলেন না; তিনি বন্ধুভাবে আলাউদ্দীনের সঙ্গে গেলেন। আলাউদ্দীন তখন সুযোগ পাইয়া, ভীমসিংহকে বন্দী করিলেন এবং তাঁহাকে আপনার শিবিরে লইয়া গিয়া বলিলেন,—"যাবৎ পদ্মিনী হস্তগত না হইবে, তাবৎ তাঁহাকে মুক্ত করা হইবে না।"

পরাক্রান্ত ভীমসিংহ শত্রুর আয়ত্ত হইয়াছেন, পাঠান আবার পবিত্র কুলের পবিত্রতা নষ্ট করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে। আজ চিতোরের সকলেই বিষণ্ণ। কিন্তু রাজপুত বীর দীর্ঘকাল বিষণ্ণতায় অভিভূত থাকিবার নহে। অবিলম্বে সকলে প্রসন্নভাবে ভীমসিংহের উদ্ধারে কৃতসংকল্প হইল। বীর্য্যবন্ত রাজপুতের প্রণয়িনী পাঠানের হস্তগত হইবে, পাঠান অবলীলাক্রমে সৌন্দর্য্য-গরিমার—সতীধর্ম্মের মর্য্যাদা নষ্ট করিবে, পবিত্র কুসুম পাঠানের হস্তস্পর্শে কলঙ্কিত হইবে, ইহা রাজপুত বীর প্রাণ

গৃহে একেবারে প্রায় হাজার লোকের ভোজন হইতে পারিত। উৎসবের অনেক পূর্ব্বে ঘোষণা দ্বারা, ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, নিরাশ্রয়, দুঃখী, পিতৃহীন, মাতৃহীন, আত্মীয়বন্ধুশূন্য নিঃস্ব ব্যক্তিদিগকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে পবিত্র প্রয়াগে উপস্থিত হইয়া, দানগ্রহণের জন্য আহ্বান করা হইত। মহারাজ শিলাদিত্য আপনার মন্ত্রী ও করদ রাজগণের সহিত ঐ স্থানে উপস্থিত থাকিতেন। বল্লভীরাজ্যের অধিপতি ধ্রুবপতি এবং আসাম-রাজ ভাস্করবর্ম্মা করদ রাজগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন। ঐ দুই করদ ভূপতির ও মহারাজ শিলাদিত্যের সৈন্য সন্তোষক্ষেত্রের চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া থাকিত। ধ্রুবপতির সৈন্যের পশ্চিমে বহুসংখ্যক অভ্যাগত লোক আপনাদের তাম্বু স্থাপন করিত, এইরূপ সুশৃঙ্খলা সুবুদ্ধির পরিচায়ক ছিল। বিতরণসময়ে অথবা তৎপূর্ব্বে সন্তোষক্ষেত্রের রাশীকৃত ধন দুষ্টলোকে আত্মসাৎ করিতে পারে, এই আশঙ্কায় উহার চারিদিক্ সৈন্যদ্বারা সুরক্ষিত করা হইত। ঐ ক্ষেত্র গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলের ঠিক পশ্চিমে ছিল। শিলাদিত্য আপনার সৈনিকগণের সহিত গঙ্গার উত্তর তীরে থাকিতেন; ধ্রুবপতি ক্ষেত্রের পশ্চিমে এবং ক্ষেত্র ও অভ্যাগত দলের মধ্যভাগে সৈন্যস্থাপন করিতেন। ভাস্করবর্ম্মা যমুনার দক্ষিণ তটে আপনার সৈনিকদল রাখিতেন।

অসীম আড়ম্বরের সহিত উৎসবের আরম্ভ হইত। শিলাদিত্য বৌদ্ধধর্ম্মের পরিপোষক হইলেও হিন্দুধর্ম্মের অবমাননা করিতেন না। তিনি ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, উভয়কেই আদর সহকারে আহ্বান করিতেন, এবং বুদ্ধের প্রতিকৃতি ও হিন্দু-দেবমূর্ত্তি, উভয়ের প্রতিই সম্মান দেখাইতেন। প্রথম দিন পবিত্র মন্দিরে বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইত। এই দিনে সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য দ্রব্য বিতরিত এবং সর্ব্বাপেক্ষা সুখাদ্য দ্রব্য অতিথি অভ্যাগতদিগকে প্রদত্ত হইত। দ্বিতীয় দিনে বিষ্ণু এবং তৃতীয় দিনে শিবের মূর্ত্তি মন্দিরের শোভাসম্পাদন করিত।

প্রথম দিনের বিতরিত দ্রব্যের অর্দ্ধাংশ এই এক এক দিনে বিতরিত হইত। চতুর্থ দিন হইতে সাধারণ দানকার্য্য আরম্ভ হইত। কুড়িদিন ব্রাহ্মণ ও শ্রমণেরা, দশ দিন হিন্দু দেবতাপূজকেরা এবং দশ দিন পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরা দান গ্রহণ করিতেন। এতদ্ব্যতীত ত্রিশদিন পর্য্যন্ত দরিদ্র, নিরাশ্রয়, পিতৃহীন, মাতৃহীন ও আত্মীয়বন্ধুশূন্য ব্যক্তিদিগকে ধন দান করা হইত। সমুদয়ে পঁচাত্তর দিন পর্য্যন্ত উৎসবের কার্য্য চলিত। শেষ দিনে মহারাজ শিলাদিত্য আপনার বহুমূল্য পরিচ্ছদ, মণিমুক্তাখচিত স্বর্ণাভরণ, অত্যুজ্জ্বল মুক্তাহার প্রভৃতি সমুদয় অলঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক চীরশোভী বৌদ্ধ-ভিক্ষুক বেশ পরিগ্রহ করিতেন। এই বহুমূল্য আভরণরাশিও দরিদ্রদিগকে দান করা হইত। চীর ধারণ করিয়া, মহারাজ শিলাদিত্য যোড়হাতে গম্ভীরস্বরে কহিতেন; —"আজ আমার সম্পত্তিরক্ষার সমুদয় চিন্তার অবসান হইল। এই সন্তোষক্ষেত্রে আজ আমি সমুদয় দান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। মানবের অভীষ্ট পুণ্যসঞ্চয়ের মানসে ভবিষ্যতেও আমি এইরূপে দান করিবার জন্য আমার সমস্ত সম্পত্তি রাশীকৃত করিয়া রাখিব।" এইরূপে পুণ্যভূমি প্রয়াগে সন্তোষক্ষেত্রের উৎসব পরিসমাপ্ত হইত। মহারাজ মুক্তহস্তে প্রায় সমস্তই দান করিতেন। কেবল রাজ্য রক্ষা ও বিদ্রোহ-দমন জন্য হস্তী, ঘোটক ও অস্ত্রাদি অবশিষ্ট থাকিত।

হিন্দুর পবিত্র তীর্থ প্রয়াগে চীনদেশীয় শ্রমণ হিউএন্থ্ সঙ্গ্ এইরূপ মহোৎসব দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া, ভারতের প্রাচীন ভূপতিগণ আপনাদিগকে অনন্ত সন্তোষ ও অন্তিমে অনন্ত পুণ্যের অধিকারী বলিয়া মনে করিতেন। ধর্ম্মপরায়ণ রাজারা ধর্ম্মসঞ্চয়-মানসে ঐ উৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন বটে, কিন্তু উহার সহিত রাজনৈতিক বিষয়েরও কিয়দংশে সংস্রব ছিল। ভারতের রাজগণ এই সময়ে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের

একান্ত আয়ত্ত ছিলেন। ইহাদিগকে সকল সময়ে ঐ উভয় দলের পরামর্শ অনুসারে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইত। যাহাতে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের মধ্যে কোনরূপ অসন্তোষের আবির্ভাব না হয়, যাহাতে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণেরা সর্ব্বদা রাজ্যের মঙ্গল চিন্তা করেন, তৎপ্রতি রাজাদের দৃষ্টি ছিল। ঐ উৎসবে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ উভয়কেই সমান আদরের সহিত ধন দান করা হইত। উভয়েই সমান আদরের সহিত পরিগৃহীত হইতেন; এজন্যে ইহারা সর্ব্বদা দানবীর রাজার কুশল কামনা করিতেন, এবং যে রাজ্যে এমন অসাধারণ ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, সেই রাজ্যের উন্নতির উপায়-নির্দ্ধারণে সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিতেন। এদিকে সাধারণেও ঐ অসাধারণ ব্যাপার দেখিয়া, রাজাকে মহতী দেবতা বলিয়া তৎপ্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করিত। এইরূপে রাজা সাধারণের মনের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতেন। অধিকন্তু যে সকল সাহসী দস্যু রাজার ধনে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিয়া, শেষে রাজসিংহাসনগ্রহণে উদ্যত হয়, তাহারা সন্তোষক্ষেত্রের দানে রাজার অর্থাভাব দেখিয়া, আপনাদের সাহসিক কার্য্যে নিরুদ্যম ও নিশ্চেষ্ট থাকিত। রাজনৈতিক ফল যাহাই হউক না কেন, সন্তোষক্ষেত্রের উৎসবে আর্য্যকীর্ত্তির মহিমা অনেকাংশে হৃদয়ঙ্গম হয়। যদি ভারতবর্ষ পর-বশবর্ত্তী না হইত, যদি বৈদেশিক সভ্যতাস্রোত ভারতের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে গতিবিস্তার না করিত, ভারতের সন্তানগণ যদি আপনাদের জাতীয়ভাব বিসর্জ্জন না দিত, তাহা হইলে বোধ হয়, আজও ভারতবর্ষে ঐ প্রাচীন আর্য্য-কীর্ত্তির নিদর্শন দেখা যাইত; আজও ঐ অপূর্ব্ব দানশীলতার অপার মহিমায় ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম, এক হইয়া একই আহ্লাদ ও আমোদের তরঙ্গে দুলিতে থাকিত। ভারতের দুরদৃষ্ট-বশতঃ ঐ অপূর্ব্ব দৃশ্য চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়াছে।

ফ্লাসিংহ।

১৮০৯ খ্রীঃ অব্দে যখন ইংরেজদূত স্যার চার্লস মেট্‌কাফ (ইনি অতঃপর লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হয়েন) অমৃতসরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, ইংরেজসেনানী অক্টরলোনীর সহিত একত্র হইয়া যখন তিনি গবর্ণর-জেনেরল লর্ড মিণ্টোর আদেশে মহারাজ রণজিৎসিংহের সহিত সন্ধিস্থাপনে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন একজন সাহসী যুবক নির্ভয়ে নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে করিয়া, আপনার কয়েকজন অনুচরের সহিত পঞ্জাবকেশরীর নিকটে উপস্থিত হইল এবং হস্তস্থিত তরবারির আস্ফালন করিতে করিতে মহারাজকে গম্ভীরস্বরে কহিল,—"মহারাজ! বিদেশী ইংরেজেরা আমাদের রাজ্যে আসিয়াছে, আমরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা আমাদের অনুচরদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছে। যদি আপনি ইহার প্রতিবিধান না করেন, যদি এই মুহূর্ত্তে বিধর্ম্মীদিগকে সমুচিত শাস্তি না দেন, তাহা হইলে এই তরবারির আঘাতে আপনার সহিত আপনার বংশের সমুদয় লোকের প্রাণসংহার করিব।" রণজিৎ সিংহ অকস্মাৎ যুবকের মুখে এই কঠোর কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, সবিস্ময়ে যুবকের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, যুবক নির্ভয়ে তরবারির আস্ফালন করিতেছে, নির্ভয়ে বিস্ফারিতদৃষ্টিতে আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য যেন প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। অসময়ে এই অপূর্ব্ব দৃশ্যের আবির্ভাবে পঞ্চনদের অধীশ্বর বিচলিত হইলেন না, ধীরতার সীমা অতিক্রম করিয়া চপলতার পরিচয় দিলেন না। তিনি স্নেহের সহিত ধীরগম্ভীরস্বরে কহিলেন,—"যুবক তোমার সাহসের প্রশংসা করি; কিন্তু ইংরেজদূতের সহিত আমি বন্ধুত্বপাশে আবদ্ধ; বন্ধুর কোন অনিষ্ট করিতে পারিব না। আমি মাথা বাড়াইয়া দিতেছি, তোমার অসি আমার স্কন্ধেই পতিত হউক!"

মহারাজ রণজিৎ সিংহের এই স্নেহমাখা মধুর কথায় যুবকের উত্তেজিত হৃদয় কিছু শান্ত হইল। যুবক আর কোনরূপ উদ্ধতভাব না দেখাইয়া, উন্নত মস্তক অবনত করিল। রণজিৎ সিংহ সন্তোষের সহিত তাহাকে এক যোড়া স্বর্ণাভরণ ও তদীয় অনুচরদিগকে যথাযোগ্য দ্রব্য দিলেন। যুবক ধীরভাবে মহারাজপ্রদত্ত পারিতোষিক লইয়া চলিয়া গেল।

এই তেজস্বী যুবকের নাম ফুলাসিংহ। ফুলাসিংহ জাতিতে জাঠ। শিখগুরু গোবিন্দসিংহ অকালীনামে যে সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন. ফুলাসিংহ সেই সম্প্রদায়ের নেতা। অকালীদিগের পরিচ্ছদ নীলবর্ণ। ইহারা সাহসে অটল, বিক্রমে অজেয় ও কর্ত্তব্যপালনে অনলস। শত্রুর ব্যূহভেদে, শত্রুর দুর্গাধিকারে ইহাদের কিরূপ পরাক্রম প্রকাশ হয়, ইহাদের কিরূপ ক্ষমতায় বিপক্ষের বিজয়িনীশক্তি বিলুপ্ত হয়, ঐতিহাসিকগণ আহ্লাদ ও প্রীতির সহিত তাহার বর্ণনা করিয়া থাকেন। ইহারা দুর্ব্বল গরীব দুঃখীর পরম বন্ধু এবং অত্যাচারী ধনশালীর পরম শত্রু। কর্ত্তব্যপালনে ইহারা আপনাদের প্রাণকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকে। গুরু গোবিন্দসিংহ আপনার প্রতিষ্ঠিত এই সম্প্রদায়ের পরাক্রমের উপর নির্ভর করিয়া, সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের ক্ষমতারোধে উদ্যত হইয়াছিলেন। খ্রীঃ ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফুলাসিংহ এই দলের অধিনেতা হইয়া ইহাদের সাহস, ইহাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি, ইহাদের বীরত্ব, ইতিহাসের বরণীয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। যে দিন ফুলাসিংহ মহারাজ রণজিৎ সিংহের সমক্ষে অসাধারণ সাহস ও তেজস্বিতার পরিচয় দেন, সেই দিন হইতে অকালীদিগের মধ্যে তাঁহার প্রতিপত্তির সঞ্চার হয়। সেই দিন অকালীরা সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে আপনাদের অধিনেতার পদে বরণ করে। ক্রমে তাঁহার দলবৃদ্ধি হয়, ক্রমে প্রায় চারিশত অকালী সর্ব্বদা তাঁহার আদেশপালনে তৎপর হইয়া উঠে। ফুলাসিংহ ঐ অনুচরগণে পরিবৃত হইয়া নানা স্থানে

হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। নিরাশ্রয় দুঃখীদিগকে রক্ষা করা তাঁহার একটি প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। তিনি সকল সময়ে সর্ব্বান্তঃকরণে ঐ কর্ত্তব্যপালনে যত্নশীল হইলেন। যেখানে নির্ধন, নিরাশ্রয় ও নিপীড়িত ব্যক্তি দুঃসহ যাতনানলে নিরন্তর দগ্ধ হইত, সেইখানেই রক্ষাকর্ত্তা ফুলাসিংহের আবির্ভাব হইতে লাগিল; যেখানে ক্ষমতাশালী ধনী বিলাস-তরঙ্গে দুলিতে দুলিতে আপনার ধনবৃদ্ধির সুখময় স্বপ্ন দেখিতেন, সেই স্থানেই ফুলাসিংহ তাঁহার ধনগ্রহণে ও ক্ষমতানাশে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; যেখানে নিঃস্ব, নিঃসম্বল, নিঃসহায়, অনাথা শোকের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ নির্জ্জন পর্ণকুটীরে নীরবে বসিয়া থাকিত এবং আপনার হৃদয়ের প্রচণ্ড হুতাশন নিবাইবার জন্যই যেন, নিরন্তর নয়নসলিলে সমুদয় দেহ প্লাবিত করিত, সেইস্থানেই ফুলাসিংহ তাহার হৃদয়ে শান্তিবিধান জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ফুলাসিংহের এই সমস্ত কার্য্যের বিবরণ ক্রমে পঞ্জাবকেশরীর কর্ণগোচর হইল। রণজিৎ সিংহ তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহের সহিত তাঁহাকে অপরের সম্পত্তিগ্রহণে বিরত থাকিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ফুলাসিংহ এই অনুরোধরক্ষায় সম্মত হইলেন না। রণজিৎ সিংহ তাঁহাকে অনেক অর্থ দিতে চাহিলেন, বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া, শান্তিময় জীবনের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তাঁহার পরামর্ষ, তাঁহার অঙ্গীকৃত পুরস্কার, তাঁহার বাক্‌চাতুরীর মোহিনী শক্তি, সমস্তই ফুলাসিংহের নিকটে পরাভবস্বীকার করিল। ফুলাসিংহ বশীভূত হইলেন না। তিনি অটল পর্ব্বতের ন্যায় আপনার সাধনায় অটল থাকিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় বিপন্নের বিপদুদ্ধারে, দরিদ্রের দুঃখমোচনে এবং উদ্ধত ও গর্ব্বিত ধনীর গর্ব্ব হরণে ব্যাপৃত হইলেন। এই সময়ে ফুলাসিংহের দলে চারি পাঁচ

হাজার লোক ছিল। ইহারা আপনাদের দলপতির যে কোন আদেশ-পালনে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। মহারাজ রণজিৎ সিংহ বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ফুলাসিংহকে ভয় দেখাইলে কোন ফল হইবে না। ধীরভাবে স্নেহের সহিত নানারূপ প্রলোভন দেখাইলে, তাঁহাকে বশে রাখা যাইতে পারে; রণজিৎ সিংহ ফুলাসিংহের বিরুদ্ধে প্রথমে এক দল সৈন্য পাঠাইলেও অবশেষে এই উপায় অবলম্বন করিলেন। এই উপায়ে তাঁহার বাসনা ফলবতী হইল। ফুল্যাসিংহ পঞ্জাবকেশরীর অনুগত ও ক্রমে তাঁহার পরম প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।

এই সময় হইতে মহারাজ রণজিৎসিংহের ক্ষমতা পরিবর্দ্ধিত হয়; এই সময় হইতে ফুলাসিংহ এবং তাঁহার দলের লোকের অসাধারণ সাহস ও পরাক্রমের উপর নির্ভর করিয়া রণজিৎসিংহ অনেক স্থলে আধিপত্যস্থাপন করেন। ফুলাসিংহের দলের একটি বীরপুরুষের লোকাতীত সাহসে মূলতান অধিকৃত হয়। ফুলাসিংহ স্বয়ং অসাধারণ পরাক্রম দেখাইয়া ভারতের নন্দনকানন কাশ্মীর হস্তগত করেন। মহারাজ রণজিৎসিংহ যখন পেশাবর অধিকারে উদ্যত হয়েন, বহুযুগের পর পঞ্চনদের হিন্দু ভূপতির সৈন্য যখন নওশেরার যুদ্ধক্ষেত্রে আফগান-দিগের সম্মুখীন হয়, তখন ফুলাসিংহ বীরত্ব ও সাহসের যথোচিত পরিচয় দিয়াছিলেন।

পেশাবর আফগানদিগের অধিকৃত ছিল। কাবুলের প্রধান অমাত্য মহম্মদ আজিম খাঁ পরাক্রান্ত ইউসফ্‌জীদিগকে লইয়া পঞ্জাবকেশরীর ক্ষমতারোধে অগ্রসর হইলেন। আটক এবং পেশাবরের মধ্যবর্ত্তী নওশেরার নিকটস্থিত থেরাই-নামক স্থানে পরাক্রমশালী আফগান ও যুদ্ধকুশল শিখসৈন্য আত্মপ্রাধান্য-স্থাপনার্থ পরস্পরের সম্মুখীন হইল। এই মহাযুদ্ধে সর্ব্বপ্রথম শিখদিগের পরাক্রম বিচলিত হইয়াছিল,

সর্ব্বপ্রথম আফগানেরা জয়ী হইবে বলিয়া আশা করিয়াছিল। রণজিৎ-সিংহের ইউরোপীয় সেনাপতিদ্বয়ও প্রথমে আফগানদিগের আক্রমণ নিরস্ত করিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন। এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে রণজিৎসিংহ বিপক্ষের গতিরোধ জন্য আপনার সৈনিকদিগকে একত্র করিতে বৃথা চেষ্টা পাইয়াছিলেন, বৃথা ঈশ্বরের ও আপনাদের গুরুর পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া, সৈনিকদিগকে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, বৃথা অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে করিয়া, ভৈরব-রবে সৈনিকদিগকে তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে আদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার সেই অপূর্ব্ববিক্রমে, অপূর্ব্বস্থিরতায় ও অপূর্ব্বসাহসে কোনও ফল হয় নাই। রণজিৎসিংহ অবশেষে হতাশ হইয়া পড়িলেন; সৈনিকদিগকে যুদ্ধে প্রায় বিমুখ দেখিয়া, ক্ষোভে ও রোষে একাকীই তরবারির আস্ফালন করিতে করিতে বিপক্ষের ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে "ওয়া গুরুজী কি ফতে" (জয়শ্রী গুরুকে শোভিত করুক) এই আশ্বাসবাক্য তাঁহার কর্ণগোচর হইল; এ বাক্য দূরাগত বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় গম্ভীররবে তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ-পূর্ব্বক আশা ও আনন্দের সঞ্চার করিল। রণজিৎসিংহ সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন, ফুলাসিংহ নীলবর্ণের পতাকা উড়াইয়া, পাঁচ শত মাত্র অকালী সৈন্যের সহিত "ওয়া গুরুজী কি ফতে," শব্দ করিতে করিতে সেই গণনাতীত আফগান সৈন্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি ফুলাসিংহকে বিপক্ষের গুলির আঘাতে অশ্ব হইতে ভূপতিত হইতে দেখিয়াছিলেন। ঐ আঘাতে ফুলাসিংহের হাঁটু ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। লোকে তাঁহাকে ধরিয়া যে স্থানান্তরিত করিয়াছিল, রণজিৎসিংহ তাহাও দেখিতে পাইয়াছিলেন। এবারে তিনি দেখিলেন, ফুলাসিংহ হস্তীতে আরোহণ করিয়া, বিপুল উৎসাহের সহিত আপনার সেনাচালনা করিতেছেন। গুলির আঘাতে তাঁহার দেহ ক্ষতবিক্ষত

হইয়াছে, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই; প্রশস্ত ললাটে ভীতিব্যঞ্জক রেখার আবির্ভাব নাই; বিস্তৃত লোচনদ্বয়ে দুশ্চিন্তা বা নৈরাশ্যসূচক কালিমার আবেশ নাই। ফুলাসিংহ হস্তীর উপর হইতে নির্ভয়ে জলদগম্ভীরস্বরে কহিতেছেন,—"ওয়া গুরুজী কি ফতে"। তাঁহার সৈন্য গুরুগোবিন্দসিংহের মন্ত্রপূত, ঐ বাক্যে উৎসাহিত হইয়া, আফগানদিগের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। ফুলাসিংহের এই তেজস্বিতা দেখিয়া পঞ্চনদের অধীশ্বর প্রীত, চমৎকৃত ও আশ্বাসযুক্ত হইলেন। কে বলে গুরুগোবিন্দের মৃত্যু হইয়াছে? কে বলে গুরুগোবিন্দসিংহের মহাপ্রাণতা তাঁহার দেহের সহিত চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে? খ্রীঃ ঊনবিংশ শতাব্দীতে, নওশেরার নিকটবর্ত্তী যুদ্ধক্ষেত্রেও গোবিন্দসিংহ বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তদীয় উৎসাহপূর্ণ বাক্য এই সমরভূমিতেও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়কে প্রমত্ত করিয়া তুলিয়াছে। ফুলাসিংহ গুরুগোবিন্দের মহাপ্রাণতায় মহিমান্বিত হইয়া, তাঁহার মন্ত্রপূত শোণিত অকলঙ্কিত রাখিতে উদ্যত হইয়াছেন। এ বিনশ্বর জগতে শিখগুরুর এ মহিমার বিলয় হইবে না। মহারাজ রণজিৎসিংহ ফুলাসিংহকে আফগানের ব্যূহভেদে অগ্রসর দেখিয়া, অসামান্যবিক্রমে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। এবার ফুলাসিংহের পরাক্রান্ত আফগানেরা সহিতে পারিল না। অকালীরা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিপক্ষদিগের ব্যূহভেদ করিতে লাগিল। ক্রমে রণজিৎসিংহের অপরাপর সৈন্য আসিয়া, অকালীদিগের সহিত সম্মিলিত হইল। ফুলাসিংহ যে হস্তীতে ছিলেন, তাহার মাহুতের শরীরে একে একে তিনটি গুলি প্রবেশ করিয়াছিল। ফুলাসিংহ নিজেও একটি গুলিতে আহত হইয়াছিলেন। তথাপি তিনি দৃঢ়তার সহিত বিপক্ষের মধ্যে হাতী চালাইতে মাহুতকে আদেশ দিলেন। আহত মাহুত এবার আদেশপালনে অসম্মত হইল। ফুলাসিংহের পুনঃপুনঃ আদেশেও মাহুত যখন হস্তীকে পরিচালিত করিল না, তখন ফুলাসিংহ

সক্রোধে মাহুতের মস্তক লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুড়িলেন। মাহুত পড়িয়া গেল। ফুলাসিংহ হস্তস্থিত তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা হস্তী চালন করিয়া, বিপক্ষের মধ্যে উপস্থিত হইয়া, সৈনিকদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে শত্রুপক্ষের একটি গুলি আসিয়া, তাঁহার ললাটে প্রবিষ্ট হইল। বীরকেশরী এ আঘাত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না। তাঁহার প্রাণশূন্য দেহ হাওদার মধ্যে পড়িয়া গেল। অধিনায়কের মৃত্যুতে অকালীগণ বিশৃঙ্খল হইল না। তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সাহসসহকারে বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিল। আফগান সৈন্য এ আক্রমণে স্থির থাকিতে না পারিয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। নওশেরার নিকটবর্ত্তী সমরক্ষেত্রে ফুলাসিংহের অসামান্যপরাক্রমে পঞ্জাবকেশরীর জয়লাভ হইল।

পাঠানেরা যার পর নাই বিস্ময়ে ফুলাসিংহের লোকাতীত বীরত্বের প্রশংসা করিয়াছিল। যে স্থলে ফুলাসিংহের মৃত্যু হয়, সে স্থলে একটি স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ স্থান হিন্দু ও মুসলমান, উভয়েরই একটি পবিত্র তীর্থের মধ্যে পরিগণিত হয়। হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ই ঐ পবিত্র তীর্থে সমাগত হইতেন এবং উভয় সম্প্রদায়ই ভক্তিরসার্দ্র হৃদয়ে ফুলাসিংহের উদ্দেশে স্তুতিবাদ করিতেন। যত দিন একচক্ষু বৃদ্ধ শিখভূপতি জীবিত ছিলেন, তত দিন যখন নওশেরার যুদ্ধের প্রসঙ্গে ফুলাসিংহের কথা উঠিত, তখন তাঁহার উজ্জ্বল চক্ষুটি উজ্জ্বলতর হইত, এবং উহা হইতে অবিরলধারায় মুক্তাফলসদৃশ অশ্রু নির্গত হইয়া গণ্ড-দেশে পড়িত। বীরভক্ত বীরকেশরী এইরূপ শোকাশ্রুতে বীরেন্দ্রসমাজের বরণীয় ফুলাসিংহের প্রতি অপরিসীম অনুরাগের পরিচয় দিতেন।

অসাধারণ পরোপকার।

(বুঁদীর রাণী)

খ্রীঃ ১৮৫৭ সাল। সিপাহীরা উন্মত্ত হইয়া ইংরেজদিগকে সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছে ; চারিদিকে ভয়ঙ্করী শোণিত-তরঙ্গিণী বহিয়া যাইতেছে ; ইংরেজ ও সিপাহী উভয়েই অসীম উত্তেজনায় হিংসা ও ক্রোধের আবেগে, উভয়ের প্রতি নির্দ্দয়তার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে। সমগ্র ভারতবর্ষ বায়ুসন্তাড়িত সাগরের ন্যায় চঞ্চল ; ভারতের সমগ্র অধিবাসী সর্ব্বদা বিপদের আশঙ্কায় অস্থির। এই বিপত্তিপূর্ণ সময়ে ভারতের এক দয়াবতী রমণী অপূর্ব্ব দয়ার পরিচয় দেন। আপনার জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও, বিদেশী, বিধর্ম্মী, নিরাশ্রয় ইংরেজকুলকামিনী ও শিশুদিগকে আশ্রয় দিয়া, জগতের সমক্ষে অসাধারণ পরোপকার এবং মানবী প্রকৃতিতে পবিত্র দেবভাবের মহিমা বিকাশ করেন।

বুঁদীর রাজার ধর্ম্মপরায়ণা বনিতার কোমল হৃদয়ে এইরূপ দেবভাব প্রতিফলিত হইয়াছিল। বুঁদীরাজ সিপাহীদিগের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ; এদিকে তাঁহার দয়াশীলা পত্নী শুনিতে পাইলেন, ইউরোপীয়গণ দলে দলে নিহত হইতেছে ; যে সকল কুলকন্যা ও শিশুসন্তান এক সময়ে সুখসৌভাগ্যে লালিত হইত, তাহারা এখন খাদ্যবিহীন ও বস্ত্রবিহীন হইয়া, আশ্রয়স্থানের অভাবে দিবসের প্রচণ্ড রৌদ্র ও রাত্রির দুরন্ত হিমের মধ্যে নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে পড়িয়া রহিয়াছে। এই শোচনীয় দুর্গতির সংবাদে কামিনীর কোমল হৃদয় দয়ার্দ্র হইল। বুঁদীর অধীশ্বরী স্বামীর অজ্ঞাতসারে বিশ্বস্ত লোক দ্বারা নিজ ব্যয়ে অরণ্যস্থিত নিরাশ্রয় ইউরোপীয়দিগের নিকটে আহার্য্য ও পরিচ্ছদ

পাঠাইতে লাগিলেন। ঐ সঙ্গে পাদুকা প্রভৃতি অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যও প্রেরিত হইতে লাগিল। বুঁদীর অধিপতি যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন; সুতরাং শত্রুপক্ষের প্রতি পত্নীর এই সদ্ব্যবহারের বিষয় তাঁহার গোচর হইল না; রাজমহিষীর সাহায্যে নিরাশ্রয় ইউরোপীয়গণ সুস্থশরীরে দিল্লীস্থিত ইংরেজ-সেনানিবাসে উপস্থিত হইল। রাণী যথাসময়ে সাহায্য না করিলে, ইহাদের অনেকের প্রাণ নষ্ট হইত। এইরূপ সহায়াদানে যে আপনার প্রণহানির সম্ভাবনা আছে, তাহাও রাণী জানিতেন; কিন্তু তাহা জানিয়াও তিনি হৃদয়ের ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইলেন না। হিতৈষিণী নারী বিপন্নের সাহায্য করিয়া, হিতৈষিতার গৌরব রক্ষা করিলেন। কিন্তু হায়! এই হিতৈষিতা, সদাশয়তা ও উদারতাই রাণীর জীবন নাশের কারণ হইল। বুঁদীরাজের প্রত্যাগমনের কিছুকাল পরে রাণীর পরলোক-প্রাপ্তি হয়। এই ঘটনার অব্যবহিত পরে রাজাও ইংরেজ সেনাপতি স্যার হিউ রোজের সহিত যুদ্ধে নিহত হয়েন। কি কারণে রাণীর হঠাৎ মৃত্যু হইল, তাহা ভালরূপ জানা যায় নাই। অনেকে সন্দেহ করেন, বুঁদীর অরণ্যস্থিত অসহায় ইউরোপীয়দিগের সাহায্য করাতে, রাজার আদেশক্রমে রাণীকে বধ করা হয়। দয়াবতী অবলা ভূমণ্ডলে অপরিসীম দয়া দেখাইয়া, ঘাতকের হস্তে আত্মজীবন বিসর্জ্জন করেন।

উল্লিখিত বিলুণ্ঠন, বিপ্লব ও নরহত্যার মধ্যে ভারতবাসীদের এইরূপ দয়া অনেক স্থলে পরিস্ফুট হইয়াছে। অনেক স্থলে নিরাশ্রয় ও নিঃসহায় ইউরোপীয়গণ এইরূপ দয়ায় ঘোরতর অশান্তির সময়ে শান্তি লাভ করিয়াছেন।

ফয়জাবাদের ডেপুটী কমিশনর কাছারীতে গিয়া শুনিলেন, নিকটবর্ত্তী সেনানিবাসের সিপাহীগণ [illegible]

শুনিবামাত্র একজন বিশ্বস্ত চাপরাসী দ্বারা আপনার স্ত্রীকে অবিলম্বে সমুদয় সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া নদীর তটে যাইতে বলিয়া পাঠাইলেন। এই চাপরাশী তাঁহার স্ত্রীর সহিত যাইতে আদিষ্ট হইল। সহধর্ম্মিণীর নিকটে সংবাদ পাঠাইয়া, ডেপুটী কমিশনর কার্য্যানুরোধে সেনানিবাসে গমন করিলেন। এদিকে কমিশনরের পত্নী শিবিকারোহণে বিশ্বস্ত ভৃত্যের সঙ্গে নদীকূলে যাইতে লাগিলেন। সিপাহীগণ এই সময়ে সম্পত্তিলুণ্ঠন ও ইংরেজবিনাশের নিমিত্ত চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ভীতা ও অসহায়া ইংরেজমহিলা সন্ধ্যাসমাগমে একটি পল্লীতে প্রবেশ করিলেন। একটি দয়াশীলা পল্লীবাসিনী আপনার জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও তাঁহাকে স্বীয় গৃহে আশ্রয় দিয়া, একটি অব্যবহার্য্য তুন্দুরের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। এদিকে বাহকগণ শিবিকা নদীর তটে রাখিয়া প্রস্থান করিল। কমিশনরের পত্নী ভয়বিহ্বলচিত্তে সমস্ত রাত্রি সেই তুন্দুরের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত রহিলেন। রাত্রিকালে সিপাহীরা উক্ত গ্রামে প্রবেশ করিয়া, চারিদিকে পলাতক ইংরেজ পুরুষ ও স্ত্রীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। এবং পলায়িত ও আশ্রিত-দিগকে বাহির করিয়া না দিলে, প্রাণসংহার করা হইবে বলিয়া সকলকে ভয় দেখাইতে লাগিল। আপনার জীবনহানির সম্ভাবনা জানিয়াও কোমলহৃদয়া আশ্রয়দাত্রী নিরাশ্রয়া ইংরেজমহিলাকে উত্তে-জিত সিপাহীদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিল না। যখন ঐ ইংরেজরমণী গ্রামমধ্যে প্রবেশ করেন, তখন গ্রামের পুরুষেরা কৃষিক্ষেত্রের কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল; সুতরাং তাহাদের অনেকে ঐ বিষয় অবগত ছিল না। কিন্তু গ্রামবাসিনী অধিকাংশ মহিলাই উহা জানিত; তথাপি তাহা-দের কেহই উহা প্রকাশ করিল না। ভয়ব্যাকুলা বিদেশিনী দরিদ্রা আশ্রয়দাত্রীর অনুগ্রহে তুন্দুরের অভ্যন্তরে নীরবে সমস্ত রাত্রি যাপন করিলেন। ক্রমে ভয়াবহ কোলাহলের নিবৃত্তি হইল, সিপাহীগণ

স্থানান্তরে চলিয়া গেল। রাত্রি প্রভাত হইলে, ডেপুটি কমিশনরের পূর্ব্বোক্ত বিশ্বস্ত ভৃত্য সেই স্থানের অতি সমৃদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী মহারাজ মানসিংহের নিকটে যাইয়া, একখানি নৌকা প্রার্থনা করিল। দয়ার্দ্র মানসিংহ বিপন্নের উদ্ধারার্থ ভৃত্যের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। ডেপুটী কমিশনরের পত্নী ও কয়েকটি ইউরোপীয় মহিলা আপনাদের সন্তানবর্গের সহিত নৌকার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। বাহিরে কতিপয় বিশ্বস্ত ভৃত্য ও সিপাহী বসিয়া রহিল এবং একখানি তীর্থযাত্রীর নৌকা বলিয়া সাধারণের নিকট ভাণ করিতে লাগিল। দুই এক স্থানে উহাদের সহিত উত্তেজিত সিপাহীদিগের সাক্ষাৎ হইয়াছিল; কিন্তু নৌকার অভ্যন্তরে পলাতক ইউরোপীয় আছে, ইহা ঐ সিপাহীগণ বুঝিতে পারে নাই। সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে, নৌকা কোন নিরাপদ স্থানে লাগাইয়া, কয়েকজন ভৃত্য দুগ্ধ ও রুটীর জন্য নিকটবর্ত্তী পল্লীতে গমন করিল। এ স্থানেও পল্লীবাসিগণ বিপন্ন পলাতকদিগকে সাহায্য দানে কাতর হইল না। একটি দয়াবতী রমণী, শিশুগুলিকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া দ্রুতগতি গ্রামে প্রবেশ করিল, এবং কয়েকটি দুগ্ধবতী ধাত্রী সঙ্গে করিয়া নৌকার নিকটে উপস্থিত হইল। ইউরোপীয় মহিলাগণ আহ্লাদসহকারে ইহাদের হস্তে শিশুদিগকে সমর্পণ করিলেন; ইহারা আপনাদের স্তন্যদানে উহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিল। সিপাহীগণ জানিতে পারিলে, এই আশ্রয়দাত্রী ও সাহায্যকারিণী মহিলাদিগের প্রাণ সংহার করিত। আপনাদের জীবন এইরূপ সংশয়াপন্ন করিয়াও উক্ত দয়াবতী রমণীগণ বিপন্নদিগের যথাশক্তি সাহায্য করে। এইরূপ সাহায্য পাইয়া ইউরোপীয় কুলকামিনীগণ নিরাপদে এলাহাবাদে উপনীত হন।

যাঁহারা পরোপকারের জন্য আত্মপ্রাণ তুচ্ছ জ্ঞান করেন, তাঁহাদের সহিত কোনরূপ পার্থিব পদার্থের তুলনা হয় না। তাঁহারা সর্ব্বদা দেব-

ভাবে পূর্ণ হইয়া জগতের সমক্ষে আপনাদের অসাধারণ মহত্ত্বের পরিচয় দেন। তাঁহাদের আবির্ভাবে, তাঁহাদের গৌরবে, তাঁহাদের অপার্থিব কার্য্যের অনন্ত মহিমায় এই রোগশোকময় ও দুঃখদারিদ্র্যপূর্ণ সংসার সুখের, শান্তির, প্রীতির অদ্বিতীয় প্রস্রবণস্বরূপ হইয়া উঠে। ভারতের অবলাগণ এক সময়ে পৃথিবীতে এইরূপ স্বর্গীয় ভাবের বিকাশ করিয়াছিলেন, জীবনের মমতা পরিহার করিয়া, অটল সাহস, অবিচলিত ধীরতা ও অপরিমেয় দয়ার সহিত নিরাশ্রয় বিপদ্‌গ্রস্তদিগকে এইরূপ সুখ ও শান্তির পথে লইয়া গিয়াছিলেন। সহৃদয়সমাজে চিরকাল ইঁহাদের নিঃস্বার্থ হিতৈষিতার সম্মান থাকিবে।

অবলার আত্মত্যাগ।

(কৃষ্ণকুমারী)

অনন্ত কালস্রোত অবিরাম গতিতে খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দী অতিক্রম করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করিয়াছে। মোগল-সাম্রাজ্যের সে প্রবল প্রতাপ সে দিগন্তবিশ্রুত গৌরব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অকবর, শাহজহাঁ প্রভৃতি সম্রাট্‌গণের বংশধর শীতসঙ্কুচিত বৃদ্ধের ন্যায় আপনাতে আপনি লুক্কায়িত হইয়া মহাশ্মশান দিল্লীর এক প্রান্তে পড়িয়া রহিয়াছেন। ব্রিটিশ সিংহ ভারতের স্থানে স্থানে আধিপত্য স্থাপন করিতেছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় ভূপতি—সিন্ধিয়া ও হোলকর দক্ষিণাপথ হইতে আর্য্যাবর্ত্তে যাইয়া আপনাদের অধিকারবিস্তারে উন্মুখ হইয়াছেন। এই পরিবর্ত্তনের সময়ে ভীমসিংহ মিবারে আধিপত্য করিতেছিলেন। ভীমসিংহের পূর্ব্বপুরুষোচিত সে ভীম পরাক্রম ছিল না। বীরশ্রেষ্ঠ বাপ্পারাওর বংশের

সন্তান আপনাদের চিরন্তন তেজস্বিতা হইতে বিচ্যুত হইয়া মিবারের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় ভূপতিগণ সৈনিকদল লইয়া রাজস্থানে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের আক্রমণে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ, পবিত্র জনপদ শোকের, দুঃখের ও দারিদ্র্যের আশ্রয়ভূমি হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতাপসিংহ বা পুত্ত, জয়মল্ল বা বাদল, এখন কেবল রাজপুতের স্মৃতিতে বিরাজ করিতেছিলেন। সে তেজস্বিতা, সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, এখন রাজস্থান হইতে অন্তর্দ্ধান করিতেছিল। কিন্তু এই শোচনীয় সময়েও একটি স্বর্গীয় কুসুম রাজস্থানে বিকশিত হইয়া, আপনার পবিত্রতার মহিমায় সকলকে পবিত্র করিয়াছিল; ষোড়শী রাজপুতবালা কৃষ্ণকুমারী পিতার রাজ্যরক্ষার জন্য আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, পূর্ব্বগৌরবভ্রষ্ট, পরপীড়িত রাজস্থান অনন্ত সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণকুমারী রাণা ভীমসিংহের কন্যা। সৌন্দর্য্যগৌরবে তিনি অতুলনীয় ছিলেন। লোকে তাঁহাকে 'রাজস্থানের কুসুম' বলিয়া গৌরবান্বিত ও সম্মানিত করিত। তাঁহার যেমন অসামান্য রূপলাবণ্য, সেইরূপ অনুপম দেশভক্তি ছিল। কৃষ্ণকুমারী ষোড়শবর্ষে পদার্পণ করিলে, রাজা ভীমসিংহ মাড়বারের অধিপতির সহিত কন্যার পরিণয়সম্বন্ধ স্থির করেন; কিন্তু ইহার মধ্যে মাড়বাররাজের পরলোকপ্রাপ্তি হয়। সুতরাং ভীমসিংহ জয়পুরের অধিপতি জগৎসিংহের হস্তে কন্যারত্ন সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করেন; মাড়বারের পরবর্ত্তী ভূপতি মানসিংহ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সসৈন্যে মিবারে আসিয়া রাজস্থানকুসুম কৃষ্ণার পাণিগ্রহণার্থী হয়েন। এদিকে মহারাজ সিন্ধিয়া জয়পুররাজের পরিবর্ত্তে মাড়বাররাজের সহিত কৃষ্ণকুমারীর বিবাহ দিতে মহারাজ ভীমসিংহকে অনুরোধ করেন। জগৎসিংহের সহিত সিন্ধিয়ার শত্রুতা ছিল। ঐ শত্রুতার বশবর্ত্তী হইয়া সিন্ধিয়া জয়পুরের অধিপতিকে বঞ্চিত করিয়া, মাড়বারের প্রার্থনা পূরণ করিবার জন্য মহারাজ ভীমসিংহকে আগ্রহ-

সহকারে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ভীমসিংহ সম্মত হইলেন না। সিন্ধিয়া সৈনিকদলসহ উদয়পুরে উপনীত হইয়া, একটি গিরিসঙ্কটে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। উদয়পুর ও জয়পুরের সৈন্য তাঁহার পরাক্রম খর্ব্ব করিতে পারিল না। ভীমসিংহ পরিশেষে একলিঙ্গের পবিত্রমন্দিরে সিন্ধিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহাকে বাধ্য হইয়া প্রবলের অনুরোধ রক্ষা করিতে হইল। রাণা জয়পুররাজের দূতকে বিদায় দিলেন। জগৎসিংহ এ অপমান সহিতে পারিলেন না। অবিলম্বে তাঁহার বহুসংখ্যক সৈন্য মিবারে উপস্থিত হইল। এ দিকে মাড়বাররাজ মানসিংহও যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। বীরভূমি অপূর্ণবিকসিত পবিত্র রাজস্থানকুসুমের জন্য নরশোণিতে রঞ্জিত হইতে লাগিল।

এই যুদ্ধে মানসিংহ প্রথমে জয়ী হইতে পারিলেন না। একদল লোক প্রবল হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিল। ইহারা আর একজনকে অধিপতি করিয়া, মানসিংহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। মানসিংহ ১,২০,০০০ সৈন্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখে আসিলেন। যুদ্ধের আরম্ভ হইলে, মাড়বারের অধিকাংশ লোক বিপক্ষের দলে গিয়া মিশিল। এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতায় মানসিংহ ক্ষোভে, রোষে ও বিরাগে হস্তস্থিত অসি দ্বারা স্বীয় বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু তাঁহার কয়েকজন বিশ্বস্ত সর্দ্দার অসি কাড়িয়া লইয়া, তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে রাজধানীতে স্থানান্তরিত করিলেন। শত্রুগণ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তদীয় রাজধানী আক্রমণ করিল। পরাক্রান্ত রাঠোরগণ অসাধারণ সাহস ও বীরত্বের সহিত গরীয়সী জন্মভূমি রক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু শেষে তাহাদের রাজধানী শত্রুর হস্তগত ও বিলুণ্ঠিত হইল। মানসিংহ যোধগড়ে আশ্রয় লইলেন। এই দুর্গ অভেদ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। উপস্থিত সঙ্কটাপন্ন সময়ে দুর্গের ঐ গৌরব সর্ব্বাংশে রক্ষিত হইল। মাড়-

বারের রাজধানী আক্রমণকারী সৈনিকগণের পদানত হইল বটে, কিন্তু যোধগড় অটল ও অজেয় রহিল।

এই বিপ্লবের সময়ে মানবসংজ্ঞাধারী একটি পশুপ্রকৃতি নিকৃষ্ট জীব ঘটনাস্থলে আবির্ভূত হইল। ইহার নাম আমির খাঁ। আমির খাঁ জাতিতে পাঠান। পাপের ভয়াবহ রাজ্যে যত প্রকার দুষ্প্রবৃত্তি আছে, তৎসমুদয়েই আমির খাঁর প্রকৃতি সংগঠিত হইয়াছিল। আমির খাঁ প্রথমে মানসিংহের বিপক্ষের পক্ষে ছিল। মানসিংহের প্রতিদ্বন্দ্বী ঐ দুরাচার নরাধমকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে ঐ পাষণ্ড বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁহার প্রাণবায়ুর অবসান হইল। তদীয় সৈন্য নির্ম্মূল হইয়া গেল। আমির খাঁ অম্লানভাবে পাপের পরিতর্পণ করিয়া মানসিংহের দলে মিশিল।

এইরূপে ঘোরতর বিশ্বাসঘাতক পাপীর ঘোরতর বিশ্বাস-ঘাতকতাপূর্ণ কার্য্যের এক অংশ সম্পন্ন হইল। এখন দুর্ব্বৃত্ত উহা অপেক্ষাও আর এক ভয়ঙ্কর অংশের সম্পাদনে হস্ত প্রসারণ করিল। অনন্তসৌন্দর্য্যময় রাজস্থানকুসুমের জন্য এখনও জয়পুর ও মাড়বারের অধিপতি পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এখন উভয় সৈনিকদলের আক্রমণে মিবারের পবিত্র ভূমি অশান্তিপূর্ণ ও বিশৃঙ্খল হইতেছিল। দুরন্ত পাঠান এই সময়ে উদয়পুরের রাণার পরামর্শদাতা হইয়া উঠিল। তাঁহার কুপরামর্শে রাণা অপরিস্ফুট হৃদয়রঞ্জন কুসুমটিকে বৃন্তচ্যুত করিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিলেন। রাজ্যে শান্তিস্থাপন জন্য তিনি এই উপায়ই প্রশস্ত বোধ করিয়াছিলেন। কুমন্ত্রীর কুমন্ত্রে এই উপায়েই মিবারের গৌরবরক্ষায় কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। অবিলম্বে ঐ সঙ্কল্পসিদ্ধির আয়োজন হইল। মহারাজ দৌলৎসিংহ রাণার একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন। উদয়পুরের সম্মানরক্ষার জন্য ঐ ঘোরতর পাপকার্য্য সাধন করিতে প্রথমে তাঁহাকে অনুরোধ করা হইল। প্রস্তাব শুনিয়াই দৌলৎসিংহ অধীরহৃদয়ে তীব্র-

স্বরে কহিলেন,—“যে জিহ্বা দিয়া এমন কথা বাহির হয়, সে জিহ্বাকে ধিক্, আর যে রাজভক্তি এইরূপে রক্ষিত হয়, সে রাজভক্তিকেও ধিক্!” শেষে রাণার ভ্রাতা যৌবনদাস তরবারি হস্তে করিয়া লাবণ্যবতী ষোড়শী বালার শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিলেন। কৃষ্ণকুমারী নিদ্রিত ছিলেন; ঈষদুদ্ভিন্ন কমলদলের ন্যায় তাঁহার কোমল দেহের সৌন্দর্য্য শয্যার অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ করিতেছিল। এ শোভায় যৌবনদাস স্তম্ভিত হইলেন; ক্ষোভে, রোষে ও বিরাগে তাঁহার হৃদয় অধীর হইল, অবশ হস্ত হইতে অসি পড়িয়া গেল। ষড়্‌যন্ত্র ক্রমে প্রকাশ পাইল। ক্রমে উহা কৃষ্ণকুমারী ও তদীয় জননীর শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইল। মাতা বিষাদে অধীর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকুমারী কিছুমাত্র কাতর হইলেন না; এ ভয়ঙ্কর ষড়্‌যন্ত্রেও ধীরতার সীমা অতিক্রম করিলেন না। তিনি প্রসন্ন-মুখে মাতাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য কহিলেন,—“মা! ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য ক্ষণস্থায়ী দুঃখে কাতর হইতেছ কেন? আমি কি তোমার কন্যা নই? আমি কেন মৃত্যুকে ভয় করিব? এ অবস্থায় মৃত্যু আমার নিকটে পরম সুহৃৎ। ক্ষত্রিয়বালা আত্মসম্মানরক্ষার জন্য আত্মপ্রাণ পরিত্যাগ করিতেই এই পৃথিবীতে আসিয়া থাকে।” তেজস্বিনী রাজপুতবালা এইরূপ ধীরভাবে আত্মত্যাগ করিয়া, রাজ্যের অমঙ্গল দূর করিতে স্থির-প্রতিজ্ঞ হইলেন। রাণার আদেশে; অনুচর বিষপূর্ণ পাত্র লইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। কৃষ্ণা পিতার আজ্ঞায় অম্লানভাবে উহা পান করিলেন; আর এক পাত্র আসিল; কৃষ্ণা পূর্ব্বের ন্যায় অম্লানভাবে তাহাও নিঃশেষ করিয়া, পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। এইরূপে দুইবার বিষপানেও যখন কৃষ্ণার প্রাণবায়ুর অবসান হইল না, 'দেববাঞ্ছ-নীয় পবিত্র কুসুম বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়িল না, তখন “কুসুম্ভরস” নামে আর একপ্রকার তীব্র হলাহল প্রস্তুত হইল। কৃষ্ণকুমারী পূর্ব্বের ন্যায় প্রফুল্লমুখে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিতে করিতে উহা পান করিলেন।

এবার তাঁহার গাঢ় নিদ্রা আসিল ; গভীর নিদ্রা হইতে তিনি আর জাগরিত হইলেন না। পিতৃভক্তিপরায়ণা, স্বদেশহিতৈষিণী, ষোড়শবর্ষীয়া অবলা, অম্লানভাবে আত্মত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন। ভূলোকে তাঁহার অনন্তগৌরবময় কীর্ত্তিস্তম্ভ অক্ষয় হইয়া রহিল।

দুর্গাবতী।

ভারতবর্ষের মধ্যভাগে এলাহাবাদ হইতে প্রায় একশত ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে গড়মণ্ডল নামক একটি পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল। খ্রীঃ ৩৫৮ অব্দে যদুরায় নামক একজন রাজপুত এই রাজ্যে আধিপত্য স্থাপন করেন। মণ্ডল, সোহাগপুর, ছত্রিশগড়, সম্বলপুর প্রভৃতি জনপদ লইয়া গড়রাজ্য সংগঠিত হয়। সোহাগপুর বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত। ঐ স্থানের অধিকাংশ অরণ্যময়। প্রকৃতির অনুকূলতাবশতঃ উহা শস্যসম্পত্তিতে পূর্ণ ছিল। ছত্রিশগড় গোণ্ডবন প্রদেশের অন্তঃপাতী। পূর্ব্বে উহা রত্নপুর নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ঐ ভূভাগের কিয়দংশ অরণ্য ও পর্ব্বতমালায় সমাবৃত।

গড়মণ্ডলরাজ্য মনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিভূষিত। উহার কোথাও জনপূর্ণ পল্লী, সুন্দর জলাশয়, সুরম্য উপবন প্রভৃতি অপূর্ব্ব দৃশ্য বিকাশ করিয়া দিতেছে ; কোথাও স্বচ্ছসলিলা তরঙ্গিণী ধীরে ধীরে তরঙ্গরঙ্গ বিস্তার করিয়া বৃক্ষসমাকীর্ণ বনভূমির প্রান্তদেশে রজতমালার ন্যায় শোভা পাইতেছে ; কোথাও নবীন লতাসমূহ প্রফুল্ল কুসুমে সজ্জিত হইয়া, সৌন্দর্য্যগৌরবের পরিচয় দিতেছে ; কোথাও অটল পর্ব্বত আপনার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া বিরাট পুরুষের ন্যায় দণ্ডায়-

মান রহিয়াছে; কোথাও বা প্রস্রবণসমূহ সুশীতল ও পরিষ্কৃত জল দিয়া, অরণ্যচর জীবগণের তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছে; গড়মণ্ডলের রাজধানী প্রসিদ্ধ গড় নগর নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণ তীরে, জব্বলপুরের প্রায় পাঁচ মাইল অন্তরে ছিল। চারিদিক্ পর্ব্বতমালায় বেষ্টিত থাকাতে, শত্রুপক্ষ সহজে এই নগর আক্রমণ করিতে পারিত না। মুসলমান-রাজগণ যখন দিল্লীর সিংহাসন হস্তগত করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন জনপদে আপনাদের ক্ষমতা স্থাপন করিতেছিলেন, এক রাজ্যের পর আর এক রাজ্য যখন তাঁহাদের অর্দ্ধচন্দ্রচিহ্নিত পতাকায় শোভিত হইতেছিল, তখন গড়মণ্ডল আপনার স্বাধীনতা অক্ষত রাখিয়াছিল। মুসলমান-ভূপতিগণের সৈন্যসাগরের প্রবল তরঙ্গ এই রাজ্যের ভীষণ প্রাকৃতিক প্রাচীর অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে গড় নগরের দৈর্ঘ্য তিন মাইল ও বিস্তার এক মাইল ছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর একাংশ অতীত হইয়াছে। সম্রাট্ আকবর সাহ দিল্লীর শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতের উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে, মোগলশাসন ক্রমে বদ্ধমূল হইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদের স্বাধীনতা সময়ের অনন্ত স্রোতে ধীরে ধীরে ভাসিয়া যাইতেছে। এই দিগ্বিজয়ের সময়ে—যুদ্ধ ও নরশোণিতপ্রবাহের মধ্যে মোগলসাম্রাজ্যের সংগঠনকালে স্বাধীনতার গৌরবভূমি মিবার প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপসিংহের পরাক্রমে শত্রুর সমক্ষে অবিচলিত রহিয়াছিল; আর গড়মণ্ডল প্রাতঃস্মরণীয়া দুর্গাবতীর অসাধারণ ক্ষমতায় দুরন্ত শত্রুর সমক্ষে আত্মসম্মান রক্ষা করিয়াছিল।

খ্রীঃ ১৫৩০ অব্দে যদুরায়ের বংশীয় দলপৎ শাহ গড়মণ্ডলের অধিপতি হয়েন। এত দিন গড় নগরে ইঁহাদের রাজধানী ছিল। দলপৎ শাহ সিংহলগড় নামক একটি পার্ব্বত্য দুর্গে আপনার রাজধানী স্থাপন করেন। এই সময়ে মহবারাজ্যে ক্ষত্রিয় ভূপতিগণ আধিপত্য করিতেন।

ইঁহাদের অধিকার এক সময় সিংহলগড় ও কান্যকুব্জ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দুর্গাবতী উক্ত মহবারাজ্যের একজন ক্ষত্রিয় ভূপতির কন্যা।

দুর্গাবতীর অসাধারণ সৌন্দর্য্য ও তেজস্বিতা ছিল। কথিত আছে, তাঁহার ন্যায় রূপলাবণ্যবতী মহিলা তৎকালে ভারতবর্ষে কেহ ছিল না। দলপৎ শাহ এই সৌন্দর্য্যশালিনী কামিনীর পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু দুর্গাবতীর পিতা, দলপৎ শাহের বংশগৌরবের হীনতার উল্লেখ করিয়া উপস্থিত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। দলপৎ অতি সুপুরুষ ও অতি তেজস্বী ছিলেন। তাঁহার দেহলক্ষ্মী ও বীরত্বের মহিমায় সমগ্র গড়রাজ্য গৌরবান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সহিত অপূর্ব্ব তেজস্বিতার সংযোগ থাকাতে, দলপতের খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। তেজস্বিনী দুর্গাবতী চিরকাল তেজস্বিতার পক্ষপাতিনী ছিলেন। এখন এই মণ্ডলের অধিপতিতে এই তেজস্বিতার সহিত অলোকসামান্য সৌন্দর্য্যের সম্মিলন দেখিয়া, তিনি তাঁহার সহিতই পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা করিলেন।

দলপৎ রাজপুতযুবতীর বাসনাপূরণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অবিলম্বে সিংহলগড়ে বহুসংখ্য সৈন্য একত্র হইল। দলপৎ ঐ সৈনিকদল সঙ্গে করিয়া মহবারাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধে মহবারাজের পরাজয় হইল। দলপৎ দুর্গাবতীকে লইয়া আপনার রাজধানীতে আসিলেন। বীরপুরুষ বীরত্বের সমুচিত পুরস্কার পাইলেন। সুন্দর বস্তুর সহিত সুন্দর বস্তুর মিলন হইল; তেজস্বিতা তেজস্বিতাকে আশ্রয় করিল; এক ভাবের দুইটি ফুল্ল কুসুম একসূত্রে গ্রথিত হইয়া, গড়মণ্ডলে অনুপম শোভা বিকাশ করিতে লাগিল; তেজস্বিনী দুর্গাবতী তেজস্বী দলপতের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

বিবাহের চারি বৎসর পরে বীরনারায়ণ নামক একটি পুত্র রাখিয়া

দলপৎ শাহ লোকান্তরিত হইলেন। এই সময়ে বীরনারায়ণের বয়স তিন বৎসর। বিধবা দুর্গাবতী আপনার শিশু পুত্রের নামে স্বয়ং গড়রাজ্য-শাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। অধর নামক একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। দুর্গাবতী মন্ত্রিবরের পরামর্শ শুনিয়া শাসনকার্য্য চালাইতেন। তাঁহার শাসনগুণে ক্রমে গড়মণ্ডলের সম্পত্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি জব্বলপুরের নিকটে একটি বৃহৎ জলাশয় খনন করাইলেন। দেখাদেখি তাঁহার একটি পরিচারিকাও ঐ জলাশয়ের নিকটে আর একটি জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিল। এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প আছে। পরিচারিকা দুর্গাবতীর নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিল যে, যে সকল ব্যক্তি বৃহৎ জলাশয় খনন করিতেছে, তাহারা প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ে আপনাদের কর্ম্ম শেষ করিবার পূর্ব্বে নিকটবর্ত্তী এক স্থান হইতে এক ঝুড়ি মাটী কাটিয়া ফেলিবে। দুর্গাবতী সম্মত হইলেন। তাঁহার আদেশে পরিচারিকার প্রার্থনা অনুসারে কার্য্য হইতে লাগিল। ক্রমে দুর্গাবতীর প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ জলাশয়ের নিকটে আর একটি সুন্দর জলাশয় প্রস্তুত হইল। প্রধান অমাত্য অধরও জব্বলপুরের তিন মাইল দূরে একটি বৃহৎ জলাশয় প্রস্তুত করাইলেন। মণ্ডলগড়ে দুর্গাবতীর একটি হস্তিশালা ছিল। কথিত আছে, সেখানে চৌদ্দশত হস্তী থাকিত। যাহা হউক, দুর্গাবতীর আদেশে গড়রাজ্যে সাধারণের নানাবিধ হিতকর সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। প্রজারাও সন্তুষ্ট হইল। তাহারা দুর্গাবতীকে আরাধ্য মাতা ও রক্ষাকর্ত্রী দেবীর ন্যায় ভক্তি করিতে লাগিল। দুর্গাবতী পনর বৎসর পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিলেন। তাঁহার সুশাসনগৌরব চারিদিকে বিস্তৃত হইল; গড়মণ্ডলের ইতিহাস অবলার অক্ষয় কীর্ত্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

মোগল-সম্রাট্ অক্‌বর শাহ অবাধ্য আমির ও ভূস্বামীদিগকে শাসন করিবার জন্য নানাস্থানে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। আসফ খাঁ নামক

একজন উদ্ধতস্বভাব সেনাপতি নর্ম্মদার তটবর্ত্তী প্রদেশ শাসনের জন্য প্রেরিত হয়েন। আসফ গড়মণ্ডলের সমৃদ্ধির বিষয় অবগত ছিলেন; সুতরাং উহা হস্তগত করিবার জন্য যত্নশীল হইলেন। অক্‌বর শাহ নিজের অধিকার বাড়াইতে অনিচ্ছু ছিলেন না। তিনি সেনাপতিকে গড়রাজ্য অধিকার করিতে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। মন্ত্রিবর অধর দিল্লীতে গিয়া এই আক্রমণ-নিবারণে অনেক চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হইল না। আসফ খাঁ খ্রীঃ ১৫৬৪ অব্দে ছয় হাজার অশ্বারোহী, বার হাজার পদাতি ও কতকগুলি কামান লইয়া, গড়-মণ্ডলের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অবিলম্বে এই আক্রমণের সংবাদ গড়রাজ্যে প্রচারিত হইল। রাজ্যের বালক, বৃদ্ধ, বনিতা সকলেই এই সংবাদে ভীত হইয়া উঠিল। কিন্তু তেজস্বিনী দুর্গাবতীর হৃদয়ে কিছুমাত্র ভয়ের আবির্ভাব হইল না। তিনি সাহস সহকারে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে গড়রাজ্যে বহুসংখ্যক সৈন্য একত্র হইল। দুর্গাবতীর পুত্র বীরনারায়ণের বয়স এই সময়ে আঠার বৎসর হইয়াছিল। এই অষ্টা-দশবর্ষীয় যুবকও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, নির্ভয়ে যুদ্ধযাত্রীর দলে মিশিলেন। দুর্গাবতী সৈনিকদিগকে একত্র করিয়াই নিরস্ত থাকেন নাই। তিনি স্বয়ং যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া, মস্তকে রাজমুকুট, হস্তে শাণিত অসি লইয়া অশ্বে উঠিলেন। কামিনীর কোমল হৃদয় এখন স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য অটল হইল। দুর্গাবতী অটল-ভাবে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গম্ভীরস্বরে সৈনিকদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। বীরজায়ার বাক্যে উৎসাহিত হইয়া, গড়মণ্ডলের সৈন্য ভয়ঙ্কর শব্দে চারিদিক্ কাঁপাইয়া তুলিল। তেজস্বিনী দুর্গাবতী বিধর্ম্মী শত্রুকে দেশ হইতে দূর করিবার জন্য ঐ উৎসাহিত সৈনিক-দলের পরিচালন ভার গ্রহণ করিলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্গাবতী।

দুর্গাবতী যখন আট হাজার অশ্বারোহী, দেড় হাজার হস্তী ও বহু-সংখ্য পদাতির সহিত সিংহলগড়ের নিকটে শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দর্শনে বিপক্ষগণ বিস্মিত হইল। তাহাদের হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব ভীতি সঞ্চারিত হইয়া, কার্য্যসাধনে বাধা দিতে লাগিল। দুর্গাবতী প্রবলপরাক্রমে দুইবার আসফ খাঁর সৈন্য আক্রমণ করিলেন, দুই বারেই তাঁহার জয়লাভ হইল। শত্রুপক্ষের ছয় শত অশ্বারোহী যুদ্ধে নিহত হইল। অবশিষ্ট সৈন্য রণস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল। দুর্গাবতী দ্বিতীয়বার শত্রুসেনার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। আসফ খাঁর সৈনিকদল বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। ভারতের বীর-রমণীর এইরূপ লোকাতীত পরাক্রমে দিল্লীর সম্রাটের সেনাপতি হতমান হইলেন। যে বীরপুরুষেরা একসময়ে ভারতের নানা স্থানে জয়পতাকা উড়াইয়া দিয়াছিল; তাহারা আজ বীরাঙ্গনার বিক্রমে পরাভূত হইয়া পলাইতে লাগিল। দুর্গাবতী অবিচলিত সাহসের সহিত বিপক্ষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই—সমস্ত দিন অক্লান্তভাবে শত্রুসৈন্য সন্তাড়িত করিতে লাগিলেন। মোগলসেনাপতি এ অপূর্ব্ব ব্যাপারে স্তম্ভিত হইলেন। এই ভয়ঙ্করী মহাশক্তির অপূর্ব্ব শক্তিতে তাঁহার দেহ অবসন্ন হইয়া আসিল, সাহস দূর হইল এবং তেজস্বিতা পরিম্লান অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় কোথায় যেন মিশিয়া গেল। আসফ খাঁ চারিদিক্ অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। গড়রাজ্যের যুদ্ধক্ষেত্রে বীর্য্যবতী বীরাঙ্গনার এইরূপ অসাধারণ পরাক্রম পরিস্ফুট হইয়াছিল। কামিনীর কমনীয় দেহ এইরূপ কঠোরতার পরিচয় দিয়াছিল। শত্রুসেনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল। শেষে সূর্য্য অস্তগত হইল দেখিয়া দুর্গাবতী আপনার সৈনিকদিগকে বিশ্রাম করিতে অনুমতি দিলেন।

এই বিশ্রামসুখই তেজস্বিনী দুর্গাবতীর পক্ষে মহা অমঙ্গলের কারণ

হইয়া উঠিল। গড়মণ্ডলের সৈন্য সেই সময়ে সমস্ত রাত্রি বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা করাতে দুর্গাবতী চিন্তিত হইলেন। কিছুকাল বিশ্রামের পর, সেই রাত্রিতেই শত্রুদিগকে আক্রমণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল। তাঁহার ইচ্ছামত কার্য্য হইলে আসফ খাঁর সৈন্য নিঃসন্দেহ নির্ম্মূল হইত। কিন্তু বীরজায়ার এই ইচ্ছা ফলবতী হইল না। সৈনিকগণের সকলেই বিশ্রাম করিতে উৎসুক হইল; সকলেই তাঁহাকে বিনয়সহকারে নিশীথে বিপক্ষসৈন্য আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে নিষেধ করিতে লাগিল। দুর্গাবতী অগত্যা এই প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। এদিকে আসফ খাঁ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। যুদ্ধে দুইবার পরাজিত হওয়াতে তাঁহার হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছিল। এখন গড়মণ্ডলের সৈনিকগণের বিশ্রামের সংবাদে তিনি হর্ষোৎফুল্ল হইয়া কামান লইয়া, তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে যাত্রা করিলেন। প্রভাত হইতে না হইতেই আসফ খাঁ নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন। দুর্গাবতীর সৈনিকগণ গড়নগরের ১২ মাইল পূর্ব্বে একটি সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটের নিকটে অবস্থিতি করিতেছিল। আসফ খাঁ রাত্রিকালেই তাহাদিগকে সেই স্থানে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তখন আসফ খাঁর কামান আসিয়া পঁহুছে নাই। প্রথম আক্রমণে আসফ, দুর্গাবতীর পরাক্রমে পরাজিত ও সবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পশ্চাৎ হটিয়া গেলেন। পরদিন প্রাতঃকালে কামান পঁহুছিলে বিপক্ষেরা আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। দুর্গাবতী গিরিসঙ্কটের প্রবেশপথে হস্তিপৃষ্ঠে থাকিয়া ঐ আক্রমণে বাধা দিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈনিকগণ অসামান্য সাহসে যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু অবিচ্ছিন্ন গোলাবর্ষণে তাহারা অধিকক্ষণ স্থির থাকিতে পারিল না। গোলার পর গোলার আঘাতে সকলে কাতর হইয়া পড়িল। কুমার বীরনারায়ণ এই সময়ে অসাধারণ বিক্রম দেখাইতে লাগিলেন। অষ্টাদশবর্ষবয়স্ক তরুণ বীরপুরুষের লোকাতীত পরাক্রম দর্শনে মোগলসৈন্য

স্তম্ভিতপ্রায় হইল। কিন্তু শেষে বহুসংখ্যক শত্রুর আক্রমণে বীরনারায়ণ আহত হইয়া পতনোন্মুখ হইলেন। দুর্গাবতী প্রাণাধিক পুত্রের কাতরতা দর্শনে যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন না। তিনি পুত্রকে স্থানান্তরিত করিতে আদেশ দিয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরাক্রমে রণকৌশল দেখাইতে লাগিলেন। বিপক্ষেরা অসময়ে অতর্কিতভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহাতেও তিনি কাতর হয়েন নাই। স্নেহের অবলম্বন, প্রীতির পুত্তলী তনয় অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত ও হতচেতন হইয়াছে, তাহাতেও তাঁহার হৃদয় অধীর হয় নাই। দুর্গাবতী ধীরভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পশ্চাতে একটি ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য সরিৎ ছিল। রাত্রিকালে ঐ নদী প্রায় শুকাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু প্রভাতে যুদ্ধের সময়ে, উহা জলপূর্ণ হইয়া বৃহৎ স্রোতস্বতীর আকার ধারণ করিল। দুর্গাবতী উহা দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সৈনিকগণ স্রোতস্বতী পার হইয়া, পশ্চাতে যাইয়া যুদ্ধ করিতে পারিবে না। শত্রুপক্ষের কামানের মুখে থাকিয়াই তাঁহাদিগকে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু গোলার আঘাতে তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য একে একে বীরশয্যায় শয়ন করিতে লাগিল। অধিকাংশ সৈন্যের দেহরাশিতে সমরস্থল ভীষণতর হইয়া উঠিল। চারিদিকের মোগলসৈন্য উদ্বেল সাগরের ন্যায় ভয়ঙ্কর গর্জ্জনে ক্রমে তাঁহার সম্মুখে আসিতে লাগিল। তথাপি তেজস্বিনী দুর্গাবতী ভীতা হইলেন না। তিনি তিনশতমাত্র পদাতি লইয়া ঐ উদ্বেল সৈন্যসাগরের গতিরোধে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে শত্রুর নিক্ষিপ্ত একটি সুতীক্ষ্ণ বাণে হঠাৎ তাঁহার এক চক্ষু বিদ্ধ হইল। দুর্গাবতী ঐ বাণ বলপূর্ব্বক বাহির করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল না। শর নিঃসারিত না হইয়া চক্ষু-কোটরেই রহিল। দুর্গাবতী ইহাতেও কাতর না হইয়া, গিরিসঙ্কট রক্ষার জন্য পূর্ব্বের ন্যায় অটলভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইহার পর আর একটি তীর

প্রবলবেগে তাঁহার গ্রীবাদেশে আসিয়া পড়িল। দুর্গাবতী এইরূপ পুনঃপুনঃ শরাঘাতে কাতর হইলেন। চারিদিক্ তাঁহার নিকট অন্ধকারময় বোধ হইতে লাগিল। তখন তিনি জয়াশায় জলাঞ্জলি দিলেন। যে অভিপ্রায়ে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যে অভিপ্রায় লক্ষ্য করিয়া মহাবিক্রমে বিপক্ষসৈন্য আক্রমণ করিয়াছিলেন, যে অভিপ্রায়ে সমরস্থলে প্রাণাধিক পুত্রের শোচনীয় দশাও স্থিরভাবে চাহিয়া দেখিয়াছিলেন, সে অভিপ্রায়সিদ্ধির আর কোনও সম্ভাবনা রহিল না। কিন্তু বীররমণী এ অবস্থাতেও ভীরুর ন্যায় যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করিলেন না; ভীরুর ন্যায় বীরধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া, শত্রুর পদানত হইলেন না। তাঁহার হস্তিচালক পশ্চাতের নদী পার হইয়া যাইতে তাঁহার নিকট বারংবার অনুমতি চাহিতে লাগিলেন; কিন্তু দুর্গাবতী তাহাতে সম্মত হইলেন না। বীরাঙ্গনা বীরধর্ম্ম রক্ষার জন্য সমরক্ষেত্রেই দেহপাত করিতে উদ্যত হইলেন। যখন আহত স্থান হইতে অনর্গল শোণিতধারা বাহির হইয়া তাঁহার দেহ প্লাবিত করিল, শরীর স্তম্ভিত হইয়া আসিল, তেজ ক্ষীণতর হইয়া পড়িল, তখন তিনি হস্তিচালকের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ অসি লইলেন, এবং অম্লানবদনে উহা স্বকীয় দেহে প্রবেশিত করিয়া, রুধিররঞ্জিত করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার লাবণ্যময় কমনীয় দেহ বিচেতন ও বিবর্ণ হইয়া পড়িল। ছয় জন সৈনিকপুরুষ দুর্গাবতীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহারা ইহা দেখিয়া জীবনের আশা ছাড়িয়া শত্রুর মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া, স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইল।

যে স্থানে দুর্গাবতী প্রাণত্যাগ করেন, পথিকগণ আজ পর্য্যন্ত পথ অতিবাহন-সময়ে সেই স্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। উহা একটি সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট। উহার নিকটে দুইটি অতি প্রকাণ্ড গোলাকার পাথর রহিয়াছে। সাধারণের বিশ্বাস, দুর্গাবতীর রণডঙ্কা প্রস্তরে পরিণত হই-

য়াছে। যাহা হউক, ঐ গিরিসঙ্কটের সহিত প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনার সংস্রব থাকাতে, উহা একটি দর্শনীয় স্থানের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। গম্ভীর স্থানের গম্ভীর দৃশ্য দেখিলে মনে অনির্ব্বচনীয় ভাবের সঞ্চার হ থাকে।

যুদ্ধের সময় দুর্গাবতীর লোকে আহত বীরনারায়ণকে শত্রুর অজ্ঞাতসারে চৌরগড় নামক দুর্গে আনিয়াছিল। আসফ খাঁ শেষে ঐ দুর্গও আক্রমণ করিলেন। এই আক্রমণে বীরনারায়ণ নিহত হইলেন। এ দিকে দুর্গস্থিত মহিলাগণ বিধর্ম্মী শত্রুর হস্তে আত্মসম্মান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় আবাসগৃহে আগুন লাগাইয়া দিলেন। আসফ খাঁ দুর্গ জয় করিলেন। কিন্তু কামিনীকুলের ধর্ম্ম জয় করিতে পারিলেন না। রমণীগণ জ্বলন্ত অনলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া আপনাদের পবিত্রতার গৌরব রক্ষা করিলেন।

মোগলসৈন্য গড়নগর লুণ্ঠন করিয়া অনেক অর্থ পাইয়াছিল। আসফ খাঁ বিশ্বাসঘাতক হইয়া অনেক সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন। কথিত আছে, তিনি দুর্গাবতীর ধনাগারে একশতটী স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ কলস পাইয়াছিলেন। আজ পর্য্যন্ত সূতগণ দুর্গাবতীর বীরত্ব-কাহিনী গীতিকায় নিবদ্ধ করিয়া, বীণাসংযোগে নানা স্থানে গাহিয়া বেড়ায়। কালের কঠোর আক্রমণে গড়রাজ্য এখন পূর্ব্বগৌরবভ্রষ্ট হইয়াছে; কিন্তু তেজস্বিনী দুর্গাবতীর গৌরব কখনও বিলুপ্ত হইবে না। যতদিন স্বাধীনতার সম্মান থাকিবে, যতদিন অসাধারণ বীরত্ব বীরেন্দ্রসমাজের একমাত্র সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে, যত দিন "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই মধুর বাক্য স্বদেশবৎসল ব্যক্তির কোমল হৃদয়ে অমৃতপ্রবাহের সঞ্চার করিবে এবং যতদিন আত্মাদর ও আত্মসম্মান পাপ ও কুপ্রবৃত্তির মোহিনী মায়ায় বিমুগ্ধ না হইয়া, অটল গিরিবরের ন্যায় উন্নত থাকিবে, তত দিন দুর্গাবতীর কীর্ত্তির বিলয় হইবে না।

ভারতে ভারতীর অপূর্ব্ব পূজা।

(নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়)

খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দী অতীত হইয়াছে। অপূর্ব্ব উৎসব বিপুল সম্পত্তি লইয়া সপ্তম শতাব্দী ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। এ সময়ে ভারতের বর্ত্তমান কালের ন্যায় মলিন বেশ নাই, দীনতা-হীনতার আবেশ নাই, শোকের উচ্ছ্বাস, নৈরাশ্যের আর্ত্তনাদ, মহামারীর করাল ছায়া, কিছুই নাই। এ সময়ে ভারত প্রফুল্ল, স্বাধীনতার বলে বলীয়ান্, ধনসম্পত্তির মহিমায় গৌরবান্বিত। এ সময়ে আর্য্যকীর্ত্তি পূর্ণতা পাইয়াছে। আর্য্য-সভ্যতায় জগতে অতুল্য দর্শনশাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। মনোহর কবিতা-বল্লীর মধুময় কুসুম বিকাশ পাইয়াছে। জ্যোতিষ, গণিত, চিকিৎসা-বিদ্যার গৌরব বাড়িয়াছে। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন শীলাদিত্যের সুশাসন-মহিমায় ভারতভূমি সম্পত্তিশালিনী হইয়াছেন। মহারাষ্ট্ররাজ মহাবীর দ্বিতীয় পুলকেশীর বীরত্বে ভারতের বীরত্বকীর্ত্তি উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে। নালন্দায় ভারতীয় অপূর্ব্ব পূজায় ভারতের গৌরব চারি-দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

নালন্দায় বেদমাতা ভারতীর এই পূজা ভারতের একটী প্রধান কীর্ত্তি। নালন্দা গয়ার নিকটে। কেহ কেহ বর্ত্তমান বড়গাঁওকে প্রাচীন নালন্দা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যাহা হউক, নালন্দা বৌদ্ধদিগের পরম

পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, এই স্থানে একটি আম্র-কানন ছিল; কোন ধনাঢ্য বণিক উহা বুদ্ধকে দান করেন। বুদ্ধ ঐ আম্রকাননে অনেক দিন অতিবাহিত করিয়াছেন। ক্রমে ঐ স্থানে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ধর্ম্মপরায়ণ বৌদ্ধ ভূপতিগণের দানশীলতায় ক্রমে বিদ্যামন্দির সম্প্রসারিত ও উন্নত হইয়া উঠে; নালন্দার বিদ্যামন্দির এই সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান বৌদ্ধ-বিদ্যালয় বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। বৌদ্ধদিগের আঠারটি ভিন্ন ভিন্ন দলের দশ হাজার শ্রমণ, এই স্থানে থাকিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র, ন্যায়, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, সাহিত্য ও চিকিৎসাবিদ্যার আলোচনা করিতেন। মনোহর বৃক্ষবাটিকায় এই মহাবিদ্যালয় পরিশোভিত ছিল। ছয়টি চারি-তল অট্টালিকায় শিক্ষার্থিগণ বাস করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য একশতটি গৃহ ছিল। এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রজ্ঞদিগের পরস্পর সম্মিলনের জন্য মধ্যস্থানে অনেক গুলি বড় বড় ঘর সজ্জিত থাকিত। মহারাজ শীলাদিত্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদিগের আহার, পরিধেয় ও ঔষধাদির সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন; নগরের কোলাহল ঐ স্থানের শান্তিভঙ্গ করিত না। সাংসারিক প্রলোভন উহার পবিত্রতা বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইত না। শিক্ষার্থিগণ ঐ পবিত্র শান্তি-নিকেতনে প্রশান্তভাবে শাস্ত্র-চিন্তায় নিবিষ্ট থাকিতেন। নালন্দার বিদ্যালয় কেবল বাহ্য সৌন্দর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল না। অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্যেও উহা সবিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। উহার শিক্ষকগণ জ্ঞানে ও দূর-দর্শিতায় প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং উহার শিক্ষার্থিগণ শাস্ত্রালোচনা ও শাস্ত্র-চিন্তায় প্রতিপত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এই প্রসিদ্ধ বিদ্যামন্দিরের প্রধান অধ্যাপকের নাম শীলভদ্র। ইনি কেবল বয়সে বৃদ্ধ ছিলেন না, শাস্ত্রজ্ঞানেও বৃদ্ধ বলিয়া সাধারণের নিকটে সম্মানিত ছিলেন। সমস্ত শাস্ত্রই ইঁহার আয়ত্ত ছিল। অসাধারণ ধর্ম্মপরতায়, অসাধারণ দূরদর্শিতায়

ও অসাধারণ অভিজ্ঞতায় এই বর্ষীয়ান্ পুরুষ্ নালন্দার বিদ্যালয় অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

চীনের প্রসিদ্ধ পর্য্যটক হিউএন্থ্ সঙ্গ্ এই সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি ভারতীর ঐ লীলাভূমিতে যাইতে নিমন্ত্রিত হয়েন। হিউএন্থ্ সঙ্গ্ বিনয়ের সহিত নিমন্ত্রণ গ্রহণপূর্ব্বক নালন্দায় উপনীত হইলেন। বিদ্যালয়ে প্রবেশসময়ে দুই শত জ্ঞানবৃদ্ধ শ্রমণ আপনাদের প্রসিদ্ধ অতিথির যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। ইঁহাদের পশ্চাতে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ, কেহ ছাতা ধরিয়া, কেহ নিশান উড়াইয়া, কেহ বা গম্ভীর স্বরে অতিথির প্রশংসাগীত গাইয়া তাঁহাকে শত গুণে মহীয়ান্ করিয়া তুলিলেন। এইরূপ আদর ও সম্মানের সহিত পরিগৃহীত হইয়া হিউএন্থ সঙ্গ্ বিদ্যালয়ের শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যক্ষের নিকটে আসিলেন। শীলভদ্র বেদীতে বসিয়াছিলেন, হিউএন্থ সঙ্গ্ বেদীর সম্মুখে আসিয়া, বিনম্রভাবে বর্ষীয়ান্ পুরুষকে অভিবাদন করিলেন। এই অবধি হিউএন্থ সঙ্গ্ শীলভদ্রের শিষ্যশ্রেণীতে নিবেশিত হইলেন। যিনি চীন সাম্রাজ্যে সর্ব্ব প্রধান তত্ত্ববিৎ বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন, নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, সাধারণে যাঁহার জ্ঞানগরিমার নিকটে অবনতমস্তক হইত, তিনি জ্ঞান-সঞ্চয়ের মানসে ভারতীর এই লীলাভূমিতে, ভারতের এই অভিজ্ঞ পুরুষের শিষ্য হইলেন। বিদ্যালয়ের একটি উৎকৃষ্ট গৃহে হিউএন্থ সঙ্গ্‌কে স্থান দেওয়া হইল। দশজন তাঁহার অনুচর হইল, দুইজন শ্রমণ নিয়ত তাঁহার শুশ্রূষার্থে নিয়োজিত হইলেন। মহারাজ শীলাদিত্য তাঁহার দৈনন্দিন ব্যয় নির্ব্বাহের ভার গ্রহণ করিলেন। হিউএন্থ সঙ্গ্ এইরূপে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদিগের আদরণীয় হইয়া, পাঁচ বৎসর বিদ্যালয়ে রহিলেন। পাঁচবৎসর মহাপ্রাজ্ঞ শীলভদ্রের পাদমূলে বসিয়া পাণিনির ব্যাকরণ, ত্রিপিটক ও ব্রাহ্মণদিগের নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। এখন এই বিদ্যামন্দিরে পূর্ব্বতন

সৌন্দর্য্য নাই। কালের কঠোর আক্রমণে, বিদেশীর আধিপত্যপ্রভাবে ভারতীর এই লীলাভূমি এখন ভগ্নদশায় পতিত রহিয়াছে।

সীতারাম রায়।

যখন সম্রাট্ ফরুরোখশের দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, মহামতি নানকের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসম্প্রদায় গুরু গোবিন্দের মহামন্ত্রে সঞ্জীবিত হইয়া যখন ধীরে ধীরে আপনাদের মহাপ্রাণতার পরিচয় দিতেছিল, মহারাষ্ট্রীয়গণ তখন মহাবীর শিবাজীর প্রদত্ত শিক্ষাবলে, অসীম সাহস ও অসাধারণ তেজস্বিতার সহিত সমগ্র ভারতবর্ষে প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করিতেছিল, যখন বাঙ্গালার যশোহর জেলা সুরম্য জলাশয়, সুদৃশ্য অট্টালিকা ও সুদৃঢ় দুর্গে পরিবৃত হইয়া, ভারতের সমৃদ্ধ ভূখণ্ডে আপনার গৌরব ও সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর পরিচয় দিতেছিল। এ জেলায় মধুমতী নদীর পশ্চিমতীরে, মহমুদপুরে একটি সুবিস্তৃত দুর্গ ছিল। দুর্গের চারি দিকে উচ্চপ্রাচীর—প্রাচীরের চতুঃপার্শ্বে পরিখা। এই দুর্গের প্রশস্ত প্রাসাদে একদা রাত্রি কালে একটি সুগঠিত, পূর্ণযৌবনপ্রাপ্ত পুরুষ নিবিষ্টচিত্তে সতরঞ্চ খেলিতে ছিলেন। যুবকের মূর্ত্তি গম্ভীর, প্রশান্ত অথচ বীরত্ব-ব্যঞ্জক। যুবক অনন্যমনে, অনন্যসাধারণ পারদর্শিতার সহিত সতরঞ্চের গুটিকা চালনা করিতেছিলেন। এমন সময়ে সংবাদ আসিল, বাদশাহের সৈন্য দুর্গের অভিমুখে আসিতেছে, তাহারা শীঘ্রই দুর্গ অবরোধ ও অধিকার করিবে। যুবক কিছু অন্যমনস্ক হইলেন, তাঁহার ভ্রূযুগল ঈষৎ আকুঞ্চিত হইল, ললাটরেখা ঈষৎ বিকাশ পাইয়া, প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যের ব্যতিক্রম ঘটাইল; যুবক কিছু অস্থির হইলেন বটে, কিন্তু খেলা হইতে বিরত হইলেন না;

প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিবার জন্য, আবার সবিশেষ বিবেচনার সহিত গুটিকা চালনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী পরাজিত হইলেন না। কিঞ্চিৎ অস্থিরতাপ্রযুক্ত যুবক সে বাজি হারিলেন। তখন তিনি নিরতিশয় বিরক্ত হইয়া কহিলেন,—

"আজ যে কষ্ট পাইলাম, যবনের মাথা কাটিলেও সে কষ্ট যাইবার নহে।"

নিকটে একটি দীর্ঘকায়, ভীমপরাক্রম বীরপুরুষ দণ্ডায়মান ছিল। যুবকের কথা শুনিয়া, সে নিঃশব্দে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

রজনী প্রভাত হইল; নবীন সূর্য্য নবীনভাবে উৎফুল্ল হইয়া, মহম্মদপুরের দুর্গ উদ্ভাসিত করিল। যে যুবক গত রাত্রিতে সতরঞ্চ খেলিতেছিলেন, প্রভাতে তিনি মুখপ্রক্ষালন করিতেছেন, এমন সময়ে সেই দীর্ঘকায় বীরপুরুষ তাঁহার পদতলে মনুষ্যের একটি ছিন্ন মস্তক রাখিয়া, অভিবাদন করিল। এই আকস্মিক ব্যাপারে যুবক চমকিত হইলেন। অসময়ে অতর্কিত ভাবে মনুষ্যের ছিন্ন মস্তক দেখিয়া, গম্ভীরস্বরে বীরপুরুষকে কহিলেন,—

"মেনাহাতী! এ কি?"

মেনাহাতী অবনতমুখে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল,—

"মহারাজ! বিপক্ষ সৈন্য পরাভূত হইয়া পলায়ন করিয়াছে। ইহা সেনাপতি আবুতোরাপের মস্তক।"

যুবকের জ্যোতির্ম্ময় চক্ষু অধিকতর জ্যোতির্ম্ময় হইল; গম্ভীর প্রশান্ত মুখমণ্ডল অধিকতর গাম্ভীর্য্যের চিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিল। যুবক কিছু চিন্তিত হইলেন। কিন্তু সে চিন্তার আবেগ বাহিরে পরিস্ফুট হইল না। যুবক প্রফুল্লচিত্তে মেনাহাতীর যথোচিত প্রশংসা করিলেন এবং প্রফুল্লচিত্তে এইরূপ সাহস ও পরাক্রমের জন্য তাহাকে পুরস্কৃত করিয়া কহিলেন,—"নবাবের সহিত বোধ হয়, শীঘ্র তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত

হইবে। যাহা হউক, ভয়ের কোন কারণ নাই। তুমি সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে থাক।"

পূর্ণযৌবনপ্রাপ্ত এই তেজস্বী পুরুষের নাম সীতারাম রায়। আর এই বীরত্বশালী, ভীমপরাক্রম বীর পুরুষ, তাঁহার সেনাপতি মেনাহাতী।

সীতারাম উত্তররাঢ়ী কায়স্থ; তাঁহার কৌলিক উপাধি বিশ্বাস। মধুমতী নদীর পূর্ব্বতীরে হরিহরনগর নামে একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে সীতারামের জন্ম হয়। সীতারামের পিতার যৎসামান্য ভূসম্পত্তি ছিল। যাহা হউক, সীতারাম তখনকার প্রচলিত রীতি অনুসারে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় লেখাপড়া শিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু পাঠশালায় তিনি প্রায়ই অনুপস্থিত থাকিতেন। নিস্তেজ নিরীহ পণ্ডিত হওয়া অপেক্ষা, সাহসী, তেজস্বী বীরপুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইতে তাঁহার অধিকতর ইচ্ছা ছিল। মহারাষ্ট্রের উদ্ধারকর্ত্তা শিবাজী, বাল্যকালে অসামান্য তেজস্বিতার পরিচয় দিয়া, ভারতের হিন্দু, মুসলমান, উভয় জাতিকেই চমকিত করিয়াছিলেন; পঞ্জাবকেশরী রণজিৎসিংহ তরুণবয়সে লোকাতীত শূরত্বে পঞ্জাবের গৌরবসূর্য্য উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সীতারাম আপনার বীরত্ব ও সাহসের প্রভাবে, বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিতে উদ্যত হইলেন।

সীতারাম অল্পবয়সে তীরসঞ্চালনে সুদক্ষ হইলেন, লাঠিখেলায় প্রতিপত্তি লাভ করিলেন, অশ্বারোহণে অপূর্ব্ব কৌশল দেখাইয়া, দর্শকদিগকে স্তম্ভিত করিতে লাগিলেন, বন্দুক ধরিতে সবিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিলেন এবং অসিচালনায় সমগ্র বাঙ্গালায় অদ্বিতীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন। তিনি যেরূপে চক্ষুর নিমিষে লক্ষ্য পাতিত করিতেন, যেরূপ দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইতেন, যেরূপে নিষ্কোষিত অসি ও সুদৃঢ় লাঠি লইয়া, অসাধারণ চালনাকৌশল দেখাইতেন,

তাহা সে সময়ে বাঙ্গালার নবাবের এবং দিল্লীর সম্রাটের অমাত্যগণ বিস্ময় ও ভীতির সহিত শুনিতেন। বাঙ্গালী এখন সাধারণের নিকটে ভীরু বলিয়া ধিক্কৃত হইতেছে; বাঙ্গালা এখন কতিপয় অনভিজ্ঞ বিদেশীর লিখিত ইতিহাসে, অকর্ম্মণ্য সন্তানের প্রসূতি বলিয়া অবিরত কুৎসা সংগ্রহ করিতেছে; কিন্তু বাঙ্গালা পূর্ব্বে কখনও এরূপ কলঙ্কের কালিমায় মলিন হয় নাই। অনেক দোষে বাঙ্গালার অধঃপতন হইয়াছে; অনেক অকার্য্যের অনুষ্ঠানে বাঙ্গালী মনস্বিতা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু বাঙ্গালা পূর্ব্বে কখনও আত্মগৌরবে বিসর্জ্জন দেয় নাই। যখন দিল্লীর মুসলমান-সম্রাট্গণ ভারতে আধিপত্য স্থাপন করেন, দেশের পর দেশ যখন তাঁহাদের পদানত হইতে থাকে, তখনও বাঙ্গালী অনেক স্থানে আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতেন। বাঙ্গালার বিজয়সিংহ দুস্তর সাগর অতিক্রমপূর্ব্বক দেশান্তরে অধিকার বিস্তার করিয়াছেন। বাঙ্গালার গঙ্গাবংশীয়েরা বাহুবলে উড়িষ্যায় আধিপত্য স্থাপন করিয়া ইতিহাসের নিকটে সম্মান পাইয়াছেন, বাঙ্গালার পাল ও সেন রাজারা বিজয়িনী সেনার অধিনায়ক হইয়া, বিজয়-মহিমায় সংবর্দ্ধিত হইয়াছেন। বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিক আপনাদের শূরত্ব ও বীরত্বে দিল্লীর সম্রাট্কে চমকিত করিয়া তুলিয়াছেন। বাঙ্গালার সীতারামও ক্ষমতা ও তেজস্বিতায় বীরেন্দ্রসমাজের শ্রদ্ধাস্পদ হয়েন। বাঙ্গালার বীর্য্যবন্ত পুরুষসিংহেরা যথানিয়মে রণকৌশল শিক্ষা করিতেন, এবং প্রশস্ত ক্রীড়াভূমিতে কৃত্রিম যুদ্ধ করিয়া, দর্শকদিগের প্রীতি-সম্পাদনে ব্যাপৃত থাকিতেন। বাঙ্গালা পূর্ব্বে কখন আত্মগৌরবে জলাঞ্জলি দেয় নাই। যত দিন ইতিহাসের মর্য্যাদা থাকিবে, যত দিন দেশহিতৈ-ষিতার সম্মান অক্ষুণ্ণ রহিবে, যত দিন পূর্ব্বস্মৃতি সমবেদনার প্রাধান্য রাখিতে প্রয়াস পাইবে, তত দিন সত্যনিষ্ঠ সহৃদয়গণ মুক্তকণ্ঠে,

গম্ভীরস্বরে কহিবেন,—বাঙ্গালা পূর্ব্বে কখনও আত্মগৌরবে জলাঞ্জলি দেয় নাই।

বয়োবৃদ্ধির সহিত সীতারাম রায় অনেক বীরপুরুষের অধিনায়ক হইলেন। ক্রমে অনেক ভূসম্পত্তি তাঁহার হস্তগত হইতে লাগিল। বিভিন্ন জনপদে আধিপত্য স্থাপন করিয়া, স্বাধীন রাজার সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। মহমুদপুরে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হইল। সীতারাম আপনার ভুজবলে "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা" এই কথা কার্য্যে পরিণত করিয়া তুলিলেন। তিনি পরপীড়িত, পরপদানত দুঃখীর উপকার করিতেন। যেখানে নিঃসহায় ও নিঃসম্বল ব্যক্তির কষ্ট দেখিতেন, সেইখানেই সীতারাম তাহার কষ্টমোচনে উদ্যত হইতেন। এই সময়ে যশোহরে দ্বাদশ চাকলা ছিল। ঐ চাকলার অধিস্বামিগণ দিল্লীর সম্রাট্‌কে রীতিমত রাজস্ব দিতেন না। সম্রাট্ ফর্‌রোখশের বীরশ্রেষ্ঠ সীতারামের বীরত্বের কাহিনী শুনিয়াছিলেন. এখন তাঁহাকেই ঐ অবাধ্য ভূস্বামীদিগের দমন জন্য অনুরোধ করিলেন। বাদশাহের অনুরোধপত্র পাইয়া সীতারাম সকল ভূস্বামীকে আপনার অধীন করিয়া, দ্বাদশ চাকলার অধিপতি হইলেন। সম্রাট্ সন্তুষ্ট হইলেন। তেজস্বী সীতারাম অসামান্য তেজস্বিতার পরিচয় দিলেন। বৈভবহীন সামান্য লোকের সন্তান আপনার ক্ষমতায় "রাজা" হইলেন। তাঁহার গৃহ সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ হইল। তিনি পরোপকারব্রত হইতে স্খলিত হইলেন না। রাজা সীতারাম রায় পূর্ব্বের ন্যায় দুঃখীর দুঃখমোচনে, বিপন্নের বিপত্তি-নিবারণে, অসহায়কে সাহায্য দানে, নিঃসম্বলের সম্বল-বিধানে ব্যাপৃত রহিলেন।

বাঙ্গালার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ সীতারামের নিকটে রাজস্ব চাহিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু সীতারাম নবাবের কথায় কর্ণপাত করিলেন না এবং নবাবের নিকটে কোনও প্রকারে অবনত হইলেন না। তিনি

তেজস্বিতার সহিত নবাবকে বলিয়া পাঠাইলেন,—"আমি নবাবের প্রজা নহি। আমার নিকটে রাজস্ব প্রার্থনা করা ধৃষ্টতা মাত্র। আমি যশোহরের স্বাধীন রাজা।" নবাব ক্রুদ্ধ হইলেন; সীতারামের শাসন জন্য সৈন্য পাঠাইলেন; ভূষণার মুসলমান ফৌজদারের সহিত সীতারামের যুদ্ধ হইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সীতারামের বীরত্বে,সীতারামের সাহসে, অধিকন্তু সীতারামের সেনাপতি মেনাহাতীর অপূর্ব্ব কৌশলে, মুসলমান সৈন্য পরাজিত হইল। বাঙ্গালার বীরপুরুষ, স্বাধীনতার গৌরব রক্ষা করিলেন এবং প্রকৃত বীরত্ব দেখাইয়া, নবাবকে স্তম্ভিত করিয়া তুলিলেন।

এই সময়ে আবুতোরাপ নামক একজন সেনাপতি ভূষণার ফৌজদারের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। দিল্লীর বাদশাহ তাঁহাকে যথানিয়মে সনন্দ দিলেন। আবুতোরাপ সীতারামের দমন জন্য রাত্রিকালে তাঁহার মহমুদপুর দুর্গের নিকটে উপনীত হয়েন। এই সময়ে সীতারাম সতরঞ্চ খেলিতেছিলেন। খেলায় হারি হওয়াতে রাজা সীতারাম রায় বিরক্ত হইয়া, যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া প্রভুভক্ত মেনাহাতী প্রভুর কথা সার্থক করিবার জন্য সেই রাত্রিতেই আবুতোরাপকে আক্রমণ করেন এবং তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া, পরদিন প্রাতঃকালে তদীয় ছিন্ন মস্তক সীতারামের নিকটে আনিয়া দেন। ঐ মস্তক দেখিয়াই, রাজা সীতারাম রায় সাহসী সেনাপতিকে পুরস্কার দিয়াছিলেন, এবং নবাবের সহিত যুদ্ধ অপরিহার্য্য জানিয়া, মেনাহাতীকে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে কহিয়াছিলেন; কেহ কেহ নির্দ্দেশ করেন যে, সীতারামের সহিত যুদ্ধে আবুতোরাপ পরাজিত ও নিহত হয়েন।

আবুতোরাপের মৃত্যুসংবাদে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ চিন্তিত হইলেন। নাটোরের রাজা রঘুনন্দন নবাবের দেওয়ানি করিতেন। নবাবের অনুরোধে রঘুনন্দনের জ্যেষ্ঠ সহোদর রাজা রামজীবন সীতারামের

দমনের কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার সাহসী কর্ম্মচারী দয়ারাম রায় এই কার্য্যসাধনের উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন। বাঙ্গালী বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইলেন। হিন্দু হিন্দুত্বের অবমাননার জন্যে হিন্দুর সর্ব্বনাশে উদ্যত হইয়া উঠিলেন। ইঁহাদের উদ্যম সর্ব্বাংশে সফল হইল। ইঁহারা সম্মুখ-সমরে প্রবৃত্ত না হইয়া, সীতারামের সেনাপতি মেনা-হাতীকে কৌশলক্রমে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চেষ্টা সফল হইল। বিপক্ষেরা কৌশলক্রমে নিরস্ত্র মেনাহাতীকে শূলবিদ্ধ করিল। চক্রান্তকারী স্বদেশীয় শত্রুর হস্তে মেনাহাতী নিহত হইল। রাজা সীতারাম রায় প্রভুভক্ত সেনাপতির মৃত্যুতে নিরতিশয় কাতর হইলেন। তিনি যুদ্ধের আয়োজন না করিয়া, শত্রুর হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। কেহ কেহ কহেন, নবাবের সৈন্য চারি দিক্ হইতে আসিয়া তাঁহাকে অবরুদ্ধ করে। যাহা হউক, নবাবের সেনাপতি সীতারামকে অবরুদ্ধ করিয়া দরবারে লইয়া যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে সীতারাম আপনার অঙ্গুরীয়স্থ হীরকলেহনে দেহত্যাগ করিলেন। পূর্ণযৌবনে পুরুষসিংহ আপনার ইচ্ছায় অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন; মতান্তরে, রাজা সীতারাম মুর্শিদাবাদের কারাগারে বিষাক্ত অঙ্গুরীয়-লেহনে আত্মবিসর্জ্জন করেন।

রাজা সীতারাম রায় যশোহরে অনেকগুলি বৃহৎ জলাশয় খনন করাইয়াছেন; দেবতার উদ্দেশে অনেক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া আপনার অচলা দেবভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। মহমুদপুরের দুর্গ তাঁহার একটি প্রধান কীর্ত্তি-চিহ্ন। তাঁহার আদেশে সুদক্ষ শিল্পিগণ আসিয়া এই দুর্গে নানাবিধ অস্ত্র প্রস্তুত করিত। ঢাকার শিল্পকরকর্ত্তৃক উৎকৃষ্ট কামান নির্ম্মিত হইত। এই সকল কামানে মহমুদপুর দুর্গের গৌরববৃদ্ধি হইয়াছিল। রাজা সীতারামের প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণসাগর আজ পর্য্যন্ত যশোহর জেলায় সর্ব্বপ্রধান জলাশয় বলিয়া প্রসিদ্ধ রহিয়াছে।

এখন রাজা সীতারাম রায়ের অনেক কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ অনন্ত কালের অপার শক্তির পরিচয় দিতেছে। সীতারামের শাসনে মহমুদপুর সবিশেষ সমৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ সময়ে ইদানীন্তন মহানগরী কলিকাতা ব্যাঘ্রাদি হিংস্রপশুপূর্ণ জঙ্গলে পরিবৃত ছিল এবং ঐ সময়ে ইদানীন্তন বাঙ্গালার হর্ত্তা, কর্ত্তা ও বিধাতা শ্বেতপুরুষগণ বাঙ্গালায় সামান্য বণিকের বেশে ক্রয়বিক্রয়কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন।

সংযুক্তা।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশ অতীত হইয়াছে। দিল্লীতে চৌহানকুলরবি পৃথ্বীরাজ আধিপত্য করিতেছেন। কান্যকুব্জ রাঠোর কুলশ্রেষ্ঠ জয়চন্দ্রের পদানত রহিয়াছে। মিবার পরাক্রান্ত সমরসিংহের শাসনমহিমায় গৌরবান্বিত হইয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তের আর্য্য মহাপুরুষগণ স্বাধীনভাবে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিতেছেন। আর্য্যগণের কীর্ত্তি-কলাপ চারণদিগের ছন্দোময়ী গীতিকায় নিবদ্ধ হইয়া, চারিদিকে উদ্‌ঘোষিত হইতেছে। কান্যকুব্জলক্ষ্মী সংযুক্তার স্বয়ংবরোৎসবের কাহিনী প্রসিদ্ধ কবি চাঁদ বর্দ্দের রসময়ী কবিতায় গ্রথিত হইয়া, রসজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে আমোদিত করিতেছে।

সংযুক্তা কান্যকুব্জরাজ জয়চন্দ্রের দুহিতা। ১১৭০ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। সংযুক্তা তাৎকালিক মহিলাদিগের আদর্শস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার কেবল অনুপম সৌন্দর্য্য ছিল না; ঐ সৌন্দর্য্যের সহিত অসামান্য উদারতা ও মনস্বিতাও ছিল। মহারাজ জয়চন্দ্রের রাজধানীতে এই মহালক্ষ্মীর স্বয়ংবরের উদ্‌যোগ হইতে লাগিল। ভারতের বহু বলদৃপ্ত

ক্ষত্রিয়-রাজগণ এই অতুল্য ললনারত্ন লাভের জন্য কান্যকুব্জে সমাগত হইতে লাগিলেন।

আত্মবিগ্রহে ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আত্মবিগ্রহের সুযোগে বিদেশী মুসলমান ভারতবর্ষে আপনার আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। উপস্থিত সময়ে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ ও কান্যকুব্জরাজ জয়চন্দ্রের মধ্যে ঘোরতর বিদ্বেষভাব ছিল; উভয়ের মধ্যে যুদ্ধাদি হইত। এই আত্ম-বিগ্রহে শেষে দিল্লী ও কান্যকুব্জ উভয়েরই পতন হয়। উভয় জনপদই মহম্মদ গোরীর অধীনতা স্বীকার করে।

মহারাজ জয়চন্দ্র কান্যকুব্জলক্ষ্মী সংযুক্তার স্বয়ংবরের পূর্ব্বে রাজসূয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ক্ষত্রিয়ের রাজধানীতে ক্ষত্রিয় রাজগণের অভীষ্ট মহাযজ্ঞ সম্পাদনের আয়োজন হয়। আত্মবিগ্রহপ্রযুক্ত যজ্ঞস্থলে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ ও তদীয় পরমবন্ধু মিবারপতি সমরসিংহের আগমন হইল না। ইঁহারা উভয়েই জয়চন্দ্রের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিলেন; জয়চন্দ্র এজন্য অভিমানী হইয়া, পৃথ্বীরাজের ও সমরসিংহের দুইটি হিরণ্ময়ী প্রতি-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইলেন। এই প্রতিমূর্ত্তিদ্বয় দ্বাররক্ষক ও স্থালীপরিষ্কারের বেশে সজ্জিত হইয়া, সভামণ্ডপে স্থাপিত হইল। এদিকে রাজসূয়ের কার্য্য শেষ হইলে, সংযুক্তার স্বয়ম্বরের উদ্‌যোগ হইতে লাগিল। ভার-তের গুণগৌরবশ্রেষ্ঠ ভূপতিগণ একে একে কান্যকুব্জের স্বয়ংবর-সভা অলঙ্কৃত করিতে লাগিলেন। রাজগণের অধিবেশনের পর সংযুক্তা স্বয়ংবরোচিত বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া, হস্তে বরমাল্য লইয়া ধাত্রীর সহিত সভাগৃহে সমাগতা হইলেন।

যে গুণানুরাগ হৃদয়ে উদ্দীপিত হইয়া মানবী প্রকৃতিকে দেবভাবান্বিত করিয়া তুলে, তাহা কখনও সামান্য বাহ্য আবরণে নিবারিত হয় না। সংযুক্তা ইহার পূর্ব্বেই পৃথ্বীরাজের অসামান্য বীরত্বের বিবরণ শুনিয়া তৎপ্রতি আসক্তা হইয়াছিলেন। এখন পিতার শত্রুতায় সে আসক্তি

নিরাকৃত হইল না। তিনি সাহসের সহিত পৃথ্বীরাজকেই বরমাল্য দিতে ইচ্ছা করিলেন। সুশোভন সভামণ্ডপস্থ সুসজ্জিত রাজগণের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল না। সংযুক্তা সকলকে অতিক্রম করিয়া পৃথ্বীরাজের হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতির গলদেশে বরমাল্য সমর্পণ করিলেন। জয়চন্দ্র দুহিতার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব কার্য্যে ম্রিয়মাণ হইলেন। স্বয়ংবরস্থলীর রাজগণ তাদৃশ রূপগুণসম্পন্ন ললনারত্নলাভে হতাশ হইয়া, আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

অবিলম্বে সংযুক্তার মাল্যার্পণসংবাদ দিল্লীশ্বরের শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইল। সংবাদ পাওয়ামাত্র, তিনি সৈনিকদল লইয়া কান্যকুব্জে উপনীত হইয়া সংযুক্তাকে পিতৃভবন হইতে হরণ করিলেন। জয়চন্দ্র কন্যারত্নের উদ্ধারার্থে যথাশক্তি চেষ্টা করিলেন। কান্যকুব্জ হইতে দিল্লীতে যাইবার পথে, পাঁচদিন পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইল। শেষে পৃথ্বীরাজ জয়লাভ করিলেন। জয়চন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজয় স্বীকারপূর্ব্বক ক্ষুব্ধহৃদয়ে কান্যকুব্জে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইল *।

পৃথ্বীরাজ এ অসামান্য ললনারত্নের অধিকারী হইয়া, অনুক্ষণ তদ্গতচিত্তে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। সংযুক্তার অসামান্য গুণে স্বর্গসুখও তাঁহার নিকটে তুচ্ছ বোধ হইল। সংযুক্তা অল্প সময়ের মধ্যেই ভর্ত্তার প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠিলেন।

পৃথ্বীরাজ যখন এইরূপ সুখে কালযাপন করিতেছিলেন, সংযুক্তা যখন

---

* কেহ কেহ কহেন, জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজের স্বর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তিকে দ্বাররক্ষকের পদে স্থাপিত করাতে পৃথ্বীরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্যসামন্তসমভিব্যাহারে কান্যকুব্জে গমনপূর্ব্বক জয়চন্দ্রকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। এই সময়ে সংযুক্তা পৃথ্বীরাজকে দেখিয়া মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন। ইহার পর সংযুক্তা পিতৃ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিতা হইয়া উত্তর করেন, তিনি পৃথ্বীরাজকেই বিবাহ করিবেন। পৃথ্বীরাজ লোকপরম্পরায় এই সংবাদ শুনিয়া পুনর্ব্বার কান্যকুব্জে গিয়া, সংযুক্তাকে স্বকীয় রাজধানীতে আনয়ন করেন।

এইরূপ পতিসোহাগিনী হইয়া আহ্লাদসাগরে ভাসিতেছিলেন, তখন শাহাবদ্দীন গোরী ভারতবর্ষে উপস্থিত হইলেন। সংযুক্তা আসন্ন শত্রুর হস্ত হইতে মাতৃভূমি রক্ষা করিতে যত্নপর হইলেন। কিরূপে বিপক্ষ সৈন্য বিধ্বস্ত হইবে, কিরূপে বিপক্ষের আক্রমণ হইতে ভারতভূমি রক্ষা পাইবে, এই চিন্তাই তাঁহার হৃদয়কে আন্দোলিত করিতে লাগিল। তিনি ভর্ত্তাকে চতুরঙ্গ সেনাদলের অধিনায়ক হইয়া, শীঘ্রই রণক্ষেত্রে যাইতে অনুরোধ করিলেন। সংযুক্তার যত্ন কেবল ঐ অনুরোধমাত্রেই শেষ হইল না। তিনি সমস্ত যুদ্ধোপকরণ একত্র করিয়া, গম্ভীরস্বরে পৃথ্বীরাজকে কহিলেন,—"জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। আমরা আজ যে জীবনস্রোতে দেহ ভাসাইয়া পার্থিব সুখ উপভোগ করিতেছি, হয়ত কালই তাহা অনন্তকালসাগরে বিলীন হইতে পারে। ঈদৃশ ক্ষণভঙ্গুর দেহের মমতায় আকৃষ্ট হইয়া, চিরস্থায়িনী কীর্ত্তিতে জলাঞ্জলি দেওয়া বিধেয় নহে। যিনি মহৎ কার্য্য সাধন করিতে গিয়া, প্রাণ বিসর্জ্জন করেন, তিনি চিরকাল এই জগতে বর্ত্তমান থাকেন। আমি আশা করি, তুমি নিজের বিষয় না ভাবিয়া অমরতার দিকে মনোযোগী হইবে। তোমার করস্থিত শাণিত অসি শত্রুর দেহ দ্বিখণ্ড করুক, তোমার অধিষ্ঠিত তেজস্বী অশ্ব শত্রুর শোণিতস্রোতে সন্তরণ করুক, এই মহৎ কার্য্যে মৃত্যুকে ভয় করিও না, তোমার চতুরঙ্গ সৈনিকদল 'হর হর' ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করুক, রণস্থলের ভয়ঙ্কর ভাবে ভীত বা বিমুখ হইও না। সাহস, উদ্যম ও যত্নের সহিত স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা কর, আমি পরলোকে তোমার অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হইব।" বীরবালা, বীরজায়ার মুখ হইতে এইরূপ তেজোগর্ভ বাক্য নির্গত হইয়াছিল; এইরূপ তেজস্বিতা পৃথ্বীরাজের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল।

অবিলম্বে সৈনিকগণ সমবেত হইয়া, যুদ্ধে যাত্রা করিল। ভারতের

প্রায় সমগ্র ক্ষত্রিয়বীর এই মহাযুদ্ধে শরীর ও মন উৎসর্গ করিলেন। আর্য্যাবর্ত্তের রাজন্যকুলের "হর হর" ধ্বনিতে চারিদিক্ কম্পিত হইতে লাগিল। পৃথ্বীরাজ এই সেনার অধিনায়ক হইয়া শাহবদ্দীনকে সমরে আহ্বান করিলেন। উত্তর-ভারতের নারায়ণপুর গ্রামে (তিরৌরী ক্ষেত্রে) উভয় পক্ষে মহাসংগ্রাম হইল। বিপক্ষ সৈন্য ক্ষত্রিয় বীরগণের দুর্ব্বার পরাক্রমে ইতস্ততঃ পলাইতে লাগিল ; শত্রুর পতাকা, শত্রুর অস্ত্র পৃথ্বীরাজের হস্তগত হইল। শাহবদ্দীন গোরী পরাজিত হইয়া ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলেন। পৃথ্বীরাজ বিজয়ী হইয়া দিল্লীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

পরাজিত হইবার দুই বৎসর পরে শাহবদ্দীন আবার ভারতবর্ষে উপনীত হইলেন। এবারেও পৃথ্বীরাজ যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে সমরসংক্রান্ত সভা সংগঠিত হইল, নানা স্থান হইতে সৈনিকগণ সমবেত হইতে লাগিল, ক্ষত্রিয় রাজগণ একে একে আসিয়া অধিনায়কের সংখ্যা বাড়াইতে লাগিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই দিল্লীতে পুনর্ব্বার বিশাল সৈন্যসাগরের আবির্ভাব হইল।

মহাবীর সমরসিংহ এই সময়ে দিল্লীতে উপনীত হইয়া, যুদ্ধের প্রণালী সম্বন্ধে যে সকল মত ব্যক্ত করিলেন, পৃথ্বীরাজ তৎসমুদয় যত্নের সহিত লিখিয়া লইলেন। এদিকে, যুদ্ধযাত্রীর সকলেই স্ব স্ব পরিবার-বর্গের নিকটে বিদায় লইল। মাতা, দুহিতা, স্ত্রী সকলেই তাঁহাদিগকে রণে ভঙ্গ দেওয়া অপেক্ষা রণভূমিতে দেহত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া বিদায় দিল। সংযুক্তা ভর্ত্তাকে বীরবেশে সজ্জিত করিলেন, সাজাইতে সাজাইতে হঠাৎ তাঁহার হৃদয় অমঙ্গলের আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল ; হঠাৎ দক্ষিণ-নেত্র স্পন্দিত হইতে লাগিল ; সংযুক্তা অনিমেষলোচনে পৃথ্বীরাজের দিকে চাহিলেন, অতর্কিতভাবে কয়েকটি মুক্তাফল কপোল বহিয়া বক্ষোদেশে পতিত হইল। পৃথ্বীরাজ কালবিলম্ব না করিয়া

সৈনিকদলসহ নগর হইতে বহির্গত হইলেন। সংযুক্তা ভর্ত্তার গমনপথ নিরীক্ষণ করিতে করিতে দীর্ঘনিঃশ্বাসসহকারে কহিলেন,—"স্বর্গ ব্যতিরিক্ত বোধ হয় আর এই যোগিনীপুরে (দিল্লী) দয়িতের সহিত সম্মিলন হইবে না।

পৃথ্বীরাজ দৃশদ্বতীর তটে উপস্থিত হইলেন। চতুর মুসলমান নদীর অপর তট হইতে চাতুরীজাল বিস্তার করিলেন। হিন্দুগণ চতুরের চাতুরী বুঝিতে না পারিয়া উৎসবে মত্ত হইলেন। শাহবদ্দীন ঐ সুযোগে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। হিন্দুসৈন্য তাড়াতাড়ি অস্ত্র লইয়া সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। যতক্ষণ ক্ষত্রিয়শোণিতের শেষ বিন্দু ধমনিতে বর্ত্তমান ছিল, ততক্ষণ তাহারা শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিল। কিন্তু পরিশেষে তাহাদের দেহরক্ত ভারতভূমির ক্রোড়শায়ী হইতে লাগিল। তিন দিন ঘোরতর যুদ্ধের পর সমরসিংহ সমরক্ষেত্রে বীরশয্যায় শয়ন করিল। পৃথ্বীরাজ অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়া বন্দীভূত ও শেষে শত্রুর হস্তে নিহত হইলেন। ক্ষত্রিয়শোণিতসাগরে ভারতের সৌভাগ্য রবি ডুবিল; সংযুক্তার অমঙ্গল আশঙ্কা ফলে পরিণত হইল।

অবিলম্বে এই শোচনীয় সংবাদ দিল্লীতে পঁহুছিল। সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র সংযুক্তা চিতা সজ্জিত করিলেন। দেখিতে দেখিতে চিতানলের শিখা গগন স্পর্শ করিল। সংযুক্তা রত্নময় অলঙ্কাররাশি দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক রক্তবস্ত্র পরিধান ও রক্তপুষ্পমাল্য ধারণপূর্ব্বক ঐ অনলে প্রবেশ করিলেন। নিমিষমধ্যে তাঁহার লাবণ্যময় কমনীয় দেহ ভস্মরাশিতে পরিণত হইল।

পৃথ্বীরাজ সংযুক্তাকে ছাড়িয়া যত দিন রণভূমিতে ছিলেন, তত দিন কেবল জল সংযুক্তার জীবন-রক্ষার অবলম্বন ছিল। চাঁদ কবির গ্রন্থের একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে সংযুক্তার এই অসামান্য পাতিব্রত্যের বিবরণ বর্ণিত আছে। সংযুক্তা পতিব্রতার দৃষ্টান্তস্থল, স্বর্গস্থ দেবীসমাজে

সংযুক্তা।

বরণীয়া। পতিব্রতার শিরঃস্থানীয় সাবিত্রীর শ্রেণীতে তাঁহার নাম সমাবেশিত হইবার যোগ্য।

এক্ষণে প্রাচীন দিল্লীতে প্রবেশ করিলে, সংযুক্তাঘটিত অনেক চিহ্ন দৃষ্ট হয়। যে দুর্গ সংযুক্তার বিলাসক্ষেত্র ছিল, তাহার প্রাচীর আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে; যে প্রাসাদে সংযুক্তা পতিসোহাগিনী হইয়া অবস্থিতি করিতেন, তাহার স্তম্ভরাজি আজপর্য্যন্ত প্রাচীন দিল্লীর ভগ্নাবশেষ শোভিত করিয়াছে। কালের কঠোর আক্রমণে এক সময়ে ঐ ভগ্নাবশেষ মৃত্তিকাসাৎ হইবে, এক সময়ে ঐ ভগ্নাবশেষের ইষ্টকরাশি অন্য প্রাসাদের দেহ পরিপুষ্ট করিবে, কিন্তু উহার অধিষ্ঠাত্রী সংযুক্তা কখনও এই জগৎ হইতে অন্তরিত হইবে না। তাঁহার সরলতা, তাঁহার পাতিব্রাত্য, তাঁহার মহাপ্রাণতা, চিরকাল তাঁহাকে পবিত্র ইতিহাসে জাজ্বল্যমান রাখিবে।

রাজসিংহের রাজধর্ম্ম।

আওরঙ্গজেব দিল্লীর ময়ূরাসনে অধিরোহন করিয়াছেন। তাঁহার বৃদ্ধ পিতা কারারুদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার সহোদরগণ ঘাতকের হস্তে রাজ্যপ্রাপ্তির আশার সহিত আত্মপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। নিষ্ঠুর সম্রাট্ দয়াধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া, আত্মীয়স্বজনের শোণিতপাত করিয়া চিরভক্তিভাজন জনককে শোচনীয় অবস্থায় ফেলিয়া, সাম্রাজ্যসুখসম্ভোগ করিতেছেন। এই সময়ে দুই জন হিন্দুবীর সম্রাটের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েন। দক্ষিণাপথে মহারাষ্ট্ররাজ শিবাজী অপূর্ব্ব তেজস্বিতার সহিত হিন্দুর গৌরব রক্ষা করেন। আর্য্যাবর্ত্তে মিবারের অধিপতি রাজসিংহ লোকাতীত দৃঢ়তার সহিত প্রকৃত রাজধর্ম্মের পরিচয় দেন।

আওরঙ্গজেব বিশাল সাম্রাজ্য অধিকার করিয়া, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি ঘোরতর বিদ্বেষ দেখাইতে লাগিলেন। ধর্ম্মান্ধতার সহিত তাঁহার ভোগস্পৃহা বাড়িতে লাগিল। তিনি রূপনগরের অধিপতি বিক্রমশোলাঙ্কীর লাবণ্যবতী তনয়ার পাণিগ্রহণে উদ্যত হইলেন। রাজপুতবালাকে আনিবার জন্য অবিলম্বে রূপনগরে দুই হাজার অশ্বারোহী প্রেরিত হইল। কিন্তু তেজস্বিনী রাজপুতকুমারী ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না; বিধর্ম্মী মোগলের মহিষী হইয়া আপনার বংশের অবমাননা করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি ঘৃণা ও বিরাগের সহিত মোগলসম্রাটের দাম্ভিকতার সমুচিত পরিশোধ দিতে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার স্মৃতিতে রাণা রাজসিংহের অলোকসামান্য গুণগ্রাম বিরাজ করিতেছিল। রূপনগরের রাজবালা ঐ অলৌকিক-গুণসম্পন্ন পুরুষসিংহের অঙ্কলক্ষ্মী হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এখন মোগলের অবৈধ প্রস্তাব শুনিয়া, তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। ক্রোধে ও অভিমানে তেজস্বিনী রাজবালা রাণা রাজসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন,—"রাজহংসী সারসের সহচরী হইবে? যে রাজপুতকুমারীর দেহে পবিত্র শোণিত প্রবাহিত হইতেছে, সে বিধর্ম্মীকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিবে? যদি আমার সম্মান রক্ষা করা না হয়, যদি চিরপবিত্র আর্য্যগৌরব অক্ষুণ্ণ না থাকে, মোগলের কঠোর হস্ত যদি আমাদের চিরন্তন মর্য্যাদার বিলোপসাধনে উদ্যত হয়, তাহা হইলে আমাদের বংশের প্রাতঃস্মরণীয়া পদ্মিনী প্রভৃতি যে পথ অবলম্বন করিয়া, অন্তিমে অনন্তসুখের অধিকারিণী হইয়াছিলেন, আমিও অসঙ্কুচিতচিত্তে সেই পথ অবলম্বন করিব।" রূপনগরের পূজনীয় কুলপুরোহিত-রাণা রাজসিংহের নিকট যাইয়া, রাজপুতবালার এই কথা জানাইলেন। রাজসিংহ আপনাদের বংশ-মর্য্যাদার সম্মান রাখিতে উদাসীন হইলেন না। তিনি একদল সাহসী রাজপুত যোদ্ধা লইয়া আরাবলীর পাদদেশ অতিক্রম পূর্ব্বক রূপনগরে

উপনীত হইলেন। তাঁহার পরাক্রমে মোগল-সৈন্য পরাজিত হইল। তেজস্বী ক্ষত্রিয়বীর তেজস্বিনী ক্ষত্রিয়বালাকে উদ্ধার করিয়া, আপনার রাজধানীতে আসিলেন। প্রবলপ্রতাপ মোগলের বিপক্ষতাতেও রাজপুতের রাজধর্ম্মের সম্মানহানি হইল না।

এদিকে আওরঙ্গজেবের অপকর্ম্মের শান্তি হইল না। সম্রাট্‌ হিন্দুদিগকে অধিকতর নিগৃহীত করিবার জন্য "জিজিয়া" কর স্থাপন করিবার ইচ্ছা করিলেন। এই কর কেবল হিন্দুদিগকেই দিতে হইত। তাঁহার আদেশে আম্বেররাজ জয়সিংহ পরাক্রান্ত শিবাজীর প্রতাপ খর্ব্ব করিবার উদ্দেশে দক্ষিণাপথে অবস্থিতি করিতেছিলেন; মাড়বারের অধিপতি যশোবন্ত সিংহ রাজকীয় কার্য্যসাধনের জন্য কাবুলে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়েই মোগলরাজত্বের প্রধান অবলম্বনস্বরূপ ছিলেন। মোগলসম্রাট্‌ ইঁহাদের বিশ্বস্ততা এবং ইঁহাদের কার্য্যকুশলতার উপর নির্ভর করিয়াই অনেক সময়ে অনেক সঙ্কট হইতে রক্ষা পাইতেন। "জিজিয়া" করস্থাপনের সময়ে পাছে ইঁহারা ঘোরতর আপত্তি করিয়া অভীষ্ট বিষয়ে অন্তরায়স্বরূপ হয়েন, এই আশঙ্কায় আওরঙ্গজেব গোপনে বিষ-প্রয়োগ করিয়া, উভয়েরই প্রাণনাশ করিবার আদেশ পাঠাইলেন। আদেশ কার্য্যে পরিণত হইল। বিশ্বস্ত রাজপুতদ্বয় আপনাদের বিশ্বস্ততা দেখাইতে গিয়া, বিদেশে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। যশোবন্তের মহিষী আপনার শিশুপুত্র অজিত-সিংহকে লইয়া, কাবুল হইতে স্বদেশে প্রত্যাগত হইতেছিলেন; মোগল-সম্রাট্‌ তাঁহাদিগকে অবরোধ করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু তাঁহাদের রক্ষক পরাক্রান্ত দুর্গাদাস এই আদেশে অবনত-মস্তক হইলেন না। আড়াই শত মাত্র সাহসী রাজপুত একটি গিরিসঙ্কটে পাঁচ হাজার মোগল-সৈন্যকে আটক করিয়া রাখিল। এই অবসরে যশোবন্তের বনিতা নিরাপদ স্থানে উপনীত হইলেন। এদিকে

রাজসিংহ স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অগ্রসর হইয়া, অজিতসিংহ ও তাঁহার মাতাকে রক্ষা করিলেন। তাঁহার আদেশে ইঁহাদের আবাসস্থান নিরূপিত হইল, তাঁহার আদেশে মোগল-সম্রাটের আক্রমণ হইতে ইঁহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সাহসী রাজপুতগণ নিয়োজিত হইতে লাগিল। রাণা রাজসিংহ স্বয়ং ইঁহাদের প্রধান রক্ষক হইলেন। ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ রাজসিংহ আওরঙ্গজেবের কঠোর আদেশ উপেক্ষা করিয়া নির্ভীকচিত্তে অনাথ শিশু ও তদীয় অনাথা জননীর মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন।

আওরঙ্গজেবকে "জিজিয়া" কর-স্থাপনে উদ্যত দেখিয়া, রাণা রাজসিংহ মর্ম্মাহত হইলেন। ভারতভূমিতে চিরপ্রসিদ্ধ হিন্দুজাতির অবমাননা হইবে, আর্য্যগণ মুসলমান-হস্তে নিগৃহীত হইতে থাকিবে, ধর্ম্মান্ধ সম্রাট্ আপনার ধর্ম্মসম্প্রদায়কে বাদ দিয়া, অর্থের জন্যে কেবল হিন্দুদিগকেই নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, এ ক্ষোভ তাঁহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইল না। রাজধর্ম্মবিৎ রাজন্যশ্রেষ্ঠ নির্ভয়ে ঐ অনুচিত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার ধমনীতে শোণিতবেগ খরতর হইল; হৃদয়ে অপূর্ব্ব তেজস্বিতার বিকাশ হইল; ক্ষোভ, রোষ ও অপমান, মানসক্ষেত্রে একেবারে উদিত হইয়া তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত করিল। তিনি 'হিন্দুগণের অধিনায়কস্বরূপ হইয়া, হিন্দুজাতির সম্মানিত নামে আওরঙ্গজেবকে পত্র লিখিলেন ঃ— "

"সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরের মহিমা প্রশংসিত হউক। সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় গৌরবান্বিত আপনার বদান্যতা প্রশংসিত হইতে থাকুক। আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী আমি, যদিও এখন আপনার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন রহিয়াছি, তথাপি সমুচিত রাজভক্তির নিদর্শন দেখাইতে আমার কিছুমাত্র ত্রুটি নাই। এই হিন্দুস্থানের রাজা, রায় ও সামন্তগণের ইরাণ, তুরাণ, শাণ ও রুমের ভূপতিগণের, সপ্তঋতু জনপদের অধিপতিগণের এবং স্থলপথ ও

জলপথ যাত্রিগণের সর্ব্বাঙ্গীণ উপকার-সাধনে আমি সর্ব্বদা প্রস্তুত রহিয়াছি। এ বিষয়ে বোধ হয়, আপনার কোন সন্দেহ নাই। এইজন্যে আমি আমার পূর্ব্বকৃত কার্য্য স্মরণ এবং আপনার সৌজন্যের উপর নির্ভর করিয়া সাধারণের স্বার্থ-সংসৃষ্ট একটি গুরুতর বিষয় উত্থাপন করিতেছি। আমার আশা আছে, আপনি এ বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগী হইবেন।

"আমি অবগত হইয়াছি যে, আপনার এই শুভাকাঙ্ক্ষীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্যে আপনি বহু অর্থ অপব্যয় করিয়াছেন, এবং আপনার শূন্য ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিবার জন্যে একটি বিশেষ কর সংগ্রহ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

"আপনার স্বর্গীয় পূর্ব্বপুরুষ মহম্মদ জালালউদ্দীন অকবর সমদর্শিতা ও দৃঢ়তার সহিত বায়ান্ন বৎসরকাল এই সাম্রাজ্যের কার্য্যনির্ব্বাহ করিয়াছেন। তাঁহার রাজত্বে সকল জাতির লোকই সুখস্বচ্ছন্দে ছিল। ঈশা, মূসা বা মহম্মদের শিষ্যই হউক, ব্রাহ্মণ বা হিন্দুজাতির ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকই হউক, তিনি সকলের প্রতি অনুগ্রহ ও উদারভাব প্রদর্শন করিতেন। এইরূপ সমদর্শিতার জন্যে তাঁহার প্রজাগণ কৃতজ্ঞতার আবেশে তাঁহাকে জগদ্‌গুরু বলিয়া অভিহিত করিত।

"স্বর্গীয় নুরউদ্দীন জাহাঁগীর বাইশ বৎসর যথানিয়মে প্রজাপালন করিয়াছেন। মিত্ররাজগণের প্রতি বিশ্বাস থাকাতে তিনি সকল সময়ে সকল বিষয়েই কৃতকার্য্য হইতেন।

"মহিমান্বিত শাহজহাঁ বত্রিশ বৎসর শাসন-দণ্ডের পরিচালনা করিয়া, দয়া ও ধর্ম্মের গৌরবযুক্ত পুরস্কার—অক্ষয় সুখ্যাতির অধিকারী হইয়াছেন।

"আপনার পূর্ব্বপুরুষগণের লোকহিতকর কার্য্য এইরূপ। তাঁহারা এইরূপ মহৎ ও উদার নীতির বশবর্ত্তী হইয়া, যেখানে পদার্পণ করিতেন,

সেইখানেই বিজয়লক্ষ্মী ও সৌভাগ্যশ্রী তাঁহাদের অগ্রবর্ত্তিনী হইত। তাঁহারা অনেক দেশ ও অনেক দুর্গ আপনাদের অধীন করিয়াছেন, কিন্তু আপনার রাজত্বে অনেক জনপদ সাম্রাজ্য হইতে স্খলিত হইয়াছে। এখন অত্যাচার ও অবিচারস্রোত অপ্রতিহতবেগে প্রবাহিত হইতেছে; সুতরাং ভবিষ্যতে আরও অনেক স্থান ঐরূপে হস্তভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে। আপনার প্রজারা পদদলিত হইতেছে, আপনার সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশ দুঃখদারিদ্র্যে ভারাক্রান্ত হইয়াছে। যখন রাজ্যাধিপতি অর্থশূন্য হয়েন, তখন সম্ভ্রান্ত লোকের অবস্থা আর কি হইতে পারে? সৈনিকগণ বিভক্ত হইয়া উঠিয়াছে, বণিকেরা নানারূপ অভিযোগ করিতেছে, হিন্দুগণ নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে এবং জনসাধারণ রাত্রিকালের আহারের সংস্থান করিতে না পারিয়া, ক্রোধে ও নৈরাশ্যে উন্মত্ত হইয়া সমস্ত দিন শিরে করাঘাত করিতেছে।

"যে রাজ্যাধিপতি এইরূপ দরিদ্র জনসাধারণকে গুরুতর করভারে নিপীড়িত করিবার জন্যে আপনার ক্ষমতার বিনিয়োগ করেন, তাঁহার মহত্ত্ব কিরূপে রক্ষিত হইতে পারে? এই দুর্দ্দশার সময়ে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ঘোষিত হইতেছে যে, হিন্দুস্থানের সম্রাট্ হিন্দুধর্ম্মের উপর ঘোরতর বিদ্বেষী হইয়া, ব্রাহ্মণ ও যোগী, বৈরাগী ও সন্ন্যাসীদিগের নিকট হইতে করগ্রহণ করিবেন। সুপ্রসিদ্ধ তৈমুরবংশের গৌরবের প্রতি অনাদর দেখাইয়া, তিনি এইরূপে নির্জ্জনস্থানবাসী নিরপরাধ তপস্বীদিগের উপর আপনার ক্ষমতার বিস্তারে উদ্যত হইয়াছেন। আপনি যে কোন স্বর্গীয় গ্রন্থের উপর বিশ্বাস-স্থাপন করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, ঈশ্বর সমগ্র মানবজাতিরই ঈশ্বর, তিনি কেবল মুসলমানদিগের ঈশ্বর নহেন। হিন্দু ও মুসলমান, উভয়ই তাঁহার সমক্ষে তুল্য। বর্ণভেদ কেবল তাঁহার প্রবর্ত্তিত রীতিমাত্র। তিনিই সকলের অস্তিত্বের আদি কারণ। আপনাদের ধর্ম্মমন্দিরে তাঁহার নামেই স্তোত্র উচ্চারিত হয়। দেবালয়ে

ঘণ্টাধ্বনিকালে তিনিই সম্পূজিত হইয়া থাকেন। অপরাপর লোকের ধর্ম্ম ও আচারের অবমাননা করা, আর সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের ইচ্ছার বহির্ভূত কার্য্য করা উভয়ই সমান। যখন আমরা কোন চিত্র বিকৃত করি, তখন চিত্রকর স্বভাবতঃ আমাদের উপর জাতক্রোধ হইয়া থাকে। এই জন্যে কবি যথার্থই কহিয়াছেন যে, সবিশেষ না জানিয়া শুনিয়া, স্বর্গীয় শক্তির নানাবিধ কার্য্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া উচিত নহে।

"আপনি হিন্দুদিগের নিকটে যে কর চাহিতেছেন, তাহা ন্যায়-পরতার বহির্ভূত। উহা সাধু রাজনীতিরও অনুমোদিত নহে। উহাতে দেশ অধিকতর দরিদ্র হইবে। অধিকন্তু উহা হিন্দুস্থানের প্রচলিত নিয়মের একান্ত বিরোধী। কিন্তু যদি অপনার ধর্ম্মান্ধতা আপনাকে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত করে, তাহা হইলে ন্যায়পরতার নিয়মানুসারে হিন্দুদিগের প্রধান রাজসিংহের নিকটে অগ্রে ঐ কর প্রার্থনা করা উচিত। পরে আপনার এই শুভাকাঙ্ক্ষীকে কর দিতে আদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু পিপীলিকা ও মক্ষিকাদিগকে নিপীড়িত করা প্রকৃত বীরত্ব ও মহানু-ভবতার লক্ষণ নহে। আপনার অমাত্যগণ যে, ন্যায়পরতা ও সম্মানের সহিত শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত আপনাকে সদুপদেশ দিতে উদাসীন রহিয়াছেন, ইহাতে আমার নিরতিশয় বিস্ময় জন্মিতেছে।"

রাণা রাজসিংহের পত্রে এইরূপ সৌজন্য অথচ এইরূপ অভিমান ও এইরূপ সাহস পরিস্ফুট হইয়াছিল। ক্ষত্রিয় ভূপতি এইরূপ নম্রতা, এইরূপ তেজস্বিতা এবং এইরূপ স্পষ্টবাদিতার সহিত দিল্লীর সম্রাট্‌কে অপকর্ম্মে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। রাজনীতির উচ্চতায়, ভাবের গভীরতায়, উদারতার মহিমায় এবং প্রকৃত বীরত্বের উচ্ছ্বাসে ঐ পত্র পৃথিবীর যে কোন সভ্যদেশের রাজনীতিজ্ঞের নিকটে সমুচিত সম্মান পাইতে পারে। ঐ পত্রের প্রতি অক্ষরে হিন্দুর হিন্দুত্ব

পরিস্ফুট হইতেছে এবং হিন্দুরাজার প্রকৃত রাজধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

উক্ত পত্র এবং যশোবন্ত সিংহের স্ত্রীর বিমুক্তির সংবাদ পাইয়া মোগল-সম্রাট ক্রোধে অধীর হইলেন। ক্রোধের আবেগে তিনি রাণা রাজসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। এই জন্যে বঙ্গদেশ, কাবুল ও দক্ষিণাপথ হইতে তাঁহার পুত্রগণ রাজধানীতে আসিলেন। ইঁহাদের প্রতি এক এক দল সৈন্যের পরিচালনভার সমর্পিত হইল। আওরঙ্গজেব এইরূপে বহু সেনাপতি ও বহুসংখ্য সৈন্য লইয়া, মিবারের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে রাজসিংহও আপনাদের বংশের গৌরবরক্ষায় উদাসীন ছিলেন না। তিনি সৈনিক-দল তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগের অধ্যক্ষতা জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়-সিংহের উপর সমর্পণ করিলেন। ভীমসিংহ অন্য ভাগের অধিনায়ক হইলেন। রাণা স্বয়ং প্রধান ভাগের পরিচালনভার গ্রহণ করিয়া সম্রাটের গতিরোধার্থে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পার্ব্বত্য প্রদেশের আদিম অধিবাসিগণও আর্য্যাবর্ত্তের হিন্দুসূর্য্যের সাহায্যের নিমিত্ত মিবারের রক্তবর্ণ পতাকার আশ্রয়ে সজ্জিত হইল।

মিবারের অধিপতি এই সকল সাহসী সৈন্য ও আরাবলী পর্ব্বতের উপর নির্ভর করিয়া, মোগলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। রাজকুমার জয়সিংহের পরাক্রমে বিপক্ষের খাদ্য-সামগ্রী সংগ্রহের পথ নিরুদ্ধ হইল। আওরঙ্গজেব দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে অনাহারে কষ্টের একশেষ ভুগিতে লাগিলেন। তাঁহার শিবিরে নিদারুণ দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হইল। তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী রক্ষকগণে পরিবৃতা হইয়া, পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি রাজসিংহের নিকটে আনীত হইলেন। রাজসিংহ তাঁহার প্রতি সমুচিত আদর ও সম্মান প্রদর্শন করিলেন, এবং উপযুক্ত রক্ষক সঙ্গে দিয়া, আওরঙ্গজেবের

নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে তাঁহার আদেশে মোগলের খাদ্য-সামগ্রী আনয়নের পথ বিমুক্ত হইল। তিনি পরাক্রান্ত শত্রুরও অনাহার-কষ্ট দেখিতে পারিলেন না। রাজসিংহ বিধর্ম্মী বিপক্ষের খাদ্য-সামগ্রী-প্রাপ্তির সুযোগ করিয়া দিয়া তাঁহাকে উপস্থিত বিপদ্ হইতে রক্ষা করিলেন। রাজপুতবীরের হৃদয় এইরূপ উচ্চতর গুণে অলঙ্কৃত ছিল। এইরূপ উচ্চতর রাজধর্ম্মে রাজপুতবীর প্রাতঃস্মরণীয় আর্য্যগৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন।

কিন্তু মোগল উক্ত গুণ ও রাজধর্ম্মের সম্মান রাখিলেন না। তিনি রাণার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্ষত্রিয়বীর ইহাতে কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। তাঁহার সৈন্য সাহসসহকারে শত্রুর সম্মুখীন হইল। আওরঙ্গজেব বহু চেষ্টা করিয়াও, তেজস্বী রাজপুতগণের গতিরোধ করিতে পারিলেন না। তিনি যুদ্ধে পরাজয় স্বীকারপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। তাঁহার পতাকা, তাঁহার হস্তী, তাঁহার যুদ্ধাস্ত্র বিজয়ী রাজসিংহের হস্তগত হইল। ১৭৩৭ সংবতের ফাল্গুন মাসে এই মহাযুদ্ধ ঘটিয়াছিল। ১৭৩৭ সংবতে পুণ্যপুঞ্জময় রাজপুতভূমিতে রাণা রাজসিংহ বিজয়লক্ষ্মী কর্ত্তৃক সংবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। ১৭৩৭ সংবতের মধুর বসন্তকালের বাসন্ত উৎসবের মধ্যে মিবারের অধিপতি শত্রুর সম্মুখে অসামান্য সাহস ও শূরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

রাজসিংহ যুদ্ধে জয়ী হইয়া, পলায়িতদিগের অনিষ্টসাধনের চেষ্টা করেন নাই। ভীমসিংহ গুজরাট আক্রমণ করিয়া, সুরাতের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। এই স্থানে বহুসংখ্য লোক পলায়িতভাবে ছিল। রাজসিংহ উহাদিগকে নিপীড়িত করিতে ইচ্ছা করিলেন না। দয়া, ধর্ম্ম ও সৌজন্যের উপদেশ তাঁহার নিকটে উচ্চতর বোধ হইল। তিনি ভীমসিংহকে সুরাত আক্রমণ করিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। রাজসিংহ উদারতাগুণে এইরূপে রাজধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন।

সাহসে বীরত্বে ও অধিকৃত রাজ্য-রক্ষণে তিনি প্রশংসার অতীত, রাজধর্ম্মের মর্য্যাদা পালনে তিনি সমসাময়িক ইতিহাসে অদ্বিতীয়, দুরাচারের দৌরাত্ম্যদমনে তিনি হিতৈষিগণের অগ্রগণ্য। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যই তদীয় মহত্ত্ব ও মনস্বিতার পরিচয় দিতেছে। তিনি পরোপকারব্রতকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজসমুদ্রে * তদীয় শিল্পবিষয়িণী সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। আজ পর্য্যন্ত ঐ শিল্পকীর্ত্তি রাজপুতনার শোভা সম্পাদন করিতেছে।

* রাণা রাজসিংহের আধিপত্যকালে মিবারে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হয়। বহুসংখ্য প্রজা মৃত্যুমুখে পতিত হইতে থাকে। যাহাতে প্রজালোকে কোন কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে পারে, অথচ রাজ্যমধ্যে একটি প্রধান কীর্ত্তি স্থাপিত হয়, রাজসিংহের তাহাই উদ্দেশ্য হইয়া উঠে। এই উদ্দেশ্যে রাজসমুদ্রের প্রতিষ্ঠা হয়, রাজসমুদ্র একটি বৃহৎ সরোবর। উহা মিবারের ২৫ ক্রোশ উত্তরে এবং আরাবলী পর্ব্বতের পাদদেশের প্রায় ২ মাইল অন্তরে অবস্থিত। গোমতী নামে একটি বক্রগতি গিরিনদীর স্রোত একটি বিশাল বাঁধ দ্বারা নিরুদ্ধ করিয়া ঐ হ্রদ প্রস্তুত করা হয়। রাজসিংহ আপনার নামানুসারে উহার নাম 'রাজসমুদ্র' রাখেন। রাজসমুদ্রের উত্তরপশ্চিমে ও উত্তরপূর্ব্বে ব্যতীত সকল দিকেই উক্ত বিশাল বাঁধ বিস্তৃত রহিয়াছে। ঐ বাঁধ শ্বেত-মর্ম্মর-প্রস্তরে নির্ম্মিত। বাঁধের উপরিভাগ হইতে সরোবরগর্ভ পর্য্যন্ত শ্বেত-মর্ম্মর-প্রস্তরের সোপানাবলী সরোবরকে বেষ্টন করিয়াছে। সরোবর অতি গভীর। উহার পরিধি প্রায় ১২ মাইল। উক্ত বাঁধ একটি উচ্চ মৃৎপ্রাকারে পরিবেষ্টিত। রাণা সরোবরের দক্ষিণে একটি নগর ও দুর্গ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। নগর তাঁহার নামানুসারে 'রাজনগর' নামে অভিহিত হয়। বাঁধের উপরে মর্ম্মরপ্রস্তরের একটি সুন্দর দেবমন্দির প্রস্তুত হয়। এই কার্য্যে ৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল এবং ইহা শেষ হইতে ৭ বৎসর লাগিয়াছিল।

বীরযুবকের দেশভক্তি।

(মালদেব)

খ্রীঃ ১৫৪৩ অব্দ অতীত হইয়াছে। শের শাহের অমিতপরাক্রমে দিল্লীর সম্রাট্ হুমায়ুন দেশত্যাগী হইয়াছেন। যিনি এক সময়ে মণিমুক্তায় পরিশোভিত হইয়া দিল্লীর সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেন, তিনি ভিখারী হইয়া দেশান্তরে অবস্থিতি করিতেছেন। পরপ্রদত্ত সাহায্যে এখন তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইতেছে; আপনার জন্যে, প্রেম-প্রতিমা প্রণয়িনীর জন্যে, প্রাণাধিক তনয়ের জন্যে তিনি সর্ব্বাংশে পরের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। সমগ্র ভারতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর অকবরের পিতা এক সময়ে এইরূপ দুরবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন। আর যিনি ক্ষমতাবলে কাবুলের পার্ব্বত্য প্রদেশে, আর্য্যাবর্ত্তের পবিত্র ভূমিতে, দক্ষিণাপথের প্রশস্ত ক্ষেত্রে বিজয়পতাকা স্থাপন করিয়াছিলেন, তিনি বিস্তীর্ণ ভারতমরুর একটি ক্ষুদ্র জনপদের সামান্য গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া, পরকীয় সাহায্যে সামান্যভাবে কালাতিপাত করিতেছিলেন।

শের সাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। দিল্লীর অর্দ্ধচন্দ্র-চিহ্নিত পতাকা এখন মোগলবংশের পরিবর্ত্তে শূরবংশের গৌরব প্রকাশ করিতেছে। আমীর, ওমরাহগণ এখন মোগলবংশধরের পরিবর্ত্তে শূরবংশের আদেশ পালন জন্য ব্যস্ত রহিয়াছেন। শের শাহ বীরত্বে ও তেজস্বিতায় হুমায়ুনকে দেশ হইতে নিষ্কাশিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভারতের সকল স্থানে আধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, তিনি রাজ্যবৃদ্ধির সঙ্কল্প করিলেন। বীরভূমি রাজপুতনা তাঁহার লক্ষ্য হইল। শের শাহ আশী হাজার সৈন্য লইয়া মাড়বার আক্রমণ করিলেন।

মাড়বার প্রকৃতির কমনীয় শোভায় অলঙ্কৃত নহে। মনোহর

বৃক্ষলতা বা শস্যসমাকীর্ণ শ্যামল ভূখণ্ডে উহার সৌন্দর্য্য পরিবর্দ্ধিত হয় নাই। বিস্তীর্ণ বালুকাসমুদ্র নিরন্তর মাড়বারের ভীষণতার পরিচয় দিতেছে। মাড়বার প্রকৃতির মনোহারিণী শোভার পরিবর্ত্তে ভয়ঙ্কর-ভাবের অপূর্ব্ব বিকাশক্ষেত্র হইয়া রহিয়াছে। উপস্থিত সময়ে পরাক্রান্ত রাঠোরগণ অলোকসামান্য বীরত্বের মহিমায় এই মরুস্থলীর স্বাধীনতার গৌরব রক্ষা করিতেছিলেন। শের শাহ এই গৌরবহরণে উদ্যত হইলেন। আশী হাজার সৈনিক পুরুষ বিপুলবিক্রমে মাড়বারের অভিমুখে আসিতে লাগিল। সংবাদ মরুস্থলীতে প্রচারিত হইল। রাঠোরগণ গরীয়সী জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্যে সজ্জিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বহুসংখ্য সৈন্য সমবেত হইল। দেখিতে দেখিতে মরুস্থলীর অধিপতি মহারাজ মালদেব পঞ্চাশ হাজার তেজস্বী রাঠোরের বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া দিল্লীর অভিনব সম্রাটের গতিরোধার্থে দণ্ডায়মান হইলেন।

বীরভূমির বীরত্বের গৌরব অক্ষত রহিল। পঞ্চাশ হাজার রাঠোরের পরাক্রমে দিল্লীর আশী হাজার সৈন্যের গতিরোধ হইল। হুমায়ুনের বিজেতা মরুস্থলীর বীরগণের বীরত্বের নিকটে মস্তক অবনত করিলেন। মালদেবের ব্যূহভেদ করা অসাধ্য দেখিয়া, শের শাহ প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার উপায় দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু রাঠোর সৈন্যের বিক্রমে তাহাও ব্যর্থ হইল। শের শাহ আপনার নামে একখানি পত্র লিখিলেন। সবিশেষ কৌশলের সহিত ঐ পত্রে মালদেবের প্রধান প্রধান সর্দ্দারগণের নাম জাল করা হইল; যেন সর্দ্দারগণ শের শাহকে লিখিতেছেন যে, তাঁহারা মালদেবের উপর সাতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। যুদ্ধের সময় সকলেই আপন আপন সৈনিকদল লইয়া দিল্লীর সৈন্যের সহিত সম্মিলিত হইবেন। শের শাহের কৌশলে পত্র মালদেবের হস্তগত হইল। পত্র পাইয়া, মালদেব স্তম্ভিত ও

হতবুদ্ধি হইলেন, আপনার সর্দ্দারদিগকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। চতুরের চাতুরী ফলবতী হইল। মালদেব সর্দ্দারগণের সহিত বিচ্ছিন্ন হইবার উদ্‌যোগ করিলেন। এই আকস্মিক ব্যাপারে তেজস্বী রাঠোরসর্দ্দার কুম্ভের হৃদয়ে আঘাত লাগিল। কুম্ভ মালদেবকে অনেক বুঝাইলেন, সনাতন ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া আপনাদের বিশ্বস্ততা সপ্রমাণ করিতে লাগিলেন, দুরন্ত শত্রুর চাতুরীর কথা কহিয়া, পবিত্র ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম রক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মালদেব কিছুই শুনিলেন না, কিছুই বুঝিলেন না। তাঁহার হৃদয় ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, কুম্ভের চেষ্টায় উহা আর আলোকিত হইল না। কুম্ভ নীরব হইলেন। তাঁহার ভ্রূযুগল আকুঞ্চিত হইল। জ্যোতির্ম্ময় নেত্রদ্বয় হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল। তেজস্বী ক্ষত্রিয়বীর মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিলেন, এবং মুহূর্ত্তকালমধ্যে আপনার সৈনিকদল লইয়া, 'হর হর' রবে বিপক্ষের অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

তুমুল সংগ্রাম ঘটিল। কুম্ভ দশ হাজার মাত্র সৈন্য লইয়া অমিতপরাক্রমে শের শাহের আশী হাজার সৈন্যের উপর পতিত হইলেন। তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়ে কিছুমাত্র ভয়ের বিকাশ নাই। উজ্জ্বল মুখমণ্ডলে কিছুমাত্র কালিমার সঞ্চার নাই। পরাক্রান্ত বিপক্ষ তাঁহাদের পবিত্র চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিয়াছে, পবিত্র বীরধর্ম্মের অবমাননা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কুম্ভ অরাতির শোণিতে সেই কলঙ্করেখা মুছিয়া ফেলিতে উদ্যত, সমরক্ষেত্রে আত্মপ্রাণের উৎসর্গ করিয়া, অনন্তমহিমাময় বীরত্বকীর্ত্তি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তুমুল সংগ্রামে কুম্ভ লোকাতীত তেজস্বীতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। বিপক্ষগণ এ তেজস্বিতার গতিরোধ করিতে পারিল না। তাহাদের অনেকে সমরক্ষেত্রে চিরনিদ্রিত হইতে লাগিল। অনেকে শত্রুর আক্রমণ

হইতে প্রাণরক্ষার জন্য ব্যস্ত হইল। শের শাহ হতাশ হইলেন, চারিদিক্ অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। রাঠোরগণের পরাক্রমে তাঁহার অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হইল। ইহার মধ্যে আর একদল সৈন্য তাঁহার সাহায্যার্থে আসিল। কুম্ভ অবিশ্রান্তভাবে শত্রুসেনা বিধ্বস্ত করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, এমন সময়ে অভিনব সৈনিকদল তাঁহাকে আক্রমণ করিল। পরাক্রান্ত রাঠোরবীর ঐ আক্রমণ নিরস্ত করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু রণে ভঙ্গ দিয়া ভীরুতার পরিচয় দিলেন না। তিনি আপনাদের বিশ্বস্ততা দেখাইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, এখন তুচ্ছ প্রাণের মমতায় এ প্রতিজ্ঞা হইতে স্খলিত হইলেন না। মরুস্থলীর পুণ্যক্ষেত্রে—শত্রুর ভৈরব কোলাহলমধ্যে তেজস্বী বীরের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল। কুম্ভ অকাতর-ভাবে যুদ্ধ করিতে করিতে অনন্তধামে গিয়া, অনন্ত কীর্ত্তির অধিকারী হইলেন। তাঁহার রাঠোরসেনা সম্মুখ-সমরে অরাতি নাশপূর্ব্বক নশ্বর জগতে অমরত্ব লাভ করিল। আর্য্যকীর্ত্তির মহিমায় আর্য্যাবর্ত্তের মরুস্থলী চিরপবিত্র হইয়া রহিল।

রাঠোরের বীরত্বে শের শাহ চমকিত হইয়াছিলেন। যুদ্ধাবসানে তিনি মাড়বারের অনুর্ব্বরতা লক্ষ্য করিয়া, ভীতিব্যঞ্জকস্বরে কহিয়াছিলেন,—"আমি এক মুষ্টি ভুট্টার জন্যে এখনই ভারত-সাম্রাজ্য হারাইতেছিলাম।"

সোমনাথ।

ভারতের ইতিহাসে সোমনাথ চির-প্রসিদ্ধ। ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুর নিকটে সোমনাথ চিরপবিত্র। সোমনাথের মন্দির প্রকৃতির অতি রমণীয় প্রদেশে অবস্থিত। গুজরাটের পশ্চিমপ্রান্তে ঐ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। সম্মুখে বিশাল সমুদ্র সর্ব্বদা বিশালভাবে পরিপূর্ণ হইয়া, ভৈরবরবে উপকূলভূমি বিধৌত করিতেছে, যতদূরে দৃষ্টিপাত করা যায়, ততদূরই কেবল নীল বারিরাশি; ফেনিল বারিধি ক্রমে গাঢ় নীল হইয়া, অনন্ত নীলাকাশের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। উপরে অনন্ত নীলাকাশ, নিম্নভাগে অনন্ত নীল সমুদ্র, মধ্যভাগে দেবাদিদেব সোমনাথের পবিত্র মন্দির। হিন্দুর আরাধ্য দেবতা এইরূপ রমণীয় স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। প্রকৃতির এইরূপ গম্ভীরভাবের মধ্যে শান্তিময় মন্দিরের সৌন্দর্য্যে উপাসকদিগের হৃদয় শান্তিরসে পরিপূর্ণ হইত।

প্রাচীন সময়ে ভারতবর্ষে শিবমন্দিরসমূহ যে ভাবে নির্ম্মিত হইত, সোমনাথের মন্দিরও সেই ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দিরের পরিধি ৩৩৬ ফীট, দৈর্ঘ্য ১১৭ ফীট এবং বিস্তার ৭৪ ফীট। ইউরোপখণ্ডের মন্দিরের তুলনায় ভারতের এই দেবমন্দিরটি অবশ্য ক্ষুদ্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। হিন্দু উপাসকগণ জনতাপ্রিয় ছিলেন না; লোকারণ্যের মধ্যে তাঁহারা শান্তভাবে শান্তিময় আরাধ্য দেবতার উপাসনা করিতে ভালবাসিতেন না। নির্জ্জনস্থানে নীরবে, তদগতচিত্তে বরণীয় দেবের ধ্যান করাই তাঁহারা পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং তাঁহাদের উপাস্য দেবের মন্দির তদনুরূপ ভাবেই সংগঠিত হইত। যাঁহারা ইউরোপের উপসনাগৃহ দেখিয়াছেন, তাঁহারা সোমনাথের মন্দির দেখিয়া, হিন্দুদিগের ঐ আভ্যন্তরীণ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে অবশ্য সমর্থ হইবেন। মন্দিরটি কঙ্করপ্রস্তরে নির্ম্মিত ও চারিখণ্ডে

বিভক্ত। প্রত্যেক খণ্ডে বিবিধ কারুকার্য্যখচিত এক একটি সুন্দর মণ্ডপ ছিল। মণ্ডপগুলির ভগ্নাবশেষ এখন আক্রমণকারীদিগের কঠোর ভাবের পরিচয় দিতেছে। মন্দিরের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকার মূর্ত্তি খোদিত থাকাতে উহা বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয়াছিল। এক অংশে কতকগুলি শ্রেণীবদ্ধ প্রকাণ্ড হস্তীর মস্তক ছিল। উহার নাম গজগৃহ। অপর অংশে বিভিন্ন বেশে সজ্জিত, বিভিন্নভাবে স্থাপিত কতকগুলি অশ্ব রহিয়াছিল, উহার নাম অশ্বশালা। অন্য অন্য অংশে মণ্ডলীবদ্ধ সুরসুন্দরীগণের নৃত্যাভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছিল, উহার নাম রাসমণ্ডপ। খোদিত মূর্ত্তিগুলি সুগঠিত ও বৃহদাকার। কিন্তু আক্রমণকারীদিগের কঠোরতায় সকলগুলিই শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে। রাসমণ্ডপের সুরসুন্দরী-গণের বিচ্ছিন্ন হস্ত, পদ ও মস্তক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকিয়া, কাণ্ড-জ্ঞানশূন্য মুসলমান আক্রমণকারীর লৌহদণ্ডের ভীষণ ভাবের পরিচয় দিতেছে।

মধ্যভাগের মণ্ডপটি ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয় নাই। ঐ মণ্ডপের গুম্বজ আটটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত। অনেকে অনুমান করেন, মুসলমানেরা হিন্দুদিগের উপকরণ লইয়া, ঐ অংশ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ফলতঃ ঐ অংশে মুসলমান কৃত শিল্পকার্য্যের অনেক চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরের যে অংশে সোমনাথের পবিত্র লিঙ্গমূর্ত্তি ছিল, তাহা এখন ভগ্ন-দশায় পতিত রহিয়াছে। সে বিচিত্র কারুকার্য্য নাই, কেবল ভগ্ন প্রস্তর-স্তূপ পরিবর্ত্তনশীল কালের অসীম শক্তির পরিচয় দিতেছে। মন্দিরের এক স্থানে একটি অন্ধকারময় ক্ষুদ্র গৃহ আছে। গৃহটি ২৩ ফীট দীর্ঘ ও ২০ ফীট প্রশস্ত। পুরোহিতগণের নির্জ্জন ধ্যান-ধারণার জন্যেই বোধ হয় উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

একটি বৃহৎ চতুষ্কোণ উচ্চখণ্ডে সোমনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। উহার চারিদিক্ অত্যুচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। পবিত্র মন্দিরে

বহুসংখ্য প্রস্তরময়ী দেবমূর্ত্তি বিভিন্নভাবে স্থাপিত ছিল। আক্রমণকারী-দিগের অত্যাচার সহিতে না পারিয়া ঐ মূর্ত্তিগুলি সর্ব্বংসহা বসুন্ধরার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। কতকগুলি আবার নশ্বর মানবের অস্থায়ী প্রাসাদ বা মন্দিরের শোভাবর্দ্ধন জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইয়াছে।

এখন সোমনাথের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিলে, দর্শকের হৃদয় নানারূপ চিন্তাপ্রবাহে আন্দোলিত হইতে থাকে। আর্য্যভূমির সৌভাগ্যের সময়ে উহার যে শোভা ও যে গৌরব ছিল, এখন তাহা নাই। পুণ্যশীলা অহল্যাবাইর যত্নে এই স্থানে একটি দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সোমনাথের উপাসকদিগের সন্তানগণ এই দেবালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সে বিলুপ্তগৌরব আর ফিরিয়া আইসে নাই। হিন্দুগণ আপনাদের দেবতার গৌরবরক্ষার জন্য অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পাঁচমাস পর্য্যন্ত মন্দির রক্ষা করেন; পাঁচমাস পর্য্যন্ত মুসলমানেরা হিন্দুদিগের পরাক্রমে নিরস্ত থাকেন। শেষে চতুর সুলতান মহমুদ আপনার সৈনিকদল ফিরাইয়া পাঁচক্রোশ দূরে গিয়া, শিবির স্থাপন করেন। হিন্দুগণ দেখিলেন, প্রবল আক্রমণকারী সৈন্য সহ প্রস্থান করিয়াছে, তাঁহাদের মন্দিরের পবিত্রতা অক্ষত রহিয়াছে, সুতরাং তাঁহারা প্রফুল্ল-চিত্তে আমোদ করিতে লাগিলেন। সুলতান মহমুদ এই সুযোগে, একদা রাত্রিশেষে জাফর ও মজফর এই দুই ভ্রাতার অধীনে একদল সাহসী সৈন্য মন্দির আক্রমণ করিতে পাঠাইয়া দিলেন। মুসলমান ভ্রাতৃদ্বয় অলক্ষিতভাবে দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। বৃহৎকায় হস্তীর পরাক্রমে দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। ইহার মধ্যে সুলতান মহমুদও অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া বিপুলবিক্রমে হিন্দুদিগকে আক্রমণ করিলেন। অতর্কিত-ভাবে আক্রান্ত হইলেও রাজপুতবীরগণ মুহূর্ত্তমধ্যে অস্ত্রগ্রহণ করিয়া

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। শোণিত-তরঙ্গিণী অবিচ্ছেদে প্রবাহিত হইল। ক্ষত্রিয়গণ আরাধ্য দেবতার জন্যে আত্মপ্রাণের উৎসর্গ করিতে লাগিলেন। অবশেষে সাতশত বীরপুরুষ অসি হস্তে লইয়া মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের এই শেষ উদ্যমও বিফল হইল। ভয়াবহ শোণিত-প্রবাহের মধ্যে আর্য্য-বীরপুরুষগণের দেহরত্নের সহিত আর্য্যকীর্ত্তির গৌরব বিনষ্ট হইল।

বর্ষীয়সী বীরাঙ্গনা।

(রাজবাই)

ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তস্থিত গুজরাত প্রদেশে উদয়ন নামে একটি জনপদ আছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজবাই নামে একটি তেজস্বিনী মহিলা এই জনপদ শাসন করিতেন। রাজবাই রাজ্যশাসনোচিত সমস্তগুণে অলঙ্কৃতা ছিলেন। তাঁহার যেরূপ তেজস্বিতা, সেইরূপ দৃঢ়তা ও শাসনক্ষমতা ছিল। তিনি কোমলতায় অঙ্গনাহৃদয়ের অধিকারিণী হইয়াও কঠোরতায় ও কষ্টসহিষ্ণুতায় তেজস্বী পুরুষের শিক্ষাস্থল ছিলেন; ধনসম্পত্তির অধীশ্বরী হইয়াও বিলাস-সুখে উপেক্ষা করিয়া, অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন। অবলানামে অভিহিতা হইয়াও, আত্মবলের পরিচয় দিয়া জনসাধারণকে বিস্মিত করিয়া তুলিতেন। সে সময়ে জনশ্রুতি তাঁহাকে অনেক অপরাধে জড়িত করিয়াছিল। তিনি স্বামী, পুত্র প্রভৃতি কাহারও নাকি প্রিয়পাত্রী ছিলেন না। যে হেতু, রাজ্যশাসন সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রস্তাব তাঁহার মনোমত ছিল না। তিনি সকলের সমক্ষেই আত্মপ্রাধান্যপ্রিয়তার পরিচয় দিতেন;

আবশ্যক হইলে, তরবারি নিষ্কোষিত করিতেও সঙ্কুচিতা হইতেন না। এইরূপ আরও অনেক কাহিনী লোকমুখে শুনা যাইত; কিন্তু এ সকল জনশ্রুতির সত্যতা সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। রাজবাই রাজ্যশাসনের সম্পূর্ণ উপযুক্তপাত্রী ছিলেন। তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত করিয়া, রাজ্যের অনিষ্টসাধনে উদ্যত হইতেন না। তাঁহার রাজ্য সুশাসিত, সুশৃঙ্খল ও সমৃদ্ধ বলিয়া গৌরবান্বিত ছিল। ব্রিটিশ রাজপুরুষও উদয়নের শাসনশৃঙ্খলার জন্যে রাজবাইর রাজ্যশাসনক্ষমতার যথোচিত প্রশংসা করিয়াছিলেন।

ক্রমে রাজবাই বার্দ্ধক্যদশায় উপনীত হইলেন। তাঁহার বয়স সপ্ততি বৎসর হইল। তিনি জরাগ্রস্তা হইয়া, পুণ্যসঞ্চয়ের বাসনায় পবিত্র তীর্থদর্শনে উদ্যতা হইলেন। অবিলম্বে তীর্থযাত্রার আয়োজন হইল। রাজবাই তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পৌত্রকে রাজ্যাধিকারী করিয়াছিলেন। এখন তীর্থযাত্রার সময়ে তিনি একটি আত্মীয়কে রাজ্যরক্ষার ভার দিয়া গেলেন। ক্রমে অনেক দিন অতীত হইল, উদয়ন রাজবাইর নিয়োজিতা রক্ষয়িত্রীকর্ত্তৃক অনেকদিন শাসিত হইতে লাগিল। ক্রমে রক্ষয়িত্রীর সেই রাজ্যের লোভ জন্মিল, তিনি রাজবাইকে আর রাজ্য না দিয়া, আপনি উহা অধিকারে রাখিতে ইচ্ছা করিলেন।

অনেকদিন পরে রাজবাই অনুচরগণ-সহ তীর্থস্থান হইতে প্রত্যাগত হইলেন। কিন্তু নগর-রক্ষক সৈনিকগণ রক্ষয়িত্রীর আদেশে তাঁহাকে নগরে প্রবেশ করিতে দিল না। নগরপ্রবেশের সমস্ত দ্বার অবরুদ্ধ হইল। রাজবাই নগরে প্রবেশ করিতে চাহিলেন। রক্ষয়িত্রী কহিলেন, এখন তিনি জরাগ্রস্তা হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী হইতেছে, এ সময়ে সংসার হইতে অবসৃত হইয়া ধর্ম্মচিন্তায় মনোযোগ দেওয়াই তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য। এ কথা তেজস্বিনী রাজবাইর মনোমত হইল না। তিনি স্বকীয় বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া, রাজ্যের উদ্ধার-সাধনে

উদ্যতা হইলেন। বার্দ্ধক্যে তাঁহার চর্ম্ম শিথিল হইয়াছিল, যৌবনের অপূর্ব্ব প্রভা বৃন্তচ্যুত পরিম্লান কুসুমের ন্যায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এ সময়েও তাঁহার অতুল্য তেজস্বিতা ও দৃঢ়তা অন্তর্হিত হয় নাই। রাজবাই সৈনিকদল সংগ্রহ করিলেন। ক্রমে এক হাজার সৈনিক পুরুষ একত্র হইয়া, তাঁহার যে কোন আদেশপালনে প্রতিশ্রুত হইল। রাজবাই যুদ্ধবেশে সজ্জিতা হইলেন। সুকঠিন বর্ম্ম তাঁহার অঙ্গচ্ছন্ন হইল। সুতীক্ষ্ণ তরবারি তাঁহার হস্তে শোভা পাইতে লাগিল। সপ্ততিবর্ষীয়া বর্ষীয়সী অশ্বপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিতা হইয়া সৈনিক দলসহ উদয়নের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রাজবাই এইরূপ যুদ্ধবেশে নগরদ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু নগররক্ষক সৈনিকেরা এবারেও তাঁহার আদেশ পালন করিল না। তাহারা গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল। গুলির আঘাতে রাজবাইর একজন প্রধান অধিনায়ক দেহত্যাগ করিলেন; কিন্তু রাজবাই নিরস্তা হইলেন না। বিপক্ষগণ তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া, গুলির পর গুলি চালাইতেছিল; গুলির আঘাতে তাঁহার একজন সেনানায়ক তাঁহার পার্শ্বেই ভূপতিত হইয়াছিলেন। বর্ষীয়সী বীরাঙ্গনা ইহা দেখিয়াও তেজস্বিতায় বিসর্জ্জন দিলেন না। তাঁহার সাহস বর্দ্ধিত হইল। যৌবনের সেই অতুল্য পরাক্রম পুনর্ব্বার যেন ফিরিয়া আসিল। তেজস্বিতা যেন নবীনতর হইয়া, তাঁহার শিথিল অঙ্গযষ্টিকে অপূর্ব্ব বলসম্পন্ন করিল। রাজবাই অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়া, নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে করিয়া, সৈনিক পুরুষদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। নগররক্ষকেরা এই বর্ষীয়সীর পরাক্রম দর্শনে স্তম্ভিত হইল। তাহারা আর কোনরূপ বাধা দিতে সাহসী না হইয়া, দ্বার খুলিয়া দিল। রাজবাই নগরে প্রবেশ করিলেন। তদীয় অসামান্য তেজস্বিতায় মুহূর্ত্তমধ্যে সমগ্র উদয়ন তাঁহার পদানত হইল। বলা বাহুল্য, তাঁহার নিয়োজিতা রক্ষয়িত্রী পলায়ন করিলেন। রাজবাই

পুনর্ব্বার উদয়নের অধীশ্বরী হইয়া, অপ্রতিহত-প্রভাবে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ভারতের সপ্ততিবর্ষীয়া বীররমণীর পরাক্রম পরিস্ফুট হইয়াছিল। মানুষ যে বয়সে চলৎ-শক্তিশূন্য হয়, সেই বয়সে বীররমণী অতুল্য পরাক্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রনষ্ট রাজ্যের উদ্ধার করিয়াছিলেন। চিরস্মরণীয় সিপাহীযুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত রাজবাই ত্রিশবৎসরকাল, সমান বিক্রম ও সমান দক্ষতার সহিত রাজ্য শাসন করেন। ব্রিটিশ্ রাজপুরুষেরাও কখন তাঁহার তেজস্বিতা ও দৃঢ়তার অবমাননা করেন না।

রাজভক্তির একশেষ।

(অমরসিংহ)

খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দী ধীরে ধীরে অনন্ত সময়ের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে অতীতের গর্ভশায়ী হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দী তাহার স্থান অধিকার করিয়া চারিদিকে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। তাহার পরাক্রমে অনেকের অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। অনেকে উন্নতিসোপানে পদবিক্ষেপ করিয়া, আমোদের তরঙ্গে ছুলিতে ছুলিতে গর্ব্ববিস্ফারিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। অনেকে আবার অবনতিতে পড়িয়া শোকের ও অনুতাপের তীব্রকশাঘাতে জর্জ্জরিত হইতেছে। অনেকে সুখের ও সম্পদের অপূর্ব্ব বিভ্রমে পরিতৃপ্ত হইতেছে। অনেকে দুঃখের দারুণ আবর্ত্তে পড়িয়া, হতাশহৃদয়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কালের পরিবর্ত্তনে ভারতভূমিরও অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ভারতের আর্য্যগৌরব, পুণ্যসলিলা দৃশদ্বতীর তীরে আর্য্যচক্রবর্ত্তী পৃথ্বীরাজের সহিত অন্তর্দ্ধান

করিয়াছে। ভারতে মুসলমানের ক্ষমতা আওরঙ্গজেবের সহিত বিলুপ্ত হইয়াছে। সে তাজমহল বিরাজমান রহিয়াছে, সে জুম্মা মস্জিদ্, মতি মস্জিদ্, প্রভৃতি শিল্পীর অপূর্ব্ব শিল্পচাতুর্য্য বিকাশ করিয়া দিতেছে, সে দেওয়ানি আম ও দেওয়ানি খাস মোগলের বিলুপ্ত ক্ষমতার স্বাক্ষীস্বরূপ রহিয়াছে। ইংরেজ এখন অসাধারণ বিক্রমের আবেশে ভারতের নানাস্থানে ক্ষমতা বিস্তার করিতেছেন। মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্লি (লর্ড মর্ণিংটন্) ভারতের গবর্ণর জেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, চন্দ্রগুপ্ত বা শালেমেন, নেপোলিয়ন বা পিতরের ক্ষমতা ও তেজোমহিমার সহিত স্পর্দ্ধা করিতেছেন। ভবানীভক্ত, প্রাতঃস্মরণীয় শিবাজী যে বীরসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, যে সম্প্রদায়ের মহাবীরগণ এক সময়ে সমগ্র ভারত আপনাদের পদানত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাঁহারা এখন নানাদলে বিভক্ত হইয়া পরস্পরের বলক্ষয়পূর্ব্বক ইংরেজের প্রতিকুলে দণ্ডায়মান হইয়াছেন।

দরায়ুসের দুহিতা সুন্দরী না হইলে, সেকন্দর শাহের ধর্ম্ম ইতিহাসের বরণীয় হইত না। পলাশীর আম্রকাননে ভারতবাসীর ক্ষমতায় ইংরেজের জয়লাভ হইয়াছে, আসাইর প্রশস্ত ক্ষেত্রে ভারতবাসী ইংরেজের হস্তে বিজয়শ্রী আনিয়া দিয়াছে; বর্ণনীয় সমরে একজন ভারতীয় বীরের অসামান্য বিক্রমে ইংরেজ মহারাষ্ট্রচক্রের পরাক্রান্ত ভূপতি মহাবীর যশোবন্ত রাও হোলকারের গতিরোধে উদ্যত হইয়াছেন।

খ্রীঃ ১৮০০ অব্দে মহারাষ্ট্রচক্রে পাঁচ জন মহারাষ্ট্রীয় ভূপতি ছিলেন। ইঁহাদের রাজধানী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ছিল। পশ্চিমঘাটের পার্ব্বত্যপ্রদেশে পুনায় পেশবা আধিপত্য করিতেন। গুজরাটের অন্তর্গত বরদায় গাইকবাড়ের কর্ত্তৃত্ব ছিল। মধ্য ভারতবর্ষের অন্তর্গত গোবালিয়রে সিন্ধিয়া এবং ইন্দোরে হোলকার আপনাদের প্রাধান্য রক্ষা করিতেছিলেন।

পূর্ব্বাংশে নাগপুরে রঘুজী ভোঁসলা বহ্রার হইতে উড়িষ্যার উপকূল পর্য্যন্ত ভূখণ্ডে আপনার শাসনদণ্ড অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল লর্ড মর্ণিংটন্ এই সকল মারাঠা ভূপতিদিগকে বশীভূত করিতে উদ্যত হয়েন। পরাক্রান্ত যশোবন্ত রাও হোল্‌কারের সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। হোল্‌কার মহারাষ্ট্রচক্রের বিলুপ্ত গৌরবের উদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। মন্‌সন নামক একজন ইংরেজ সেনাপতি তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। এই সময়ে হোল্‌কার প্রতাপগড় নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইংরেজসৈন্যের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া, তিনি সহসা সে স্থান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক চম্বল নদ উত্তীর্ণ হইয়া মন্‌সনের পঞ্চাশ মাইল দূরে আসিয়া পঁহুছিলেন। ইংরেজ সেনাপতি বিপক্ষকে অতর্কিতভাবে উপস্থিতপ্রায় জানিয়া, কিয়দ্দূর ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। নিকটে মুকুন্দর নামে একটি গিরিসঙ্কট ছিল। এই গিরিসঙ্কট অধিকারে রাখিয়া, কর্ণেল মন্‌সন্ আত্মরক্ষার জন্য প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সেনাপতি জিনোফনের রসময়ী লেখনীর গুণে "দশ সহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন" গ্রীশের ইতিহাসে মধুরভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই প্রত্যাবর্ত্তন-কাহিনী আজ পর্য্যন্ত অনমনীয় বীরত্ব, অবিচলিত উৎসাহ ও অশ্রুতপূর্ব্ব অধ্যবসায়ের পরিচয় দিতেছে। যদি ভারতে একটি জিনোফন্ থাকিতেন, তাহা হইলে সেনাপতি মন্‌সনের প্রত্যাবর্ত্তনকাহিনীও ঐরূপ মধুরভাবে কীর্ত্তিত হইত। সেনাপতির প্রত্যাবর্ত্তনের পথ নিষ্কণ্টক রাখার জন্য একজন ভারতীয় বীর কিরূপ আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন, ভয়ঙ্কর শত্রুর সম্মুখে আপনার হৃদয়ের শোণিত দিয়া, কিরূপে প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন, তাহা সহৃদয় ঐতিহাসিক বিস্ময় ও প্রীতির সহিত বর্ণন করিতেন। এই বীরপুরুষ পুণ্যভূমি হরবতীর রাজপুতদিগের অধিনায়ক অমরসিংহ। অমরসিংহ বীরত্বের জ্বলন্ত প্রতিমূর্ত্তি, আত্ম-

ত্যাগের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্তভূমি, পবিত্র মিত্রতার অদ্বিতীয় আশ্রয়ক্ষেত্র। ইনি সত্যপাশে আবদ্ধ হইয়া, বিদেশী ও বিধর্ম্মী ইংরেজের রক্ষার জন্যে আত্মপ্রাণের উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইলেন।

সেনাপতি মন্‌সন্ পশ্চাৎ হটিয়া মুকুন্দর গিরিসঙ্কটের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের পথ নিরুপদ্রব থাকে, এজন্যে তিনি পথে কোটার রাজপুতদিগকে রাখিয়া গেলেন। এই রাজপুত-দিগের অধিনায়ক অমরসিংহকে বলা হইল যে, বিপক্ষগণ অগ্রসর হইলেই যেন পথে তাহাদের গতিরোধ করা হয়। বীরপ্রবর অমরসিংহ এই অনুরোধরক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। পিপলীনামক একটি পল্লীর নিকটে আমজর নদ প্রবাহিত হইতেছে। অমরসিংহ ঐ নদের উত্তর-তীরে উপনীত হইয়া, অশ্ব হইতে অবরোহণ করিলেন। অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত এক হাজার বীরপুরুষ তাঁহার চারিদিকে দণ্ডায়মান হইল। অমরসিংহ এক সহস্র সৈনিকের বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া, নির্ভীকচিত্তে আমজর নদের পথ অবরোধ করিয়া রহিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে হোল্‌কারের সৈন্য উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে অমরসিংহের পক্ষ হইতে বিপক্ষদলে গুলির পর গুলিবৃষ্টি হইতে লাগিল। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, গুলির আঘাতে প্রতিমুহূর্ত্তে বিপক্ষদিগের গতাসু দেহ আমজরের জলে পড়িতে লাগিল। কিন্তু শত্রুগণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইলে, সহসা একটি গুলি অমরসিংহের কপালে এবং আর একটি গুলি তাঁহার বক্ষঃস্থলের দক্ষিণ ভাগে প্রবিষ্ট হইল। অমরসিংহ ভূপতিত হইলেন। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার চেতনার সঞ্চার হইল; মুহূর্ত্তমধ্যে তিনি উঠিয়া, একটি আকমাড়ী কলের গুঁড়ি হেলান দিয়া, অসি হস্তে করিয়া, আপনার সৈনিকপুরুষদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। অমরসিংহ দুই স্থানে সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছেন, তথাপি তাঁহার প্রশান্ত মুখমণ্ডলে বিষাদের আবির্ভাব নাই, প্রদীপ্ত নয়নযুগলে ভয়ের

বিকাশ নাই, প্রশস্ত ললাটফলকে দুশ্চিন্তার চিহ্ন নাই; আহত, অমরসিংহ বিপক্ষদিগকে আপনার হস্তস্থিত তরবারি দ্বারা লক্ষ্য করিয়া, হরবংশীয় রাজপুতদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু আহত স্থান হইতে শোণিতস্রোত প্রবাহিত হওয়াতে অমরসিংহ নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন। বীরশ্রেষ্ঠ সেই ইক্ষুমন্থন-দণ্ডে পৃষ্ঠ রাখিয়া, আপনার হস্তস্থিত তরবারি দ্বারা সেইভাবে বিপক্ষদিগকে লক্ষ্য করিয়া, ইংরেজ ভূপতির জন্য অম্লানভাবে অনন্তনিদ্রায় অভিভূত হইলেন। কোটার সার্দ্ধ চারিশত বীরপুরুষ তাঁহার চারিপার্শ্বে থাকিয়া হত ও আহত হইল। ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতে বিপক্ষগণ আর অগ্রসর হইল না। মুকুন্দর গিরিসঙ্কট নিরাপদ রহিল। সেনাপতি মন্‌সন্ অমরসিংহের পরাক্রমে অক্ষতশরীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

স্বাধীনতার প্রকৃত সম্মান।

(শিবাজী)

খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ অতীত হইয়াছে; মোগল-সম্রাট আওরঙ্গজেব দক্ষিণাপথে প্রভুত্ব-বিস্তারের চেষ্টা পাইতেছেন। প্রাতঃস্মরণীয় শিবাজী বীরত্বের গৌরবে, তেজস্বিতার মহিমায় আপনার প্রাধান্য রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার প্রতাপ ও তাঁহার মহাপ্রাণতায় সমগ্র দক্ষিণাপথ গৌরবান্বিত হইয়াছে। ক্ষমতাশালী মোগল কিছুতেই এই হিন্দুবীরের বীরত্বকীর্ত্তি সঙ্কুচিত করিতে পারিতেছেন না। দিনের পর দিন অতীত হইয়াছে, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, অবিরাম গতিতে অনন্ত কালসাগরে মিশিয়া যাইতেছে, কিন্তু স্বাধীনতার উপাসক, ভবানীভক্ত

শিবাজী।

হিন্দুবীরের প্রতাপ মন্দীভূত হইতেছে না। হিন্দুবীর বীরধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিয়া, মুসলমানের নিকটে কিছুতেই অবনতি স্বীকার করিতেছেন না। ঘোরতর দুর্দ্দিনে, পরাধানতার শোচনীয় সময়ে, ধর্ম্মান্ধ মোগলের কঠোর পীড়নে আর্য্যভূমি আবার যেন আর্য্যবীরের মহামন্ত্রে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। তামসী নিশীথের আকাশতলে যেন একটি ধ্রুবতারা ধীরে ধীরে উদিত হইয়া পথহারা পথিকের হৃদয়ে নৈরাশ্যে আশা, অনাশ্বাসে আশ্বাস দিতেছে; কাদম্বিনীর পার্শ্বে যেন চিরদীপ্ত প্রভাকর জগজ্জীবনী প্রভা বিকাশ করিয়া, জীবগণকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পুলকিত করিতেছে।

আওরঙ্গজেব শিবাজীকে বশীভূত করিবার জন্যে আপনার মাতুল সায়েস্তা খাঁকে দক্ষিণাপথের সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন। যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র শিবাজীর ক্ষমতারোধ হয়, তাঁহার রাজ্য ও তাঁহার দুর্গ মোগলের অধিকারভুক্ত হইয়া উঠে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ দিবার জন্যে, এই নবনিয়োজিত সুবাদারের উপর আদেশ হইল। সম্রাটের আদেশে সায়েস্তা খাঁ বহুসংখ্য সৈন্য লইয়া, আওরঙ্গবাদ হইতে পুনার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পুনা অধিকৃত হইল। সায়েস্তা খাঁ এক দল পরাক্রান্ত সৈন্য ঘাটপর্ব্বতের পার্শ্ববর্ত্তী আর একটি স্থান অধিকার করিতে পাঠাইলেন। তিনি শিবাজীর অধিকৃত জনপদে মোগলের জয়পতাকাস্থাপনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন; সুতরাং দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার সহিত তাঁহার তেজস্বিতার বিকাশ হইতে লাগিল। কিন্তু তেজস্বী সুবাদার বিনা বাধায় মহারাষ্ট্ররাজ্যে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। শিবাজীর মহামন্ত্রবলে মহারাষ্ট্রীয়গণ সাহসী ও বলসম্পন্ন হইয়াছিল; স্বাধীনতার গৌরবে তাহাদের বীরত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এবং আত্ম-সম্মানের মহিমায় স্বদেশহিতৈষিতা তাহাদের হৃদয়ে প্রসারিত হইয়াছিল। মোগল সুবাদার সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও এই স্বাধীনতাপ্রিয় পরাক্রান্ত

জাতির স্বাধীনতার সম্মান নষ্ট করিতে সমর্থ হইলেন না।' মহারাষ্ট্রে চাকন নামে ক্ষুদ্র জনপদ ছিল। শিবাজী, ফেরঙ্গজী নামক একজন যুদ্ধবীরের হস্তে ঐ জনপদের রক্ষার ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন। তেজস্বী ফেরঙ্গজী ১৭ বৎসর কাল, দুরন্ত মুসলমানের অধিকারের মধ্যে, চাকনের স্বাধীনতা অক্ষত রাখিয়াছিলেন। সায়েস্তা খাঁ চাকনের আয়তন অতি ক্ষুদ্র দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন যে, তিনি আদেশ করিবামাত্র ঐ সঙ্কীর্ণ দুর্গের শাসনকর্ত্তা তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিবেন। কিন্তু ফেরঙ্গজী ক্ষুদ্র জনপদের রক্ষক হইলেও তেজস্বিতায় ক্ষুদ্র ছিলেন না। তিনি আত্মসমর্পণ করিলেন না। আত্মস্বাধীনতায় বিসর্জ্জন দিলেন না। তাঁহার সাহস বৃদ্ধি পাইল, পরাক্রম প্রবল হইল। বীরপ্রবর লোকাতীত বীরত্বের সহিত তেজস্বী মোগলসৈন্যের সম্মুখে আত্মরক্ষায় উদ্যত হইলেন। ক্রমে এক মাস গেল; আর এক মাসেরও অর্দ্ধাংশ অতীত হইল, তথাপি পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় মোগলের পদানত হইলেন না। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ যাইতে লাগিল, প্রতিদিন প্রতি সপ্তাহে ফেরঙ্গজী নবীন সাহস, নবীন উদ্যম, নবীন বীরত্বে প্রমত্ত হইয়া স্বাধীনতার সম্মান রক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে একমাস পাঁচিশ দিন অতিবাহিত হইল। চাকন সায়েস্তা খাঁর অধিকৃত হইল না। ষড়্‌বিংশ দিনে হঠাৎ দুর্গ-প্রাচীরের একদিকে একটি কুল্যা ফুটিয়া উঠাতে প্রাচীরের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া গেল। আক্রমণকারী মোগল সৈন্য মহোল্লাসে ঐ ভগ্ন স্থান দিয়া নগরপ্রবেশে উন্মুখ হইল। এই সঙ্কট-কালে সাহসী ফেরঙ্গজী সৈনিকগণের অগ্রভাগে থাকিয়া বিপক্ষের গতিরোধে উদ্যত হইলেন। তাঁহার পরাক্রম, তাঁহার ক্ষমতা, তাঁহার বীরত্ব কিছুতেই পর্য্যুদস্ত হইল না। ফেরঙ্গজী এমন কৌশলে, এমন তেজস্বিতার সহিত বিপক্ষের আক্রমণে বাধা দিতে লাগিলেন যে, আক্রমণকারী সৈন্য অগ্রসর হইতে পারিল না। তিনি সমস্ত দিন

এইরূপে আত্মরক্ষা করিলেন, এইরূপে সমস্তদিন নগরপ্রাচীরের ভগ্ন স্থানে দাঁড়াইয়া বহু সংখ্য মোগল সৈন্যের অধিনায়ক সায়েস্তা খাঁর সম্মুখে বুক পাতিয়া, স্বাধীনতার সহিত মহাবীর শিবাজীর মহামন্ত্রের গৌরব রক্ষা করিলেন। ক্রমে রাত্রি আসিল ; অনন্ত নৈশ গগনে দুই একটি তারকা-স্তবক ধীরে ধীরে ফুটিতে লাগিল। রাত্রি সমাগমে মোগল সৈন্য যুদ্ধে নিরস্ত হইল। পরদিন প্রাতঃকালে তেজস্বী ফেরঙ্গজী সায়েস্তা খাঁর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সায়েস্তা খাঁ এই বীরপুরুষের সমুচিত মর্য্যাদা করিতে ত্রুটি করিলেন না। তিনি ফেরঙ্গজীর অসাধারণ সাহস ও ক্ষমতার প্রশংসা করিয়া, তাঁহাকে কহিলেন যে, যদি তিনি মোগলসরকারে চাকরি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে যথোপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইবে। কিন্তু তেজস্বী ফেরঙ্গজী আত্মসম্মান বিক্রয় করিলেন না। তিনি সায়েস্তা খাঁর অনুরোধ রক্ষা করিতে অসম্মত হইলেন। সায়েস্তা খাঁ তাঁহার বীরোচিত ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বিদায় দিলেন। ফেরঙ্গজী বীরত্বে গৌরবান্বিত হইয়া, শিবাজীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য যে, শিবাজী তাঁহার সাহস ও ক্ষমতার পুরস্কার করিতে ত্রুটি করেন নাই। ভারতের বীরপুরুষ এক সময়ে এইরূপে স্বাধীনতার সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন, আত্মগৌরবে বিসর্জ্জন না দিয়া, এক সময়ে এইরূপে তেজস্বিতা ও মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

মহারাষ্ট্রে মহাকীর্ত্তি।

(তানাজী)

আওরঙ্গজেব দক্ষিণাপথে আপনার অধিকারবিস্তারে উদ্যত হইয়াছেন। বীরপ্রবর শিবাজী সম্রাটের পরাক্রম খর্ব্ব করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। তাঁহার সাহস বাড়িয়া উঠিয়াছে, উচ্চতর অধ্যবসায়, মহত্তর সাধনা বিকাশ পাইয়াছে। তিনি অতুল্য সাহসে, অসামান্য বিক্রমে, অলৌকিক অধ্যবসায়গুণে স্বর্গাদপি গরীয়সী পুণ্যভূমির স্বাধীনতারক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। সাগরের প্রচণ্ড তরঙ্গপ্রবাহ ভৈরবরবে ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভাসাইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে। শিবাজী দক্ষিণাপথে অটল গিরিবরের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া, লোকাতীত তেজস্বিতার সহিত সেই তরঙ্গ-প্রবাহের গতিরোধ করিতেছেন। খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ভারতের দক্ষিণ প্রান্ত এইরূপ বীরত্বকীর্ত্তিতে উজ্জ্বল হইয়াছিল। পরাধীনতার শোচনীয় সময়ে স্বাধীনতার স্বর্গীয় মূর্ত্তি ধীরে ধীরে ভারতের এক প্রান্তে প্রকাশ হইয়া, লোকের হৃদয়ে আশা ও উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছিল। ঘোরতর দুর্দ্দিনে মেঘমালার একদেশ হইতে সূর্য্যের অনতিস্ফুট আলোক নিঃসৃত হইয়া, অন্ধকারময় স্থান এইরূপ উজ্জ্বল স্বর্ণকান্তিতে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল।

আওরঙ্গজেব শিবাজীর পরাক্রম খর্ব্ব করিবার জন্যে আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান্ মাজ্জম্ ও সেনাপতি যশোবন্ত সিংহকে দক্ষিণাপথে পাঠাইয়া দিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে রাজা জয়সিংহ শিবাজীর সিংহগড় ও পুরন্দর দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। মোগলপক্ষের অনেক রাজপুতসৈন্য সিংহ গড়ে অবস্থিত করিতেছিল। উদয়ভানু নামক একজন রাজপুত বীর ইহাদের অধ্যক্ষ ছিলেন। এখন শিবাজী ঐ দুর্গ অধিকার করিতে

উদ্যত, মোগলের সমক্ষে প্রাধান্যস্থাপনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বীরশ্রেষ্ঠ এক্ষণে এই জন্যে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছেন. নীরবে গম্ভীরভাবে বিপক্ষের ক্ষমতা নষ্ট করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন।

সিংহগড় নিসর্গরাজ্যের সৌন্দর্য্যময় স্থানে অবস্থিত। উহা উন্নত পর্ব্বতমালায় পরিবেষ্টিত। এক দিকে সহ্যাদ্রি অনন্ত গগনে মাথা তুলিয়া অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্যের পরিচয় দিতেছে। সহ্যাদ্রির পূর্ব্বপ্রান্তে সিংহগড়। উত্তরে ও দক্ষিণে সমুন্নত পর্ব্বত লম্বভাবে রহিয়াছে। এই পর্ব্বত অতিশয় দুরারোহ। অর্দ্ধ মাইল পর্য্যন্ত উপরে উঠিয়া সঙ্কীর্ণ ও দুর্গম গিরিপথ অবলম্বন করিয়া চলিলে দুর্গের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। পশ্চিমদিকেও ঐরূপ দুর্গম, দুরারোহ পর্ব্বত বিস্তৃত রহিয়াছে। দুর্গটি ত্রিকোণাকার, উহার মধ্যভাগের পরিধি প্রায় দুই মাইল। ভীষণ প্রাকৃতিক প্রাচীর দুর্গের বহির্ভাগ রক্ষা করিতেছে। যখন আকাশ পরিষ্কার থাকে, অনভ্র নীল গগনে সূর্য্যালোক প্রকাশ হয়, তখন পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত করিলে, নীরা নদীর বৃক্ষলতাপরিশোভিত শ্যামল তটদেশ নয়নের তৃপ্তিসাধন করিতে থাকে। উত্তরদিকে পর্ব্বতের বহিঃপ্রদেশ প্রশস্ত সমতল ক্ষেত্র। শিবাজীর বাল্যকালের লীলাভূমি পুনানগরী ঐ ক্ষেত্রের পুরোভাগে দৃষ্টিগোচর হয়। দক্ষিণে ও পশ্চিমে কেবল উন্নত ও অবনত শৈলমালা সুনীল বারিধির তরঙ্গভঙ্গীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। এই অভ্রভেদী গিরির শিখরগুলি সুদূর দিগন্তে নীলাকাশের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। এই দিকে শিবাজীর রায়গড় অবস্থিত। শিবাজীর সেনাপতি তানাজী এই দুর্গম দুরারোহ গিরিদুর্গ অধিকার করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে এই দুর্গ কোণ্ডনা নামে অভিহিত হইত। শিবাজী দুর্গাধ্যক্ষ তানাজীর পরাক্রমের পরিচয় দিবার জন্যে উহার নাম সিংহগড় রাখিয়াছিলেন।

মাঘ মাস। দুর্গম গিরি-প্রদেশে দুরন্ত শীত দ্বিগুণ প্রভাব বিস্তার

করিতেছে। সাহসী তানাজী এই শীতের মধ্যে অন্ধকারময়ী রাত্রিতে এক হাজার মাবালা সৈন্য লইয়া সিংহগড় অধিকার করিতে যাত্রা করিলেন। গিরিপথগুলি সৈনিকগণের পরিচিত ছিল। ইহারা গভীর নৈশ অন্ধকারে নির্ভয়ে, নিঃশব্দে ঐ পরিচিত গিরিপথ দিয়া দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। তানাজী আপনার সৈন্য দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। একভাগ কিয়দ্দূরে অবস্থিতি করিতেছিল। ইহাদের প্রতি আদেশ ছিল যে, ইহারা সঙ্কেত-প্রাপ্তিমাত্র অগ্রসর হইবে। অপর ভাগ দুর্গের ঠিক নিম্নে পর্ব্বতের পাদদেশে লুক্কায়িত রহিল। ইহাদের মধ্যে একজন সাহসী বীরপুরুষ নিঃশব্দে পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া, সবিশেষ সত্বরতার সহিত একগাছি দড়ির মই ফেলিয়া দিল। শিবাজীর মাবালা সৈন্য ঘোরতর অন্ধকারের মধ্যে ঐ সোপান অবলম্বন করিয়া একে একে উপরে উঠিতে লাগিল। এইরূপে তিন শত সৈন্য উপরে উঠিয়াছে, এমন সময়ে হঠাৎ একটি শব্দ হইল। ঐ শব্দে দুর্গস্থিত সৈনিক পুরুষেরা চমকিত হইয়া, যে দিক্ দিয়া মাবালা সৈন্য উপরে উঠিতেছে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিল। একজন সৈনিক ঘটনা কি, জানিবার জন্যে যেমন অগ্রসর হইয়াছে, অমনি একজন মাবালার নিক্ষিপ্ত তীরে তাহার প্রাণবায়ুর অবসান হইল। কিন্তু ঐ শব্দে দুর্গরক্ষকগণ অগ্রসর হইতে লাগিল। তানাজী তখন বিপুলসাহসে তিন শত মাত্র সৈন্য লইয়া, বহুসংখ্যক দুর্গরক্ষীকে আক্রমণ করিলেন। মাবালাগণ সংখ্যায় অল্প হইলেও অসামান্য বীরত্ব দেখাইয়া দুর্গরক্ষী সৈনিকদিগের উপর অস্ত্রবর্ষণ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণমধ্যে তানাজী প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় সেই যুদ্ধস্থলে বীরশয্যায় শায়িত হইলেন। তখন তাঁহার সৈন্য রণক্ষেত্র হইতে নীচে নামিবার জন্য দৌড়িতে লাগিল। এমন সময়ে তানাজীর ভ্রাতা সূর্য্যাজী যুদ্ধস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া গম্ভীরস্বরে তাহাদিগকে কহিলেন,—"কোন্ নরাধম আপনার

পিতার দেহ যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলিয়া যাইতে ইচ্ছা করে? দড়ির মই নষ্ট হইয়াছে। সকলে যে মহারাজ শিবাজীর মাবালা সৈন্য, এখন তাহারই প্রমাণ দেখান উচিত।" সূর্য্যাজীর এই তেজস্বিতাময় বাক্য মাবালাদিগের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহারা আবার "হর হর" শব্দে শত্রুদলে প্রবিষ্ট হইল। ঐ গম্ভীর শব্দ গভীর নিশীথের শান্তিভঙ্গ করিয়া পর্ব্বতকন্দরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এবার মাবালাগণ এরূপ বেগে দুর্গরক্ষীদিগকে আক্রমণ করিল যে, তাহারা কিছুতেই ঐ আক্রমণ নিরস্ত করিতে পারিল না। পাঁচ শত দুর্গরক্ষী সৈনিকপুরুষ তাহাদিগের অস্ত্রাঘাতে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইল। সূর্য্যাজী বিজয়ী হইলেন। দুরারোহ পর্ব্বতশিখরস্থিত সিংহগড়ে আবার শিবাজীর বিজয়পতাকা স্থাপিত হইল।

এই বিজয়বার্ত্তা শিবাজীর নিকটে পঁহুছিল। কিন্তু শিবাজী যখন শুনিলেন যে, দুর্গ অধিকার করিতে তানাজী নিহত হইয়াছেন, তখন তিনি গভীর শোকে অশ্রুপাত করিতে করিতে কহিলেন,—"সিংহের আবাসগৃহ অধিকৃত হইল বটে, কিন্তু সিংহ নিহত হইল। আমরা দুর্গ হস্তগত করিলাম, কিন্তু হায়! তানাজীকে জন্মের মত হারাইতে হইল।"

বীরপুরুষের প্রকৃত বীরত্ব।

(শক্ত)

মোগল-সম্রাট্ অক্‌বরের মৃত্যু হইয়াছে। কুমার সলিম, জাহাঁগীর নাম পরিগ্রহ করিয়া দিল্লীর রত্নসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছেন। তিনি ভারতের চারিদিকে আপনার আধিপত্য বদ্ধমূল করিতে চেষ্টা পাই-তেছেন। তাঁহার পিতা যে বিজয়িনী শক্তিতে গৌরবান্বিত হইয়া-ছিলেন, জাহাঁগীর সেই শক্তি সংগ্রহ করিতে যত্নশীল হইয়াছেন। পরাক্রান্ত রাজপুত-রাজ্য অক্‌বরের প্রধান লক্ষ্য ছিল। মিবারের প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপসিংহ লোকাতীত বীরত্ব ও দেশভক্তিতে দীর্ঘকাল মোগল সৈন্যের সমক্ষে স্বাধীনতার গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। জাহাঁগীর প্রতাপের ঐ বীরত্ব, রাজপুতদিগের ঐ তেজস্বিতার বিষয় স্মৃতিপটে অঙ্কিত রাখিয়াছেন। এখন তিনি স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইয়া সেই পুণ্যভূমি মিবারকে পরাধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। এ সময়ে মহাবীর প্রতাপসিংহ অক্ষয় স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হইয়া-ছিলেন। বীরভূমি প্রতাপের বীরত্ব হইতে স্খলিত হইয়াছিল। দিল্লীর অভিনব সম্রাট্ এই সুযোগে চিতোরের প্রাচীন দুর্গ হস্তগত করিলেন; চিতোরের অধিপতি দুর্গম পর্ব্বতের বিজন অরণ্যে গিয়া, আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। রাজ্যের সীমান্তভাগে অন্তল নামে একটি দুর্গ ছিল। ঐ দুর্গেও সম্রাটের আধিপত্য স্থাপিত হইল। কিন্তু পরাক্রান্ত রাজপুতগণ ইহাতে উদ্যমশূন্য হইল না। যে স্বাধীনতার গৌরবে, যে স্থিরপ্রতিজ্ঞার মহিমায়, যে বীরত্বের গরিমায় এক সময়ে তাহারা চির-প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, সে গৌরব, সে মহিমা ও সে গরিমা এখনও রাজ-পুতগণ হইতে একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। চিতোরের অধিপতি

আপনাদের চিরন্তন স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। রাজপুতনার বীরত্বদৃপ্ত রাজপুতগণ আপনাদের প্রনষ্টগৌরবের উদ্ধার-বাসনায় আত্মজীবনের উৎসর্গ করিলেন। এই সময়ে রাজপুতনার একটি বীরপুরুষ মহাপ্রাণতার পরিচয় দেন, তেজস্বিতার সহিত আত্মত্যাগপূর্ব্বক নশ্বর জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করেন।

রাজপুতনার বীরগণ দুর্গম পার্ব্বত্যপ্রদেশে একত্র হইয়াছেন, মিবারের রাণা পরাক্রান্ত শত্রুকে পরাভূত করিবার জন্যে এই বীরগণের সহিত পরামর্শ করিতেছেন। এখন সকলেই আপনাদের বীরত্বগৌরব দেখাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁহাদের পবিত্র ভূমিতে শত্রুগণ প্রবেশ করিয়াছে, তাঁহাদের দুর্গে শত্রুর পতাকা উড়িতেছে, তাঁহারা শত্রুর আগমনে পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, এখন সকলেই ঐই দুরন্ত শত্রুকে সমুচিত প্রতিফল দিতে আগ্রহযুক্ত। বীরভূমির সাহস-সম্পন্ন, রণকুশল চন্দাবত ও শক্তাবতগণ * একত্র হইয়াছেন। এখন সকলেই আপনাদের পূর্ব্বপুরুষোচিত তেজস্বিতায় উদ্দীপিত, সকলেই প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া, রাণার আদেশপালনে সমুদ্যত। চন্দাবতগণ যুদ্ধযাত্রী সৈনিকগণের অগ্রগামী হইতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন; তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তাবতগণও ঐ সম্মান পাইবার জন্যে লালায়িত হইয়াছেন, এখন উভয়প্রতিদ্বন্দ্বীই পরস্পরের অগ্রবর্ত্তী হইবার জন্যে আগ্রহান্বিত, উভয়েই পরস্পরের অগ্রে গিয়া, আত্মপ্রাধান্য দেখাইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। উভয় দলই আপনাদের তরবারির উপর নির্ভর করিয়া, উপস্থিত বিষয়ের মীমাংসা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। কিন্তু রাণা কৌশলক্রমে এই আত্মবিগ্রহের গতি রোধ করিলেন; তিনি ধীর-

---

* চিতোরের একজন প্রাচীন রাণার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম চন্দ। ইঁহার দলস্থগণ চন্দাবত নামে প্রসিদ্ধ। শক্ত রাণা উদয়সিংহের পুত্র। এই নামে শক্তাবতদল প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

গম্ভীরস্বরে কহিলেন,—"যিনি শক্রর অধিকৃত অন্তল দুর্গে অগ্রে প্রবেশ করিতে পারিবেন, তাঁহারই সৈনিকদলের অগ্রে যাওয়ার সম্মান লাভ হইবে।" চন্দাবত ও শক্তাবতগণ রাণার আদেশে ঐ গৌরবান্বিত সম্মান পাইবার আশায় বিপুল উৎসাহসহকারে অন্তল দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অন্তল মিবারের একটি সমধরাতলবর্ত্তী দুর্গ। উহা রাজ্যের সীমান্ত-ভাগে অবস্থিত এবং রাজধানী হইতে প্রায় আঠার মাইল দুরবর্ত্তী। দুর্গটি উন্নত ভূখণ্ডের উপর নির্ম্মিত। একটি স্রোতস্বতী উহার প্রাচীরের পাদদেশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। প্রাচীর অতি দৃঢ় ও উন্নত। উহা অসীম নভোমণ্ডলে প্রসারিত হইয়া, আপনার বিশালতার পরিচয় দিতেছে। দুর্গে যাইবার জন্যে কেবল একটিমাত্র পথ। ঐ পথ দুর্গের লৌহকীলকময় সুদৃঢ় সিংহদ্বারে অবরুদ্ধ হইয়াছে।

চন্দাবত ও শক্তাবতগণ গভীর নিশীথের শান্তিভঙ্গ না হইতেই, আত্মপ্রাধান্য অব্যাহত রাখার আশায়, এ দুর্গের অভিমুখে যাত্রা করি-লেন। চারণগণ মধুরকণ্ঠে তেজস্বিতার উদ্দীপক সঙ্গীতে উভয় দলের তেজস্বিতা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। উভয় দল এই সমরসঙ্গীতে উৎসাহ-যুক্ত হইয়া বীরদর্পে বিভিন্নপথে অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রভাতসময়ে শক্তাবতগণ দুর্গদ্বারের নিকট উপনীত হইলেন। এই সময়ে শক্রগণ নিরস্ত্র ছিল। কিন্তু তাহারা আক্রমণ-সংবাদ পাইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, দুর্গপ্রাচীরে দণ্ডায়মান হইল। রাজপুতগণ প্রবলবেগে দুর্গ আক্রমণ করিল। মোগলসৈন্যও দৃঢ়তার সহিত এই আক্রমণে বাধা দিতে লাগিল। এদিকে চন্দাবতগণ জলাভূমি পার হইয়া দুর্গের অভিমুখে আসিতেছিলেন। দুর্গের প্রাচীরে উঠিবার আশায় তাঁহারা কতকগুলি মই সঙ্গে আনিয়াছিলেন। শক্তাবতদলের অধিনায়ক উহা দেখিতে পাইলেন। তাঁহার সঙ্গে মই ছিল না; সুতরাং তিনি দুর্গদ্বার

ভাঙ্গিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের অগ্রেই দুর্গে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। এদিকে শত্রুর গোলার আঘাতে চন্দাবতদলের অধিনায়ক পড়িয়া গেলেন। মোগল সৈন্য উভয় দলকেই সমানভাবে বাধা দিতে লাগিল। কিন্তু শক্তাবতদিগের তেজস্বী অধিনায়ক নিরস্ত হইলেন না। তিনি যে হস্তীতে ছিলেন, সেই হস্তী দ্বারা দুর্গদ্বার ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঐ দ্বার সুতীক্ষ্ণ লৌহময় শলাকায় পরিব্যাপ্ত ছিল; সুতরাং হস্তী আপনার বল-প্রকাশের সুবিধা পাইল না। সাহসী শক্তাবত ইহা দেখিয়া হাওদা হইতে নামিলেন এবং ধীরপ্রশান্তভাবে সেই তীক্ষ্ণ লৌহ-শলাকাময় দ্বারে বক্ষঃস্থল পাতিয়া, মাহুতকে আপনার পৃষ্ঠদেশে হাতী চালাইতে কহিলেন। মাহুত অধিনায়কের আদেশ পালন করিল। হস্তী তেজস্বী শক্তাবতের পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিয়া দুর্গদ্বার ভাঙ্গিয়া দিল। বীরপুরুষ আত্মপ্রাধান্য রক্ষার জন্য ধীরভাবে লৌহশলাকায় বুক পাতিয়া, অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। বীরশ্রেষ্ঠের এই অক্ষয় বীরত্বকীর্ত্তিতে রাজপুতের পবিত্র ভূমি পবিত্রতর হইল।

কিন্তু শক্তাবতগণ আপনাদের অধিনায়কের ঐ লোকাতীত তেজস্বিতাতেও অভীষ্ট সম্মান লাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা অধিনায়কের মৃতদেহের উপর দিয়া, দুর্গদ্বারে আসিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে চন্দাবতদলের অধিনায়ক নিহত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু আর একজন সাহসী ব্যক্তি এই দলের পরিচালনভার গ্রহণ করিলেন। তিনি নিহত অধিনায়কের দেহ পৃষ্ঠদেশে বাঁধিয়া, বিপুল-বিক্রমে অগ্রসর হইলেন। হস্তস্থিত শাণিত অস্ত্র দ্বারা আপনার পথ পরিষ্কার করিয়া, পৃষ্ঠস্থিত অধিনায়কের মৃত দেহ দুর্গের মধ্যে ফেলিয়া ভৈরবরবে কহিলেন, "চন্দাবত অগ্রে অন্তল দুর্গে প্রবেশ করিয়াছেন; সুতরাং তিনিই যুদ্ধযাত্রী সৈনিকদলের অগ্রণী।"

বীরাঙ্গনার বীরত্বমহিমা।

(পৃথ্বীরাজের বণিতা)

মোগল-সম্রাট্ অক্‌বর শাহ দিল্লীর শাসনদণ্ড পরিগ্রহ করিয়াছেন। ভারতের উত্তরে ও দক্ষিণে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে মোগলের বিজয়পতাকা বায়ুভরে প্রকম্পিত হইয়া, যেন বিপক্ষদিগকে তর্জ্জন করিতেছে। যে সকল সামন্ত স্বপ্রধান হইয়াছিলেন, তাঁহারা একে একে অক্‌বরের অধীনতা স্বীকার করিতেছেন। সম্রাট্ অক্‌বর বাহুবলে ও মন্ত্রকৌশলে বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া বিপুল বৈভবে, সুশাসনের গৌরবে সকলের বরণীয় হইয়াছেন। আর্য্যাবর্ত্তের শ্যামল প্রান্তরে, দক্ষিণাপথের প্রশস্ত ক্ষেত্রে, আফগানভূমির পার্ব্বত্য প্রদেশে, তাঁহার গৌরবকাহিনী উদ্‌ঘোষিত হইতেছে। জনসাধারণ তাঁহার ক্ষমতা, তাঁহার প্রাধান্য, তাঁহার অলোকসাধারণ গুণগরিমা দেখিয়া, মহতী দেবতাজ্ঞানে তাঁহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিতেছে।

অদ্য অকবর শাহের খোষ্‌রোজ। বিশাল রাজপুরীতে সুন্দর বাজার বসিয়াছে। এ বাজারে পুরুষের সমাগম নাই; কেবল কমনীয় কামিনী-কুল সারি সারি দোকান সাজাইয়া চারিদিকে অপূর্ব্ব শোভার বিস্তার করিয়াছে। সম্রাট-পত্নী স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন। সামন্ত ললনাগণ হাসিতে হাসিতে বাজারের চারিদিকে বেড়াইতেছেন। রাজপুত-কামিনীগণ সুদৃশ্য বেশভূষায় পরিশোভিত হইয়া, উহার সৌন্দর্য্য দ্বিগুণিত করিয়া দিতেছেন। নানা স্থানে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মনোমদ, যাহা কিছু তৃপ্তিপ্রদ শিল্পদ্রব্য আছে, সমস্তই ঐ রমণীয় বাজারে সজ্জিত হইয়াছে। রমণীই ঐ সকল অপূর্ব্ব শিল্পদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়-কারিণী—

"রমণীতে বেচে, রমণীতে কিনে,
লেগেছে রমণী রূপের হাট"

লাবণ্যবতী ললনাগণে ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাটের পুরী আজ এইরূপ পরিপূর্ণ। শিল্পচাতুরীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে—কামিনীর কমনীয় কান্তিতে আজ রাজভবন এইরূপ উদ্ভাসিত। সম্রাট্ ছদ্মবেশে রূপবতী-কুলের বাজারে বেড়াইতেছেন। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাঁহার নয়নযুগল ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে। তিনি কামিনীগণের সৌন্দর্য্যগরিমা ও ক্রয়বিক্রয় দেখিয়া, আমোদিত হইতেছেন। বিধাতার সৃষ্টিমধ্যে শ্রেষ্ঠ ললনাকুসুমে তাঁহার প্রাসাদ সুশোভিত হইয়াছে দেখিয়া, তিনি প্রীতি-প্রফুল্ল হৃদয়ে এক দোকান হইতে আর এক দোকানে যাইতেছেন এবং প্রতি দোকানেই কোন না কোন দ্রব্যের মূল্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বিক্রয়কারিণী রমণী ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিতেছে; সম্রাট স্বর্ণমুদ্রা দিয়া সেই দ্রব্য কিনিয়া লইতেছেন। রমণী আবার পূর্ব্বের ন্যায় ঈষৎ হাসিয়া স্বর্ণমুদ্রা তুলিয়া লইতেছে। বিকশিত কমলদলের প্রশান্ত কান্তিতে বাজার এইরূপ বিভাসিত হইয়াছে। অকবর শাহ সুখের আবেশে ঐ কমলবনে বিচরণ করিতেছেন। প্রতি মাসের অনুষ্ঠিত মহোৎসবের পরবর্ত্তী নবম দিবসে ঐ বাজার হইত। এই জন্যে উহা "নওরোজা" * নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। অকবর ঐ বাজারের প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা। তিনি আদর করিয়া, উহার নাম "খোষ্‌রোজ" বা আনন্দের দিন রাখিয়াছিলেন। সম্রাট্ এই আমোদের দিনে আনন্দের তরঙ্গে দুলিয়া বেড়াইতেছেন।

একটী রূপবতী যুবতী এই বাজার দেখিতে আসিয়াছেন। তাঁহার সৌন্দর্য্য-গরিমায়—তাঁহার স্থিরগম্ভীরভাবে স্তম্ভিত হইয়া, বাজারের রমণীকুল তাঁহার দিকে দৃষ্টিযোজনা করিতেছে। যুবতীর স্থির বিদ্যুৎ-

* নওরোজার সাধারণত অর্থ নববর্ষের প্রথম দিন। কিন্তু এস্থলে, ঐ অর্থ হইবে না।

প্রভায় সমগ্র বাজারের যেন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইয়াছে। যুবতী ধীরপদবিক্ষেপে দোকানে দোকানে গিয়া সমস্ত দেখিতেছেন। সুসজ্জিত দ্রব্যের শিল্পচাতুরী দেখিয়া, তাঁহার আহ্লাদ হইতেছে বটে, কিন্তু তিনি কোন কোন ক্রয়বিক্রয়কারিণী রমণীর লজ্জাহীনতায় মনে মনে বড় বিরক্ত হইতেছেন। ঐ ললনাকুল হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতেছে, কিন্তু সে হাসিতে লজ্জাশীলতার আবেশ নাই; সুতরাং সে হাসি লজ্জাশীলতাময়ী যুবতীকে আমোদিত করিতে পারিতেছে না। যুবতী সুন্দরীগণের মধ্যে সৌজন্যের এইরূপ ব্যতিক্রম—পবিত্র সৌন্দর্য্যের অদ্বিতীয় অবলম্বন লজ্জার এইরূপ অধোগতিতে ক্ষুণ্ণ হইয়া, বাজার পরিত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যতা হইয়াছেন। সম্রাট্ কিয়ৎক্ষণ অনিমেষনেত্রে ঐ লাবণ্যবতী ললনাকে দেখিলেন। স্থির সৌদামিনীর অপূর্ব্ব কান্তিতে তাঁহার হৃদয় আকৃষ্ট হইল। যুবতী বাজার হইতে বাহির হইলেন; নির্গমনের পথ অতি কুটিল। যুবতী সেই কুটিল পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার গতিরোধ হইল। অকস্মাৎ তিনি সম্মুখে দেখিতে পাইলেন, সম্রাট্ আকবর শাহ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। সম্রাট যুবতীর রূপে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার গমনপথ অবরুদ্ধ করিতে সঙ্কুচিত হইলেন না। ইহাতে পবিত্রস্বভাবা কুলমহিলার অপরিসীম ক্রোধের সঞ্চার হইল। অসময়ে, অতর্কিতভাবে ভারতের অদ্বিতীয় অধিপতিকে সম্মুখে দেখিয়া, তিনি কিছুমাত্র ভীতা হইলেন না। ক্রোধের আবেগে তাঁহার আরক্তলোচনদ্বয় হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল। তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে আপনার অঙ্গাবরণ হইতে সুতীক্ষ্ণ তরবারি বাহির করিলেন এবং মুহূর্ত্তমধ্যে সেই তরবারি সম্রাটের বক্ষঃস্থলের দিকে ধরিয়া, আত্মসম্মান রক্ষার জন্যে প্রস্তুত হইলেন। যুবতী এইরূপে ভারতসাম্রাজ্যের অধীশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া, সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র ধরিয়া, গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "যে নরাধম পবিত্র ক্ষত্রিয়কুল,

কলঙ্কিত করিতে উদ্যত হয়, তাহাকে এই অস্ত্রদ্বারা সমুচিত শিক্ষা দেওয়া উচিত।" সম্রাট্ লাবণ্যবতী ললনার ভৈরবা মূর্ত্তি দর্শনে স্তম্ভিত হইলেন। তিনি আর কোনরূপ দুঃশীলতা বা উদ্ধতভাবের পরিচয় দিলেন না। বীরাঙ্গনার বীরত্বে ও তেজস্বিতায় তাঁহার হৃদয়ে আহ্লাদের সঞ্চার হইল। গুণপক্ষপাতী সম্রাট্ গুণের অমর্য্যাদা করিলেন না। তিনি সৌম্যভাবে প্রভূত সম্মানের সহিত তেজস্বিনী ক্ষত্রিয়মহিলাকে বিদায় দিলেন।

এই বীরনারী বীরপ্রসবিনী মিবারভূমির শক্তাবতবংশের স্থাপয়িতার দুহিতা এবং রাঠোরকুলসম্ভূত সাহসী পৃথ্বীরাজের বনিতা। সম্রাট্ অক্‌বর এক সময়ে এই লাবণ্যবতী বীরাঙ্গনার সমক্ষে মস্তক অবনত করিয়াছিলেন। যিনি প্রশান্তভাবে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, সুনিয়মে প্রজারঞ্জনগুণের পরিচয় দিয়াছিলেন, অবিকারচিত্তে ন্যায় ও ধর্ম্মের সম্মানরক্ষায় সংযত ছিলেন, অলৌকিক ক্ষমতায় সাধারণের সমক্ষে দেবভাবে সম্পূজিত হইয়াছিলেন, তিনিও এক সময়ে অপথে পদার্পণ করিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই। চিরপ্রসিদ্ধ রাজপুতনার রাজমহিলা এই পুরুষসিংহের সমক্ষে তেজস্বিতা দেখাইয়া, বংশোচিত গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি—পবিত্রতাময়, প্রফুল্লপ্রসূন আপনার গৌরবের মহিমায় অকলঙ্কিত রহিয়াছিল।

বীরবালার আত্মবিসর্জ্জন।

(বেইগুরাজ দুহিতা)

ভাইন্‌স্রোর চিরপ্রসিদ্ধ মিবারের একটি অধীন জনপদ। মিবারের সামন্ত রাজগণ ঐ স্থানের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ভাইন্‌স্রোর দুর্গের এক দিকে উন্নত পর্ব্বতমালা আকাশ ভেদ করিয়া, অনুপম প্রাকৃতিক শোভার পরিচয় দিতেছে। পর্ব্বতের পাদদেশে চম্বল নদ স্রোতের আবেগে তরঙ্গভঙ্গী বিস্তার করিয়া বহিয়া যাইতেছে। দুর্গ হইতে প্রকৃতিরাজ্যের ঐ রমণীয় দৃশ্য দেখিলে, হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দের আবির্ভাব হয়। ভাইন্‌স্রোরের পশ্চিমে ব্রাহ্মণী নদী খরতরবেগে পর্ব্বতের উপর হইতে পতিত হইয়াছে। স্রোতস্বতীর প্রবাহ শৈলমালায় প্রতিহত হইয়া ভয়ঙ্কর তরঙ্গাবর্ত্তের উৎপত্তি করিতেছে। এই নিসর্গসুন্দর জনপদে এক সময়ে প্রমরবংশীয় এক জন রাজপুতশ্রেষ্ঠ আধিপত্য করিতেছিলেন। বেইগু জনপদের মেঘাবতবংশীয় এক জন ক্ষত্রিয়ের দুহিতা প্রমরকুলোদ্ভব ভাইন্‌স্রোররাজের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। বিবাহের পর এই দম্পতীর মধ্যে কোনরূপ বিবাদের সূত্রপাত হয় নাই। উভয়েই ভাইন্‌স্রোরে সেই রমণীয় প্রাসাদে পরম সুখে কালাতিপাত করিতেন। অদুরবর্ত্তী গিরিবরের অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্যে উভয়েই পরিতৃপ্ত হইতেন। পর্ব্বতের পার্শ্বস্থিত স্রোতস্বতীর স্রোতোগরিমা উভয়কে সমভাবে আনন্দিত করিত। এই সংসারে উভয়েই উভয়কে আপনার ভাবিতেন। পবিত্র প্রণয়ে, অপার্থিব ভালবাসায় উভয়েই একসূত্রে গ্রথিত ছিলেন।

এই ভালবাসায় বিভোর হইয়া, দম্পতী একদা ভাইন্‌স্রোরের প্রাসাদে পাঁচিশী ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উভয়েই আমোদের তরঙ্গে দোলায়মান, উভয়েই উভয়কে হারাইবার জন্যে সবিশেষ মনোযোগের

সহিত খেলিতেছেন। জয়শ্রী একবার নায়কের, পরক্ষণে নায়িকার হৃদয়ে যুগপৎ আশা ও আহ্লাদের সূত্রপাত করিতেছে। একবার ভ্রমরপত্নী সগর্ব্বে ঈষৎ হাসিয়া পতিকে আপনার ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখাইতেছেন, আর একবার ভ্রমররাজ প্রণয়িনীর সেই ক্রীড়াগর্ব্ব খর্ব্ব করিতে, হাসিতে হাসিতে আপনার পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। এইরূপে পঁচিশী ক্রীড়া-কৌতুকে দম্পতী ভাইনস্রোরের দুর্গে অনন্ত সুখের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছেন।

দেখিতে দেখিতে ঐ অনন্ত সুখের প্রস্রবণ হইতে তীব্র হলাহলের উৎপত্তি হইল। ভালবাসার খেলায় বিদ্বেষ স্থানপরিগ্রহ করিল। ক্রীড়ার আমোদ ঘোরতর অসুখজনক বাগ্‌বিতণ্ডায় পরিণত হইল। ভাইনস্রোর-রাজ ক্রোধের আবেগে আপনার শ্বশুরকুল লক্ষ্য করিয়া একটি গ্লানিকর কথা কহিলেন। তেজস্বিনী রাজপুতদুহিতা পিতৃকুলের ঐ গ্লানি সহিতে পারিলেন না। তাঁহার ক্রোধ বাড়িয়া উঠিল; কমনীয় হৃদয় জ্বালাময়ী প্রতিহিংসায় অধীর হইল। তিনি পিতৃকুলের অবমন্তা, ভালবাসার, আদরের ধনকে ঘোরতর বিদ্বেষভাবে দেখিতে লাগিলেন। এ অপ-মানের সমুচিত প্রতিশোধ দিতে তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইল। মর্ম্মাহতা ভ্রমরপত্নী পরদিন বেইগু জনপদে দূত পাঠাইয়া, পিতাকে এই অপ-মানের বিষয় জানাইলেন।

বেইগুরাজ দূতমুখে আত্মবংশের নিন্দাবাদ শুনিয়া, সক্রোধে জামা-তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে সৈনিকগণ রাজধানীতে সমবেত হইল। বেইগুর অধিপতি এই সৈনিকদল লইয়া অরণ্য অতিবাহনপূর্ব্বক, ভাইনস্রোরের কয়েক ক্রোশ দূরে উপনীত হইলেন। এই স্থলে সৈনিকদল দুই ভাগে বিভক্ত হইল। বেইগু-রাজ্যাধিপতি একদল লইয়া কুটিল গিরিপথ দিয়া আসিতে লাগিলেন। বেইগুরাজপুত্র আর এক দলের অধিনেতা হইয়া, ব্রাহ্মণী নদীর তটদেশ

দিয়া অগ্রসর হইলেন। এই শেষোক্ত দল অগ্রে ভাইনস্রোরে উপনীত হইল। বেইগুরাজপুত্র নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে করিয়া ভাইনস্রোর-পতির সমক্ষে আসিলেন। প্রমররাজ কাপুরুষ ছিলেন না। তিনিও তরবারি লইয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে উদ্যত হইলেন। এই যুদ্ধে বেইগুরাজপুত্র বিজয়ী হইলেন। পিতার উপস্থিতির পূর্ব্বেই তিনি পিতৃকুলের অবমাননা-কারীকে নিহত করিয়া, দুর্দ্দমনীয় প্রতিহিংসার তৃপ্তিসাধন করিলেন।

সকল শেষ হইল। গতাসু পতির দেহনিঃসৃত রুধিরস্রোতে তেজস্বিনী প্রমরপত্নীর সমস্ত বিদ্বেষ, সমস্ত ক্রোধের চিহ্ন মুছিয়া গেল। এখন তাঁহার প্রশান্ত হৃদয়ে আবার সেই পতিপ্রেম, পতির প্রতি সেই অনুরাগের সঞ্চার হইল। বীরনারী পতির সহগমনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। বেইগুরাজ, দুহিতার এই অভিপ্রায়ে বাধা দিলেন না। ব্রাহ্মণী ও চম্বলের সঙ্গমস্থলে চিতা সজ্জিত হইল। রাজপুতবালা প্রফুল্লহৃদয়ে মৃত পতির পার্শ্বে শয়ন করিলেন। বেইগুরাজ স্বহস্তে সেই চিতা প্রজ্বলিত করিলেন। দেখিতে দেখিতে প্রমররাজের সহিত প্রমরপত্নীর প্রফুল্ল কমলদলের ন্যায় কমনীয় দেহ ভস্মরাশিতে পরিণত হইল। তেজস্বিনী ক্ষত্রিয়-নারী এইরূপ কঠোর ভাবে অপমানের প্রতিশোধ লইয়া, শেষে প্রশান্ত-ভাবে পরলোকে পতির অনুগমন করিলেন।

বীরনারী।

(শিহ্লাদিরাজ দুহিতা)

খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দী অতীত হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দী জগতের পরিবর্ত্তনশীলতা দেখাইতে বিশ্বসংসারে পদার্পণ করিয়াছে। এ সময়ে ভারতবর্ষে মুসলমান অধিপতিগণের আধিপত্য ক্রমে বদ্ধমূল হইয়াছে,

লোদীবংশীয় রাজাদিগের পর মোগলবংশীয় রাজগণ ভারতে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিতেছেন। পঞ্জাব হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত মোগলের জয়-পতাকা উড়িতেছে। বঙ্গে, গুজরাটে, মধ্যভারতবর্ষে মুসলমানের আধি-পত্য প্রসারিত হইয়াছে। প্রথম মোগল সম্রাট্ বাবর শাহের পরলোক-প্রাপ্তির পর হুমায়ূন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। ভারতের স্বাধীনতা পরিবর্ত্তনশীল সময়ের স্রোতে ধীরে ধীরে ভাসিয়া যাইতেছে। এই দুঃখাবহ সময়ে একটি বীরনারী অপূর্ব্ব তেজস্বিতা দেখাইয়াছেন। শত্রুবেষ্টিত পুরীতে শত্রুর সম্মুখে অম্লানভাবে আত্মবিসর্জ্জনপূর্ব্বক স্বাধীনতার সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন।

গুজরাটে হিন্দুরাজত্বের উচ্ছেদ হইলে, মুসলমানদিগের আধিপত্যের সূত্রপাত হয়। যখন হুমায়ূন দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তখন বাহাদুর শাহ গুজরাটে আধিপত্য করিতেছিলেন। খ্রীঃ ১৫২৮ অব্দে বাহা-দুর শাহ বহ্রার বা বেরারের মুসলমান অধিপতির সাহায্যার্থে অহমদনগ-রের অধিপতি নিজাম শাহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। যুদ্ধযাত্রায় তাদৃশ ফললাভ হয় নাই। অহমদনগরের অধিপতি নামমাত্র অধীনতা স্বীকার করেন, কিন্তু কার্য্যে আপনার স্বাধীনতা সর্ব্বাংশে অব্যাহত রাখিয়া শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। ইহার তিন বৎসর পরে খ্রীঃ ১৫৩১ অব্দে খন্দেশে বাহাদুর শাহের সহিত নিজাম সাহের সাক্ষাৎ হয়। এবার বাহাদুর নিজামের সম্মান রক্ষা করেন। বাহাদুরের সম্মুখে নিজাম শাহ রাজকীয় উপাধিতে গৌরবান্বিত হয়েন। এই সময়ে রাইসিন্ দুর্গ হিন্দুভূপতির অধিকৃত ছিল। ক্ষত্রিয়রাজ শিহ্লাদি ঐ দুর্গে আধিপত্য করিতেছিলেন। বাহাদুর শাহ হিন্দুভূপতিকে আক্রমণ করেন। শিহ্লাদি মুসলমান ভূপতির হস্তে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েন। কিয়ৎকাল যুদ্ধের পর শিহ্লাদির ভ্রাতা লক্ষ্মণও মুসলমান আক্রমণকারীর অধীনতা স্বীকার করেন। লক্ষ্মণের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, দুর্গ ছাড়িয়া দিলেই শিহ্লাদি

মুক্তি লাভ করিবেন। মুসলমান ভূপতিও লক্ষ্মণের নিকটে এ বিষয়ে ঐরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। আর এই অঙ্গীকারে আশ্বস্ত হইয়া, লক্ষ্মণ যুদ্ধে আর প্রবৃত্ত হইলেন না। দুর্গ মুসলমানের হস্তগত হইল। মুসলমান দুর্গে প্রবিষ্ট হইয়া, অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিল। তাহাদের অঙ্গীকার, তাহাদের প্রতিশ্রুতি, সমস্তই তখন আকাশকুসুমে পরিণত হইল। তাহারা ভৈরবরবে অগ্রসর হইয়া, দুর্গবাসীদিগকে হত্যা করিতে লাগিল। হিন্দুর অবিকৃত রাইসিন্ দুর্গ, হিন্দুনরনারীর শোণিতে রঞ্জিত হইতে লাগিল। লক্ষ্মণ এই আকস্মিক উপদ্রব দর্শনে বিস্মিত হইয়া, মহিলাদিগকে স্থানান্তরিত করিবার জন্যে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। শিহ্লাদির বনিতা তেজস্বিনী দুর্গাবতীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। লক্ষ্মণের দর্শনে দুর্গাবতীর ভ্রূযুগল আকুঞ্চিত হইল, ললাটরেখা বিস্ফারিত হইয়া, কমনীয়তার মধ্যে অপূর্ব্ব তীব্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল। লাবণ্যবতী নারী ক্রোধের আবেগে ঘৃণা ও বিরাগের আবেশে অধীর হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, "এই দুর্গ দুর্ভেদ্য বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। তুমি এরূপ দুর্ভেদ্য দুর্গ অবলীলাক্রমে শত্রুর হস্তে সমর্পণ করিয়াছ। শত্রুর সহিত যুদ্ধ না করাতে তোমার কাপুরুষতা প্রকাশ পাইয়াছে। যে এইরূপে আত্মসম্মানে বিসর্জ্জন দেয়, তুচ্ছ প্রাণ রক্ষার জন্য নীচতার সহিত শত্রুপদানত হয়, আপনার চিরন্তন বংশ-গৌরব অনায়াসে কলঙ্কিত করিয়া তুলে, সেই নীচাশয়, কাপুরুষকে ধিক্। তেজস্বিনী দুর্গাবতী ইহা কহিয়া আপনার প্রাসাদে আগুন দিলেন। দেখিতে দেখিতে করাল অনলশিখা গগনস্পর্শী হইল। দুর্গাবতী অম্লানবদনে অবিকারচিত্তে সাত শত পুরনারীর সহিত সেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া, লোকাতীত তেজস্বিতার পরিচয় দিলেন। এই ঘটনায় লক্ষ্মণের প্রাণে আঘাত লাগিল। তিনি এই তেজস্বিনী নারীর তেজস্বিতা দেখিয়া লজ্জিত হইলেন। লজ্জার সহিত তাঁহার মনে

অপরিসীম ঘৃণা ও বিরাগের সঞ্চার হইল। তিনি মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে তরবারি হস্তে করিয়া, কতিপয় সাহসী অনুচরের সহিত দুর্গরক্ষকদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে সমুদয় শেষ হইল। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে সকলেই সেই দুর্ভেদ্য রাইসিন্ দুর্গে মুসলমানের অস্ত্রাঘাতে অনন্তনিদ্রায় অভিভূত হইলেন। মুসলমান ভূপতি দুর্গ অধিকার করিলেও, দুর্গের গৌরব নষ্ট করিতে পারিলেন না। বীর-নারী দুর্গাবতীর অনন্ত কীর্ত্তিতে রাইসিন্ ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ হইয়া রহিল।

রমণীর শৌর্য্য।

(তারাবাই)

খ্রীঃ ১৪৭৪ অব্দে রায়মল্ল মিবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অসাধারণ বীরত্বে ও পবিত্র চরিত্রে এই রাজপুত ভূপতি রাজস্থানের ইতিহাসে সবিশেষ প্রসিদ্ধ। সংগ্রামসিংহ, পৃথ্বীরাজ ও জয়মল্ল নামে ইঁহার তিনটি পুত্র ছিল। আপনার উদ্ধত প্রকৃতির জন্যে পৃথ্বীরাজ পিতার আদেশে দেশান্তরিত হয়েন। অপর দুইটি পুত্র পিতার নিকটে ছিল। কিন্তু কিছুকাল পরে সর্ব্ব কনিষ্ঠটির আয়ুষ্কাল পূর্ণ হয়। জয়মল্ল ক্ষত্রকুলের অগৌরবকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে উদ্যত হওয়াতে, একজন তেজস্বী ক্ষত্রিয়ের অসির আঘাতে মানবলীলার সংবরণ করেন।

শোলাঙ্কীবংশীয় রাও শূরতনের অস্ত্রাঘাতে জয়মল্ল নিহত হইয়াছেন। অবৈধ উপায়ে পবিত্র রাজস্থানকুসুম, সুন্দরী তারাবাইর পাণিগ্রহণে উদ্যত হওয়াতে তাঁহার ঐরূপ শাস্তি হইয়াছে। পরাক্রান্ত রায়মল্ল

ক্ষত্রকুলকলঙ্ক পুত্রের হত্যাকারীকে সমুচিত পারিতোষিক দিয়াছেন। শূরতন মিবারের অধিপতির পুত্রকে নিহত করিয়া রাজপ্রাসাদস্বরূপ বেদনোর জনপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন *। ক্রমে এই কথা চারিদিকে প্রচারিত হইল। ক্রমে চারণগণ এই অপূর্ব্বকাহিনী মধুর গীতিকায় নিবদ্ধ করিয়া নানা স্থানে গাইয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্রমে পৃথ্বীরাজ এই কথা শুনিতে পাইলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যে বিষয় লাভ করিতে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছেন, তিনি এখন সেই বিষয় অধিকার করিতে উদ্যত হইলেন। পৃথ্বীরাজ বেদনোরে যাইয়া রাও শূরতনের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি টোডা অধিকার করিয়া, রাও শূরতনকে উহার আধিপত্য দিবেন। যদি এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না হয়, যদি তাঁহার বাহুবলে পাঠানেরা পরাজয় স্বীকার না করে, তাহা হইলে তিনি কখনও প্রকৃত ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিবেন না।

তেজস্বিনী তারাবাই তেজস্বী পৃথ্বীরাজের অসাধারণ সাহস ও পরাক্রমের কথা শুনিয়াছিলেন। এখন সেই সাহসী ও পরাক্রমশালী যুবককে উপস্থিত দেখিয়া, তারাবাই তাহার অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হইতে সঙ্কল্প করিলেন। অবিলম্বে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন হইল। তারাবাই পিতার অনুমতি লইয়া, পৃথ্বীরাজের সহিত যুদ্ধে যাইতে উদ্যতা হইলেন।

মহরমের দিন। ধর্ম্মরত মুসলমানগণ আপনাদের ধর্ম্মসম্মতকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। দলবদ্ধ মুসলমানের শোক-সঙ্গীত চারি দিকে উদ্‌ঘোষিত হইতেছে। পৃথ্বীরাজ এই দিনে তারাবাই ও পাঁচ শত অশ্বারোহীর সহিত টোডা অধিকার করিতে যাত্রা করিলেন। সকলে টোডায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, মহরমের তাজিয়া চকে সন্নিবেশিত হইতেছে। ইহা দেখিয়া পৃথ্বীরাজ, অশ্বারোহী সৈনিকদল দূরে

* প্রথম খণ্ড আর্য্যকীর্ত্তির ৫-৯ পৃষ্ঠায় এই বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

রাখিয়া জুরাবাই ও আপনার চিরসহচর সেনগড়াধিপতিকে সঙ্গে লইয়া, সেই তাজিয়ার সমভিব্যাহারী লোকদিগের সঙ্গে মিশিলেন। এই সময়ে তাজিয়া পাঠানরাজ লিল্লার প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল। লিল্লা তাজিয়ার সঙ্গে যাইবার জন্যে পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছিলেন। সহসা তিনটি অপরিচিত অশ্বারোহীকে তাজিয়ার সঙ্গী লোকের মধ্যে দেখিয়া, তিনি যেমন তাঁহাদের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, অমনি পৃথ্বীরাজ ও তারাবাইর নিক্ষিপ্ত বাণ তাঁহার বক্ষঃস্থল ভেদ করিল। পাঠানরাজ বিচেতন হইয়া প্রাসাদতলে পতিত হইলেন। আর তাঁহার চেতনা হইল না। এই আকস্মিক ব্যাপার দর্শনে সমবেত পাঠানেরা ভীত হইয়া কোলাহল করিয়া উঠিল। ইহার মধ্যে বীরপুরুষযুগল ও বীরবালা অশ্বারোহণে তড়িদ্বেগে নগরদ্বারে উপনীত হইলেন। এই স্থানে একটি প্রকাণ্ড হস্তী তাঁহাদের নির্গমপথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তেজস্বিনী তারাবাই কিছুমাত্র কর্ত্তব্যবিমুখ হইলেন না। তিনি বিপুল সাহসে আপনার তরবারি দ্বারা হস্তীর শুণ্ড বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। হস্তী যন্ত্রণায় অধীর হইয়া পলায়ন করিল। বীরবালার অসাধারণ বীরত্বে নির্গমদ্বার বিমুক্ত হইল। অনন্তর তাঁহারা অগ্রসর হইয়া আপনাদের অশ্বারোহী সৈনিকগণের সহিত মিশিলেন।

অবিলম্বে আফগানেরা দলবদ্ধ হইয়া, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু তাহারা রাজপুত সৈন্যের পরাক্রম সহিতে পারিল না। তারাবাই এই যুদ্ধে পরাক্রমের একশেষ দেখাইলেন। তিনি অশ্বারোহণে বিদ্যুদ্বেগে বিপক্ষদলে প্রবেশ করিয়া, শত্রুসংহারিণী শক্তির পরিচয় দিতে লাগিলেন। এই মহাশক্তিতে পাঠানেরা পরাজিত হইল। অনেকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। অনেকে যুদ্ধক্ষেত্রে বিপক্ষদিগের অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া দেহত্যাগ করিল। টোডায় রাজপুতের বিজয়পতাকা উড়িতে লাগিল। বীরপুরুষের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল। পৃথ্বী-

রাজা রাও শূরতনকে টোডার আধিপত্য দিলেন। শূরতন পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে উদাসীন হইলেন না। তিনি যথাবিধানে পৃথ্বীরাজের হস্তে তারাবাইকে সমর্পণ করিলেন। সুন্দরে সুন্দরে মিলন হইল। তেজস্বিনী রাজপুতকুমারী তেজস্বী বীরপুরুষের সহধর্ম্মিণী হইয়া, রাজস্থানের গৌরব বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।

পৃথ্বীরাজ মিবারে যাইয়া নব পরিণীতা বনিতার সহিত কমলমীর প্রাসাদে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তিনি ইহার পর অনেকস্থানে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই সকল যুদ্ধে তারাবাই তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে বিমুখ হয়েন নাই। বীররমণী সর্ব্বদা তেজস্বিতা দেখাইয়া, বীরভূমি মিবারের গৌরব রক্ষা করিতেন। কিন্তু দম্পতি দীর্ঘকাল এ নশ্বর সংসারে একত্র থাকিতে পারিলেন না। দুরন্ত শত্রু ইঁহাদের পার্থিব সুখের ব্যাঘাত জন্মাইল। সিরোহীরাজ প্রভুরাওর সহিত পৃথ্বীরাজের ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিল। সিরোহীপতি স্ত্রীর সহিত সদ্ব্যবহার করিতেন না। এজন্যে পৃথ্বীরাজ সিরোহীতে যাইয়া প্রভুরাওকে শাসন করেন। ক্ষত্রকুলাঙ্গার প্রভুরাও এই অপমানের প্রতিশোধের নিমিত্ত আপনাদের চিরন্তন ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইতে সঙ্কুচিত হইলেন না। তিনি স্বয়ং বিষমিশ্রিত খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিলেন। বিদায় সময়ে পৃথ্বীরাজের হস্তে সেই খাদ্যসামগ্রী সমর্পিত হইল। পৃথ্বীরাজ দুরন্ত চক্রীর চক্রান্ত বুঝিতে পারিলেন না। তিনি সেই হলাহলময় খাদ্য লইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। দূর হইতে কমলমীর প্রাসাদ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তখন পৃথ্বীরাজ আহ্লাদের সহিত সেই বিষমিশ্রিত সামগ্রী ভোজন করিলেন। ক্রমে তাঁহার শরীর অবশ হইল। মামাদেবীর মন্দিরের নিকটে আসিয়া তিনি আর চলিতে পারিলেন না। তখন বুঝিতে পারিলেন যে, তীব্র হলাহলে তাঁহার দেহ অবসন্ন হইয়াছে। মৃত্যু আসন্ন জানিয়া, পৃথ্বীরাজ প্রণয়িনীর নিকটে সংবাদ পাঠাইলেন।

কিন্তু তারাবাইর উপস্থিতির পূর্ব্বেই তাঁহার প্রাণবায়ুর অবসান হইল। তারাবাই আসিয়া দেখিলেন, প্রিয়তম স্বামী লোকান্তরিত হইয়াছেন। তখন তিনি তাঁহার সহিত পরলোকে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। অবিলম্বে চিতা সজ্জিত হইল। পতিপ্রাণা রমণী সেই মামাদেবীর পবিত্র মন্দিরের নিকটে আপনার আদরের ধনকে পার্শ্বে রাখিয়া, ধীরভাবে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন।

দেবীরের যুদ্ধ।

মিবারের অদ্বিতীয় বীর—স্বাধীনতার অদ্বিতীয় উপাসক প্রতাপসিংহ দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার অনন্ত কীর্ত্তিকাহিনী রাজস্থানের নানা স্থানে ঘোষিত হইতেছে। রাজপুতগণ তাঁহাকে দেবতা বলিয়া তৎপ্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অমর সিংহ পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। প্রতাপসিংহ স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে পর্ব্বতে পর্ব্বতে বনে বনে বেড়াইয়াছিলেন; অবলীলাক্রমে দুঃসহ কষ্ট সহিয়া, মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছিলেন; অমরসিংহ বাল্যকাল হইতেই পিতার সঙ্গে থাকিয়া ঐরূপ কষ্টসহিষ্ণু হইয়া উঠেন। তাঁহার বয়স যখন আট বৎসর, তখন হইতেই তিনি দুঃখে, বিপদে, পরিশ্রমে, পিতৃসহচর হয়েন। পিতার মৃত্যু পর্য্যন্ত অমরসিংহ এইরূপ নানা কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন। নানা বিপদে পড়িয়া তিনি অনলস, উদ্‌যোগী ও অধ্যবসায়সম্পন্ন হইয়াছিলেন। পিতৃদেবের অসীম সাহস ও স্বাধীনতার জন্যে সর্ব্বপ্রকার স্বার্থত্যাগ দেখিয়া তাঁহার সাহস বৃদ্ধি পাইয়াছিল; স্বাধীনতাস্পৃহা বলবতী হইয়াছিল, রাজপুতের কঠোর ধর্ম্মপালনে প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল। প্রতাপসিংহ ভাবিয়াছিলেন, অমরসিংহ সৌখীন যুবক,

রাজ্যরক্ষার ক্লেশ তাঁহার সহ্য হইবে না। এই জন্যে তিনি মৃত্যু সময়ে আপনার আবাসকুটীর লক্ষ্য করিয়া কহিয়াছিলেন,—"হয়ত এই কুটীরের পরিবর্ত্তে বহুমূল্য প্রাসাদ নির্ম্মিত হইবে, আমরা মিবারের যে স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছি, হয় ত তাহা এই কুটীরের সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইবে।" আসন্ন মৃত্যু পিতার এই বাক্য অমরসিংহের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছিল। অমর সিংহ মিবারের সিংহাসন গ্রহণ করিয়া, প্রকৃত রাজধর্ম্ম পালনে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

মিবারের সর্ব্বপ্রধান বৈরী অকবর, প্রতাপসিংহের মৃত্যুর পরে প্রায় আট বৎসর জীবিত ছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে তিনি আর মিবার আক্রমণ করেন নাই। তাঁহার মনোযোগ অন্য দিকে গিয়াছিল। তিনি ঐ আটবৎসর কাল আপনার বিশাল সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলাবিধানে যত্নবান্ ছিলেন। সুতরাং অমরসিংহকে পিতৃবৈরীর বিরুদ্ধে কোনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয় নাই। মিবারে শান্তি বিরাজিত ছিল। অমরসিংহ এই শান্তিময় রাজ্যে শান্তভাবে রাজধর্ম্ম পালন করিতেছিলেন। তিনি অধিকৃত জনপদে শাসনপ্রণালীর উৎকর্ষ সাধন ও ভূমির করনির্দ্ধারণের অভিনব প্রণালীর উদ্ভাবন করেন এবং পেশলহ্রদের তটভূমি একটি সুদৃশ্য প্রস্তরময় অট্টালিকায় শোভিত করিয়া তুলেন। ঐ অট্টালিকা 'অমরমহল' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। প্রকৃতির ঐ রমণীয় রাজ্যে আজ পর্য্যন্ত অমরমহল রাজস্থানের গৌরব বিস্তার করিতেছে।

কিন্তু অমরসিংহ দীর্ঘকাল শান্তিসুখ ভোগ করিতে পারিলেন না। মিবার আবার দুরন্ত মোগলের জিগীষাবৃত্তি উদ্দীপিত করিল। অকবরের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র জাহাঁগীর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। চারি বৎসর কাল তাঁহাকে রাজ্যের গোলযোগনিবারণে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। ইহার পর তিনি পররাজ্য জয়ে মনোযোগী হয়েন। আর্য্যাবর্ত্তের প্রায় সকল জনপদই তাঁহার অধীন হইয়াছিল। সকল জনপদের অধি-

স্বামিগণ তাঁহাকে সমগ্র ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাট্ বলিয়া অভিবাদন করিয়াছিলেন। কেবল মিবার তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে নাই। মিবারের প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপসিংহের পুত্র অমরসিংহ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া বীরধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেন নাই। জাহাঁগীর প্রথমে ঐ রাজ্য অধিকার করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার পিতা যুদ্ধের পর যুদ্ধে যে বিশাল জনপদ বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, অসির পর অসির আঘাতে, যে জনপদের বীরপুরুষদিগকে অনন্তনিদ্রায় অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিলেন, মাসের পর মাসে অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া ও সৈন্য পাঠাইয়া, যাহার অমূল্য স্বাধীনতারত্নের অপহরণে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। জাহাঁগীর এখন আবার সেই জনপদে প্রাধান্যস্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার আদেশে সৈনিকগণ দিল্লীতে সমবেত হইল। তিনি ইহাদিগকে মিবারের অভিমুখে পরিচালিত করিলেন।

এইরূপে মোগল সৈন্য আবার মিবারের দ্বারদেশে উপনীত হইল। পবিত্রাত্মা প্রতাপসিংহ অমরলোকে গমন করিয়াছেন। আজ তাঁহার আবাসভূমি অন্ধকার। কিন্তু এই অন্ধকারময় প্রদেশের দুই এক স্থানে দুই একটি উজ্জ্বল আলোকপ্রভা বিকাশ করিতেছিল। প্রতাপসিংহের মৃত্যুর পর স্বাধীনতাভক্ত বীর্য্যবন্ত রাজপুতেরা আপনাদের বীরত্বমহিমার পরিচয় দিতেছিলেন। ইঁহারা স্বাধীনতার অবমাননা করিলেন না; আত্মাদরের গৌরব খর্ব্ব করিতে উদ্যত হইলেন না; আত্মসম্মানের বিসর্জ্জন দিয়া, আত্মাবমাননার তৃপ্তিসাধনে চেষ্টা পাইলেন না। ইঁহাদের সাহস ও পরাক্রম অটলভাবে রহিল। ইঁহারা প্রতাপসিংহের মহামন্ত্রে উত্তেজিত হইয়া, স্বদেশের স্বাধীনতারক্ষার জন্য আক্রমণকারী মোগলের সমক্ষে অটল গিরিবরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন।

মিবারের ইতিহাসে ১৬০৮খৃঃ অব্দ একটি চিরস্মরণীয় পবিত্র বৎসর। ঐ বৎসরে মিবারের রাজপুতগণ স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে আত্মপ্রাণের উৎসর্গ

করেন। অমরসিংহ মোগল সম্রাটের আদেশের অনুবর্ত্তী হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; মিবারের বীরপুরুষগণ ঐ পবিত্র বৎসরে তাঁহাকে সে বিষয়ে নিরস্ত করিয়া, চিরন্তন মহাপ্রাণতার পরিচয় দেন। সাহসী চন্দাবত-কুলতিলক ঐ পবিত্র বৎসরে আসন্নমৃত্যু প্রতাপ-সিংহের মহৎ উপদেশের অনুসরণে স্বদেশীদিগকে উত্তেজিত করেন; অমরসিংহ ঐ পবিত্র বৎসরে মিবারের তেজস্বী যুদ্ধবীরগণের অপূর্ব্ব তেজস্বিতা দেখিয়া আপনার পূর্ব্বতন সঙ্কল্পের জন্য বিরাগ ও অনুতাপের সহিত মহিমাময় বংশের গৌরব-রক্ষার্থে অগ্রসর হয়েন। ১৬০৮ খ্রীঃ অব্দে দেবীর নামক স্থানে মোগলের সহিত রাজপুতের যুদ্ধ হয়। মোগলসৈন্য ঐ স্থানে প্রবেশ করিলে, সাহসী রাজপুতেরা তাহাদিগকে আক্রমণ করে। বহুক্ষণ যুদ্ধ হয়, বহুক্ষণ রাজপুতগণ ঐ স্থানে গিরি-শ্রেষ্ঠের ন্যায় অটলভাবে দাঁড়াইয়া অসামান্য বীরত্বের পরিচয় দেয়। পরিশেষে মোগলের পরাজয় হয়। দেবীরের যুদ্ধস্থলে রাজপুতের বিজয়পতাকা অনন্তগগনে উড্ডীন হইয়া, রাজস্থানে অনন্ত মহিমার বিকাশ করে।

রাণা অমরসিংহের পিতৃব্য সাহসী কর্ণের পরাক্রমে এই যুদ্ধে রাজপুতদিগের জয়লাভ হয়। এই বীরপুরুষের সন্তানগণ অতঃপর কর্ণাবত নামে প্রসিদ্ধ হয়েন। সাহসী কর্ণের বীরত্বে বীরভূমি এক সময়ে এইরূপ গৌরবান্বিত হইয়াছিল। বাহুবলদৃপ্ত মোগলেরা এক সময়ে এই বীরপুরুষের বীরত্বগরিমায় পরাজিত হইয়া, রাজপুতের সহিত সন্ধিবন্ধনে অগ্রসর হইয়াছিল।

বীরবল।

১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে অকবর শাহ যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, ভারতের জনপদের পর জনপদ যখন অকবরের অধীন হইতে থাকে, মোগলের বিজয়িনী শক্তি যখন ক্রমে সম্প্রসারিত হয়, তখন এক জন ভাট মধুরকণ্ঠে মধুর সঙ্গীত গাইতে গাইতে যমুনার তীরবর্ত্তী কালী নগর হইতে দিল্লীতে সম্রাট্ সমীপে উপনীত হয়েন। সুকণ্ঠ ভাটের মনোহর সঙ্গীত শুনিয়া, দিল্লীর সম্রাট পরিতুষ্ট হইলেন। ক্রমে দিল্লীতে এই ভাটের কবিত্বশক্তি পরিস্ফুট হইতে লাগিল। ভাট গীতিকবিতা রচনা করিয়া, ক্রমে দিল্লীর লোকের প্রিয় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সঙ্গীতনৈপুণ্যে, তাঁহার মোহিনী কবিত্বশক্তিতে, দিল্লীর অধিবাসীগণ সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। সম্রাট এই প্রতিভাশালী সঙ্গীতনায়কের সঙ্গীতমহিমার অসম্মান করিলেন না। তিনি আগন্তুক ভাটকে "কবিরায়" উপাধি দিয়া আপনার সভায় রাখিলেন।

কবিরায় এইরূপে সম্রাটের প্রিয়পাত্র হইয়া, দিল্লীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ১৫৭৩ খ্রীঃ অব্দে আবার তাঁহার সৌভাগ্যের সূত্রপাত হইল। সম্রাট তাঁহাকে "রাজা" উপাধি দিলেন। এই অবধি ভাটের পূর্ব্বতন নাম পরিবর্ত্তিত হইল। অভিনব রাজা এই অবধি বীরবল বা বীরবর নামে প্রসিদ্ধ হইলেন।

বীরবল জাতিতে ব্রাহ্মণ। তিনি বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত কোন জনপদে বাস করিতেন। তাঁহার পূর্ব্বতন নাম মহেশ দাস। কেহ কেহ তাঁহাকে ব্রাহ্মণদাস নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন।

এই সময়ে কাঙ্গড়ার অধিপতি জয়চাঁদ কোন অপরাধে দিল্লীতে কারারুদ্ধ ছিলেন। সম্রাট তাঁহার রাজ্য বীরবলকে দিতে অনুমতি

করিলেন্। জয়চাঁদের তেজস্বী পুত্র অকৃবরের নিকট অবনতি স্বীকার করিলেন না। তিনি পিতৃরাজ্য রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল না। অকৃবরের আদেশে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা হুসেনকুলি খাঁ কাঙ্গড়া আক্রমণ ও অধিকার করিলেন। যাহা হউক, রাজা বীরবল রাজ্য গ্রহণ করেন নাই। তিনি কলিঞ্জরের নিকটে এক জায়গীর প্রাপ্ত হয়েন। সম্রাট এই সময়ে তাঁহাকে সহস্র সৈন্যের অধিনায়ক করেন।

ভাট মহেশদাস এখন "রাজা" উপাধি পরিগ্রহ করিয়া, সহস্রপরিমিত সৈন্যে অধিনায়ক হইলেন; যিনি এক সময়ে চারণদলের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন, সঙ্গীত যাহার উপজীবিকার বিষয় ছিল, তিনি এখন সহস্রপতি হইয়া দুরূহ রাজকীয় কার্য্যে আত্মক্ষমতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। রাজা বীরবল প্রায়ই সম্রাটের সঙ্গে থাকিতেন। যখন অকৃবর গুজরাটে যাত্রা করেন, তখন বীরবল তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া, সমরনৈপুণ্যের পরিচয় দেন। কোন স্থানে কোন গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হইলে, সেই কার্য্য-সম্পাদনের ভার অনেক সময়ে বীরবলের প্রতি সমর্পিত হইত। বীরবল কর্ত্তব্যপালনে অনলস ছিলেন। সাহসে, ক্ষমতায় ও তেজস্বীতায় তিনি অনেক স্থলেই কৃতকার্য্য হইতেন। কথিত আছে, তাঁহার কথায় অকৃবরের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত হয়। অকৃবর হিন্দুধর্ম্মের অনেক ব্যবস্থায় শ্রদ্ধাবান্ হয়েন।

১৫৮৬ খ্রীঃ অব্দে আফগানেরা সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এজন্যে কাবুলের সেনাপতি জৈন খাঁ সম্রাটের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করেন। রাজা বীরবল ঐ সাহায্যকারী সৈনিকদলের অধিনায়ক হইয়া কাবুলে প্রেরিত হয়েন। যুদ্ধে অকৃবরের সৈনিকদলের পরাজয় হয়। আফগানেরা পার্ব্বত্য প্রদেশের চারিদিক্ হইতে সম্রাটের সৈন্য আক্রমণ করিয়াছিল। ইহাতে সৈনিকগণ শৃঙ্খলাশূন্য হইয়া পড়ে।

বীরবল ও জৈন খাঁ অতিকষ্টে পশ্চাৎ হটিয়া, আর এক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। আফগানেরা রাত্রিকালে আবার ঐ শিবির আক্রমণ করে। সম্রাটের অনেক সৈন্য এজন্যে দুর্গম গিরিসঙ্কটে প্রবিষ্ট হয়। আফগানেরা অনেককে নিহত করে; এই সঙ্গে রাজা বীরবলও নিহত হয়েন।

বীরবলের মৃত্যুসংবাদে অকৃবর যারপর নাই শোকাতুর হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃতদেহ না পাওয়াতে অকৃবরের কষ্ট দ্বিগুণ হইয়াছিল। কথিত আছে, এই শোচনীয় সংবাদে পাছে অকৃবর একেবারে জ্ঞানশূন্য হয়েন, এই আশঙ্কায় কেহ কেহ অকৃবরের নিকটে প্রকাশ করিয়াছিল যে, বীরবল নিহত হয়েন নাই। তিনি সন্ন্যাসিবেশে কাঙ্গড়ায় অবস্থিতি করিতেছেন। অকৃবর ঐ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, অনুসন্ধান করিতে আদেশ দেন। কিন্তু শেষে ঐ কথা অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। পরে বীরবল কলিঞ্জরে বাস করিতেছেন বলিয়া, আর একবার জনরব উঠে। এ জনরবেও অকৃবরের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, বীরবল জীবিত আছেন। অকৃবর কলিঞ্জরেও বীরবলের অনুসন্ধান করেন। রাজা বীরবল সম্রাটের কিরূপ প্রিয়পাত্র ছিলেন, তাহা ইহাতে পরিস্ফুট হইতেছে।

লাল নামে বীরবলের একটি পুত্র ছিল। কিন্তু পুত্র পৈতৃক গুণের অধিকারী হইতে পারেন নাই। লাল পিতার উপার্জ্জিত সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলেন। শেষে তাঁহার মনে বিরাগের সঞ্চার হয়। তিনি সন্ন্যাসীর বেশ পরিগ্রহপূর্ব্বক সংসারের বিলাসিতা ও সৌখীনতা হইতে বিদায় হয়েন। বীরবর ফতেপুরসিক্রিতে অবস্থিতি করিতেন। এই স্থলে তাঁহার আবাসগৃহ অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অসাধারণ সাহস।

(কিশোরসিংহের প্রভুভক্ত সৈন্য)

উনবিংশ শতাব্দী ধীরে ধীরে অসীম কালের পরিবর্ত্তনশীলতা দেখাইতে উপস্থিত হইয়াছে। ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের নানা স্থানে ব্রিটিশশাসন বদ্ধমূল হইতেছে। ব্রিটিশ কোম্পানী ভারতসাম্রাজ্যের রাজনীতির পর্য্যালোচনায় নিযুক্ত হইয়াছেন। গবর্ণর জেনেরল্ মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস্ ভারতের শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার শাসনে পিণ্ডারী দস্যুদিগের অধঃপতন হইয়াছে, নেপালের পার্ব্বত্যপ্রদেশে ব্রিটিশসিংহের বিজয়িনী শক্তির বিকাশ হইয়াছে, মারাঠাদিগের পরাক্রম খর্ব্ব হইয়া আসিয়াছে। লর্ড হেষ্টিংস্ ভারতের উত্তরে ও দক্ষিণে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে, সর্ব্বত্র ইংরেজের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের শ্রাবণ মাস। মহারাও কিশোরসিংহ কোটার সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছেন। নগরের চারিদিকে আমোদের স্রোত অবিচ্ছেদে বহিতেছে। হস্তী, ঘোটক প্রভৃতি নানাবেশে সজ্জিত হইয়া, রাজসভার একদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অশ্বারোহী সৈন্য যুদ্ধবেশ পরিগ্রহ করিয়া, অপূর্ব্ব বীরত্বমহিমার পরিচয় দিতেছে। মহারাও কিশোরীসিংহ সুসজ্জিত সভাতলে রত্নমণ্ডিত সিংহাসনে বসিয়া গবর্ণর জেনেরলের প্রতিনিধির সমক্ষে রাজধর্ম্মের পালনে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। হরকুলসম্ভূত বীর্য্যবন্ত রাজপুতদিগের জয়ধ্বনিতে পুণ্যভূমি হরবতী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু এই আমোদ দীর্ঘকাল থাকিল না। যে প্রীতির উচ্ছ্বাসে কোটার অধিবাসিগণ আপনাদের অভিনব রাজার প্রতি আদর দেখাইয়াছিল, সে প্রীতি দীর্ঘকাল কোটায় শান্তিসুখ অব্যাহত রাখিতে

পারিল না। কিছুকাল পরে রাজ্যে নিদারুণ অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। কোটার প্রধান সচিব রাজরাণা জলিমসিংহের সহিত কিশোরী-সিংহের বিরোধ ঘটিল। জলিমসিংহ কিশোরীসিংহের পিতা উমেদ-সিংহের অভিভাবকস্বরূপ ছিলেন। রাজ্যশাসনের অনেক ভার তাঁহার হস্তে সমর্পিত ছিল। এখন এই বর্ষীয়ান্ অমাত্য ও মহারাও কিশোরী-সিংহের মধ্যে অসদ্ভাব জন্মিল। পূর্ব্বতন প্রীতি ও একতার স্থলে দুর্নিবার বিদ্বেষ ও অনৈক্য স্থান পরিগ্রহ করিল। এখন উভয়েই উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া যুদ্ধস্থলে উপনীত হইলেন। গুরুতর আত্ম-বিগ্রহে হরবতী নরশোণিতে রঞ্জিত হওয়ার উপক্রম হইল।

একদা প্রভাতসময়ে জলিমসিংহের সৈন্য একটি ক্ষুদ্র নদীর তটদেশ দিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী মহারাওর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছে। তটভূমি অতি উচ্চ, সমুন্নত পর্ব্বতের ন্যায় লম্বভাবে আকাশের দিকে উঠিয়াছে। ঐ উন্নত তটভূমি দিয়া, প্রায় আট হাজার সৈন্য কুড়িটি কামান লইয়া, ধীরে ধীরে যাইতেছে। অকস্মাৎ ইহাদের গতিরোধ হইল। নদীর তটভূমির অদূরবর্ত্তী প্রান্তরের একটি উন্নত মৃত্তিকাস্তূপ হইতে গুলির উপর গুলি আসিয়া অগ্রবর্ত্তী সৈনিকদলে পতিত হইতে লাগিল। গুলিবৃষ্টির বিরাম নাই। গুলি আসিয়া অগ্রবর্ত্তী সৈন্যের অনেককে আহত করিল; অনেককে সেই ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর উন্নত তটভূমিতে চিরনিদ্রিত করিয়া রাখিল। সৈনিকদল বিস্ময়বিস্ফারিত-নেত্রে মৃত্তিকাস্তূপের দিকে দেখিল, দুইটি বীরপুরুষের বিক্রমে তাহাদের গতিরোধ হইয়াছে। বীর-দ্বয় একটি মৃত্তিকাস্তূপের পশ্চাতে থাকিয়া বন্দুকে গুলি পুরিয়া দিতেছে, অপরটি অব্যর্থ সন্ধানে গুলিবৃষ্টি করিয়া, অরাতি-পক্ষ নিপাত করিতেছে। এক দিকে আট হাজার সৈন্য ও কুড়িটি কামান, অপর-দিকে কেবল দুইটি মাত্র বীরপুরুষ। বীরযুগলের পরাক্রমে এতগুলি সৈন্যের গতিরোধ হইয়াছে, এতগুলি সৈন্য ইহাদের গুলির আঘাতে

অস্ত্রহস্ত হইয়া নদীতটে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই বীরযুগল মহারাও কিশোরীসিংহের প্রভুভক্ত সৈন্য—পুণ্যভূমি হরবতীর হরকুলসম্ভূত ক্ষত্রিয়। এই প্রভুভক্ত ক্ষত্রিয়বীরদ্বয় আপনাদের প্রভুভক্তির নিদর্শন দেখাইতে বহুসংখ্য সৈন্যের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, অপূর্ব্ব বীরত্বের পরিচয় দিতেছে।

বীরযুগলের তেজস্বিতার গতিরোধে অসমর্থ হইয়া, বিপক্ষগণ তাহাদের সম্মুখে দুইটি কামান স্থাপিত করিল। কামানের ধ্বনি শুনিবামাত্র বীরদ্বয় সেই উন্নত মৃত্তিকাস্তূপের শিখরদেশে দাঁড়াইল; অসীম-সাহসে, গম্ভীরভাবে আপনাদের তেজস্বিতার সমুচিত সম্মানের জন্যে বিপক্ষদিগকে অভিবাদন করিল। বিপক্ষ সৈনিকদল হইতে গুলিবৃষ্টি হইতে লাগিল। গুলির আঘাতে বীরযুগলের দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়া উঠিল। সাহসী ক্ষত্রিয়দ্বয় আহত হইয়াও, শত্রুসংহারে নিরস্ত থাকিল না। যদিও ইহাদের আক্রমণে বিপক্ষদল সবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, তথাপি সেই সৈনিকদলের অধিনায়কগণ অসামান্য বীরত্ব ও সাহসের জন্যে ইহাদিগকে জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করিলেন। অবিলম্বে গুলিবৃষ্টি বন্ধ করিতে আদেশ প্রচারিত হইল। সৈনিকদল আদেশ পালন করিয়া, ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। সৈনিকদিগকে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল যে, দুইজন মাত্র সৈন্য আক্রমণকারী বীরদ্বয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে। এই আদেশ শুনিবামাত্র দুই জন তরুণবয়স্ক রোহিলা অগ্রসর হইল। বীরযুগল গুলির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল। অবিরত শোণিতস্রাবে তাহাদের শক্তি ক্ষীণতর হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা এই আক্রমণ নিরস্ত করিতে পারিল না। অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়া, সেই উন্নত মৃত্তিকাস্তূপের উপরে উভয়ে পড়িয়া গেল। আর তাহাদের চেতনার সঞ্চার হইল না। তেজস্বী বীরদ্বয় ধীরভাবে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া অসাধারণ তেজস্বিতার পরিচয় দিল। উনবিংশ শতাব্দীতে

হরবতীর হরগণ এইরূপ সাহসসম্পন্ন ছিল, এবং এইরূপ সাহস ও বীরত্ব দেখাইয়া, আপনাদের জন্মভূমি বীরত্ব-কীর্ত্তিতে গৌরবান্বিত করিয়াছিল।

মহারাষ্ট্রের মহাশক্তি।

(শিবাজী)

মোগলসাম্রাজ্য যখন উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হয়, আওরঙ্গজেবের কঠোর শাসনে যখন ভারতের উত্তরে ও দক্ষিণে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে, সর্ব্বত্র লোকের হৃদয়ে ভীতি ও আতঙ্ক প্রসারিত হইয়া উঠে, স্বাধীনতার প্রধান উপাসক, তেজস্বিতার অদ্বিতীয় অবলম্বন, সাহসের একমাত্র আশ্রয় রাজপুতগণ যখন মোগলের অনুগত হয়েন, তখন ভারতের দক্ষিণপ্রান্তে পশ্চিমশৈলমালাপরিবৃত ক্ষেত্রে একটি মহাশক্তি ধীরে ধীরে সকলের হৃদয়ে গভীর বিস্ময়ের উৎপত্তি করে। ক্রমে ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাট্ ইহার বিক্রমে কম্পিত হয়েন, ক্রমে ইহা একই উৎসাহ ও তেজস্বিতার স্রোতে দক্ষিণাপথ হইতে আর্য্যাবর্ত্ত পর্য্যন্ত সমগ্র জনপদ ভাসাইয়া দেয়। এই মহাশক্তি হিন্দুরাজচক্রবর্ত্তী ভবানীভক্ত শিবাজী।

শিবাজী বীরত্বের প্রদীপ্ত মূর্ত্তি, স্বাধীনতার অদ্বিতীয় আশ্রয়ক্ষেত্র। যখন শিবাজীর আবির্ভাব হয়, তখন ভারতের পূর্ব্বতন বীরত্ববৈভব ধীরে ধীরে সময়ের অনন্ত স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল; যাঁহারা এক সময়ে সাহসে ও বীরত্বে প্রসিদ্ধ ছিলেন, বীরেন্দ্রসমাজের বরণীয় হইয়া, অনন্ত কীর্ত্তিসঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সন্তানগণ পরাধীনতানিগড়ে ক্রমে

দৃঢ়বদ্ধ হইতেছিলেন এবং স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিয়া, পরের আনুগত্য স্বীকারই যেন, আপনাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতে ছিলেন; যে তেজস্বিতায় পৃথ্বীরাজ তিরৌরী ক্ষেত্রে অজেয় হইয়াছিলেন, সমরসিংহ আত্মপ্রাণ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, ভৈরবরবে বিধর্ম্মী শত্রুর সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন, শেষে প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপসিংহ দীর্ঘকাল প্রবল পরাক্রম, সহায়সম্পন্ন শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিয়া বিজয়লক্ষ্মীতে পরিশোভিত হইয়াছিলেন, তখন সে তেজস্বিতা ও স্বাধীনত্বপ্রিয়তা ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছিল। অনৈক্যপ্রযুক্ত বীর্য্যবন্ত রাজপুতেরা ক্রমে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছিলেন, এবং মুসলমানের অধীন হইয়া, আপনাদের শোচনীয় অধঃপতনের ফলভোগ করিতেছিলেন। মহা-পরাক্রম শিবাজী এই অনৈক্য দূর করেন. এবং জাতিপ্রতিষ্ঠার সূত্রপাত-পূর্ব্বক দক্ষিণাপথে একটি মহাজাতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলেন। ইঁহার মহামন্ত্রে অজেয় মোগল সাম্রাজ্য বিনষ্ট হয়, বিজয়ী মুসলমান বিজিত হিন্দুর পদানত হইয়া পড়ে।

ভারতমানচিত্রের দক্ষিণ পশ্চিম অংশে শৈলমালাপরিবৃত একটি প্রদেশ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ঐ প্রদেশের উত্তরে সাতপুরা পাহাড় গম্ভীরভাবে অবস্থিতি করিতেছে; পশ্চিমে অকূল সমুদ্র তরঙ্গলীলা বিস্তার করিয়া জড়জগতের অসীম শক্তির পরিচয় দিতেছে, পূর্ব্বে বরদা নদী বহিয়া যাইতেছে, এবং দক্ষিণে গোয়া নগর ও অসমতল পার্ব্বত্যভূভাগ অবস্থিত রহিয়াছে। ঐ প্রদেশ মহারাষ্ট্র নামে পরিচিত। উহার পরিমাণ ফল ১,০০,০০০ বর্গ মাইল। মহারাষ্ট্রদেশ মনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে চিরবিভূষিত। উহার অভ্যন্তরে দুরারোহ সহ্যাদ্রি উত্তরে ও দক্ষিণে বিস্তৃত রহিয়াছে। হরিদ্বর্ণ বৃক্ষশ্রেণীতে গিরিবরের অধিকাংশ সুশোভিত। যেন পর্ব্বতশ্রেণীতে প্রকৃতি আপনার সৌন্দর্য্যের অনন্ত ভাণ্ডার সাজাইয়া রাখিয়াছে; না দেখিলে ঐ অনন্ত ভাণ্ডারের

অপূর্ব্ব মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয় না। প্রকৃতির এই মনোহর প্রদেশে অনন্ত জগতের এই সৌন্দর্য্যপূর্ণ ভূখণ্ডে শিবাজীর জন্ম হয়।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে দক্ষিণাপথে অনেক স্থলে মুসলমানদিগের আধিপত্য ছিল। বিজাপুরের মুসলমান অধিপতিগণ সবিশেষ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। শাহজী নামক একজন মহারাষ্ট্রবাসী, ক্ষত্রিয় যুবক বিজাপুরের রাজসরকারে চাকরী করিতেন। ক্রমে বিষয়কর্ম্মে শাহজীর ক্ষমতা পরিস্ফুট হয়; ক্রমে শাহজী বিজাপুরের অধিপতির গননীয় কর্ম্মচারীর শ্রেণীভুক্ত হইয়া উঠেন। তাঁহার বীরত্বে অনেক স্থানে বিজাপুর ভূপতির বিজয়শ্রীলাভ হয়। শাহজী জিজাবাই নামে একটি মহারাষ্ট্ররমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। জিজাবাইয়ের গর্ভে, শাহজীর দুইটি পুত্র জন্মে; প্রথমের নাম শাম্ভজী, দ্বিতীয়ের নাম শিবাজী।

শিবাজী ১৬২৭ খ্রীঃ অব্দের মে মাসে পুণার পঞ্চাশ মাইল উত্তরে শিউনারী দুর্গে জন্মগ্রহণ করেন। দুর্গের অধিষ্ঠাত্রী শিবাই দেবীর নাম অনুসারে জিজাবাই পুত্রের নাম শিবাজী রাখেন। শিবাজী মাতার সহিত শিউনারী দুর্গে অবস্থিতি করেন। শিবাজীর জন্মগ্রহণের তিন বৎসর পরে শাহজী তুকাবাই নামে আর একটি মহারাষ্ট্ররমণীকে বিবাহ করেন। দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করাতে জিজাবাইয়ের সহিত শাহজীর বিরোধ উপস্থিত হয়। এজন্যে শিবাজী প্রায় ছয় বৎসর কাল পিতার দেখা পান নাই। যাহা হউক, শাহজী, দাদোজী কোণ্ডদেব নামক একজন দূরদর্শী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে শিবাজী ও তদীয় মাতার রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুণার জাইগীরের তত্ত্বাবধান জন্যে নিযুক্ত করেন। দাদোজী সাতিশয় ক্ষমতাপন্ন ও রাজস্বসংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি জিজাবাইয়ের জন্য পুণাতে একটি বৃহৎ বাড়ী প্রস্তুত করেন। পুণার ঐ নূতন বাড়ীতে দাদোজী কোণ্ডদেবের তত্ত্বাবধানে শিবাজীর শৈশবকাল অতিবাহিত হয়।

এই সময়ে মহারাষ্ট্রবাসীরা লেখাপড়ায় মনোযোগ দিত না। লেখা পড়া শিক্ষা অপেক্ষা বীরপুরুষোচিত গুণগ্রামে অলঙ্কৃত হইতে তাহাদের সবিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ ছিল। শিবাজী নিজের নাম লিখিতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি তরবারিনিক্ষেপে, তরবারি-প্রয়োগে, বর্শাসঞ্চালনে সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার স্বদেশীয়গণ সুনিপুণ অশ্বারোহী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। শিবাজী এ বিষয়ে স্বদেশের সকলকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। তাঁহার অশ্বচালনাকৌশল দেখিয়া, দর্শকগণ অপরিসীম বিস্ময় ও প্রীতির সহিত তাঁহার গুণগান করিত। দাদোজী শিবাজীকে আপনাদের ধর্ম্মানুগত বিষয়ে আস্থাযুক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রয়াস সর্ব্বাংশে সফল হইয়াছিল। শিবাজী হিন্দুধর্ম্মসম্মত কার্য্যে নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। তিনি মনোযোগের সহিত হিন্দুধর্ম্মের কথা শুনিতেন। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের আখ্যায়িকায় তাঁহার সুখানুভব হইত। বাল্যকাল হইতে কথকতার প্রতি তাঁহার সাতিশয় শ্রদ্ধা ছিল। হিন্দুধর্ম্মের উপর এইরূপ অচলা ভক্তি ও হিন্দুধর্ম্মসম্মত কার্য্যে এইরূপ আন্তরিক শ্রদ্ধা থাকাতে, মহাবীর শিবাজী হিন্দু নামের গৌরব রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা কিছুতেই বিচলিত হয় নাই। শত্রুর ভ্রূকুটিপাতে, বিপদের ঘোরতর অভিঘাতে, তিনি এই প্রতিজ্ঞা হইতে বিচ্যুত হয়েন নাই। শিবাজী জীবনের শেষ সীমা পর্য্যন্ত নির্ভীকহৃদয়ে ও অবিচলিতচিত্তে এই সাধু প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন।

রামায়ণ ও মহাভারতের বীরত্বপূর্ণ কথায় শিবাজীর হৃদয়ে তেজস্বিতার সঞ্চার হইয়াছিল, সাহস বৃদ্ধি পাইয়াছিল, স্বজাতিপ্রিয়তা ও স্বদেশহিতৈষিতা বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়াছিল। শিবাজী মোগলশাসনের মধ্যে হিন্দুরাজত্বের প্রতিষ্ঠায় কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন এবং ধর্ম্মান্ধ মুসলমানের কঠোর নিপীড়নের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের মহীয়সী শক্তির বিকাশ

দেখাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্কল্প ও চেষ্টা বিফল হয় নাই। যখন সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের প্রতাপে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ কম্পিত হইতেছিল, তখন দক্ষিণাপথে শিবাজীর ক্ষমতায় একটি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্বাধীন রাজ্যের স্বাধীনতাভক্ত বীরপ্রবরের অপূর্ব্ব বীরত্বে চিরজয়ী মোগলের বিজয়িনী শক্তি বিলুপ্ত হইয়া আসিয়াছিল। হিন্দুর কীর্ত্তিতে বহুদিনের পর আবার হিন্দুর পবিত্র ভূমি গৌরবান্বিত হইয়াছিল।

শিবাজী মাওয়াল অথবা মাবাল নামক পার্ব্বত্য স্থানের অধিবাসী মাওয়ালী বা মাবালাদিগের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। ইহারা দেখিতে সুশ্রী না হইলেও বিলক্ষণ কার্য্যপটু, সাহসী ও অধ্যবসায়সম্পন্ন ছিল। শিবাজী ইহাদের উপর নির্ভর করিয়া, অনেক স্থানে বিজয়-পতাকা উড্ডীন করেন। তিনি প্রায়ই কহিতেন,—"আমি মুসলমানদিগকে পরাজিত করিয়া স্বাধীন রাজা হইব।" তরুণবয়স্ক বীরপুরুষের এই বাক্য নিষ্ফল হয় নাই। শিবাজী মুসলমানদিগকে পরাভূত করিয়া, স্বাধীন হিন্দুভূপতির সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

ষোলবৎসর বয়সে শিবাজী এমন তেজস্বী ও সাহসী হইয়া উঠিলেন যে, অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষদিগের সহিত সর্ব্বদা পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়াইতে লাগিলেন। এইরূপে স্বদেশের দুর্গম পার্ব্বত্য পথগুলি তাঁহার পরিচিত হইয়া উঠিল। মহারাষ্ট্রে অনেকগুলি গিরিদুর্গ ছিল। শিবাজী কৌশলক্রমে ঐ গিরিদুর্গের অনেকগুলিতে আধিপত্য স্থাপন করিলেন। দুর্গগুলি বিজাপুরের অধিপতির অধিকৃত ছিল। শিবাজী উহা অধিকার করিলে বিজাপুরের রাজার সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। আফজল খাঁ বিজাপুরের সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া, তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তিনি হিন্দুতীর্থের অবমাননা এবং হিন্দু দেবালয় ভঙ্গ করিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই। শিবাজী এই সময়ে রাজগড়ে অবস্থিতি

করিতেছিলেন। তিনি আপনাদের পবিত্র তীর্থের অবমাননায় মর্ম্মাহত হইয়া, আফজল খাঁর দমন জন্য সৈন্যসংগ্রহ পূর্ব্বক রাজগড়ে মাতৃদেবীর চরণ বন্দনা করিয়া প্রতাপগড়ে যাত্রা করেন। তাঁহার সঙ্কল্পসিদ্ধির পক্ষে কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটিল না। সুসময় উপস্থিত হইল। সুসময়ে শিবাজী বিজাপুরের সৈন্যের সম্মুখে প্রাধান্য স্থাপন করিতে কৌশলজাল বিস্তার করিলেন।

জঙ্গলময় দুর্গম গিরিপ্রদেশে সৈন্য লইয়া অগ্রসর হওয়া যে কতদূর কষ্টকর, আফ্জল খাঁ তাহা অবগত ছিলেন। এই বিষয় ভাবিয়া তিনি শিবাজীকে কৌশলক্রমে হস্তগত করিবার জন্যে কালবিলম্ব না করিয়া, গোপীনাথ পন্ত নামক একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকে প্রতাপগড়ে পাঠাইয়া দিলেন। দূত দুর্গের নিম্নস্থিত গ্রামে উপস্থিত হইলে, শিবাজী দুর্গ হইতে নামিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। গোপীনাথ ধীরতার সহিত শিবাজীকে কহিলেন,—“শাহজীর সহিত আফজলখাঁর সবিশেষ বন্ধুত্ব আছে। আফজল বন্ধুর পুত্রের কোনও অপকার করিতে ইচ্ছুক নহেন। তিনি আপনার সহিত শত্রুতা না করিয়া আপনাকে একটি জায়গীরের আধিপত্য দিতে প্রস্তুত আছেন।” শিবাজী সৌজন্য ও বিনয়ের সহিত আফজলখাঁর প্রেরিত দূতকে বলিলেন,—“একটি জায়গীর পাইলেই আমি সন্তুষ্ট হইব; আমি বিজাপুর-ভূপতির একজন সামান্য ভৃত্যমাত্র।” দূত শিবাজীর এইরূপ নম্রতা দেখিয়া, সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর শিবাজী দূতের আবাস জন্য যথাযোগ্য স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহার আদেশে দূতের সহচরগণ কিছু দূরে অন্য স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিল। একদা গভীর নিশীথে শিবাজী গোপীনাথের নিকটে উপস্থিত হইয়া, আপনার পরিচয় দিয়া কহিলেন, “আমি হিন্দুজাতির পরিশুদ্ধ বিশ্বাস ও পবিত্র ভক্তির সম্মান রক্ষার জন্যে সমস্ত কার্য্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি।

ব্রাহ্মণ ও গাভীদিগকে রক্ষা করিতে, পবিত্র দেবমন্দিরের অবমাননা-কারীদিগকে শাস্তি দিতে এবং স্বধর্ম্মবিরোধী শত্রুগণের ক্ষমতার গতি-রোধ করিতে আমার সাতিশয় আগ্রহ আছে। আমি ভবানীর আদেশে এই পবিত্র কার্য্য-সাধনে ব্রতী হইয়াছি। আপনি ব্রাহ্মণ; সুতরাং আমার সাহায্য করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমার আশা আছে যে, স্বদেশীয় ব্রাহ্মণের সহিত আমি পরমসুখে কালাতিপাত করিতে পারিব। শিবাজী ধীরগম্ভীরভাবে ইহা কহিয়া, গোপীনাথকে একখানি গ্রাম ইনাম দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। গোপীনাথ এই তরুণ-বয়স্ক হিন্দুবীরের অসীম সাহস, অলোকসাধারণ দেবভক্তি ও অপরিমেয় স্বদেশ-হিতৈষিতায় মুগ্ধ হইলেন; আর তাঁহার মুখ হইতে শিবাজীর বিরুদ্ধে কোনও কথা বহির্গত হইল না। তিনি ধীরভাবে শিবাজীর কার্য্যসাধনে প্রতিশ্রুত হইলেন; প্রতিজ্ঞা করিলেন, যত দিন জীবন থাকিবে, তত দিন শিবাজীর বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না। শিবাজীর আশা ফলবতী হইল। গোপীনাথ শিবাজীর সাহস, স্বদেশভক্তি ও বাক্‌চাতুর্য্যে মোহিত হইয়া, তাঁহার চিরসহচরের মধ্যে পরিগণিত হইলেন।

অনন্তর শিবাজী কৃষ্ণাজী ভাস্কর নামক একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে নানাবিধ উপহার দ্রব্যসহ গোপীনাথের সহিত আফজল্ খাঁর নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। কৃষ্ণাজী বিজাপুরের সেনাপতির সমক্ষে উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—"শিবাজী তাঁহার সহিত মিত্রতাবন্ধনে সম্মত আছেন; বিজাপুর ভূপতির বিরুদ্ধাচরণে তাঁহার ইচ্ছা নাই।" আফজল্ খাঁ আশ্বস্ত হইলেন। তিনি গোপীনাথের পরামর্শে শিবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে উদ্যত হইলেন। শিবাজী প্রতাপগড় দুর্গের নিম্নে একটি স্থানে সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়া রাখিলেন। তিনি ঐ স্থানের জঙ্গল কাটাইয়া আফজল্ খাঁর আসিবার পথ পরিষ্কার করাইলেন। কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের জঙ্গল পূর্ব্বের ন্যায় রহিল। শিবাজী ঐ জঙ্গলে আপ-

নার সাহসী মাওয়ালী সৈন্য সন্নিবেশিত করিয়া রাখিলেন। বিজাপুরের সৈন্য উহার কিছুই জানিতে পারিল না। পনর শত সৈন্য আফজলখাঁর সঙ্গে আসিতেছিল, কিন্তু গোপীনাথের পরামর্শে ঐ সকল সৈন্য প্রতাপগড় দুর্গের কিয়দ্দূরে অবস্থিতি করিতে লাগিল। আফ্‌জলখাঁ কেবল এক জন মাত্র সশস্ত্র অনুচর লইয়া পাল্কীতে শিবাজীর নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন। পরদিন শিবাজী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাত্রা করিলেন। আফজল্ খাঁর পরিচ্ছদ মোটা মসলিনের ছিল। পার্শ্বদেশে কেবল একখানি তরবারি ঝুলিতেছিল। এদিকে শিবাজী আপনার অভীষ্ট কার্য্য সিদ্ধির জন্যে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তাঁহার দেহ লৌহবর্ম্মে আচ্ছাদিত হইয়াছিল। ঐ বর্ম্মে বৃশ্চিক ও ব্যাঘ্রনখ * সন্নিবেশিত রহিয়াছিল। অপরে না জানিতে পারে এজন্যে তিনি বর্ম্মের উপর পরিষ্কৃত কার্পাসবস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন; এইরূপে সজ্জিত হইয়া, শিবাজী ধীরে ধীরে দুর্গ হইতে নামিয়া, যথোচিত নম্রতার সহিত অভিবাদন করিতে করিতে আফ্‌জল খাঁর সমীপবর্ত্তী হইলেন। আফ্‌জল খাঁর ন্যায় তাঁহার সঙ্গেও একজন সশস্ত্র অনুচর ছিল। যথারীতি অভিবাদনের পর, শিষ্টাচারের অনুবর্ত্তী হইয়া, উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিলেন। অকস্মাৎ আফজল খাঁর ভাবান্তর হইল। অকস্মাৎ আফ্‌জল খাঁ "ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। আলিঙ্গন সময়ে শিবাজী আফজল্ খাঁর উদরে ব্যাঘ্রনখ প্রবেশিত করিয়াছিলেন। যাতনায় অধীর হইয়া আফজল্ খাঁ শিবাজিকে তরবারির আঘাত করিলেন। কিন্তু শিবাজীর কার্পাস বস্ত্রের নিম্নে লৌহবর্ম্ম থাকাতে ঐ আঘাতে কোন ফল হইল না। এই সকল কার্য্য নিমেষমধ্যে ঘটিল। নিমেষমধ্যে শিবাজী অস্ত্রচালনা করিয়া, আফজল খাঁকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিলেন; আফজল্ খাঁর অনুচর ইহা দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিল না। সে

* বৃশ্চিক—বৃশ্চিক সদৃশ বক্র অস্ত্র। ব্যাঘ্রনখ—ব্যাঘ্রনখাকার অস্ত্র।

অবিচলিত ধীরতা ও প্রভূত সাহস সহকারে প্রভুহন্তা শক্রর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। অনুচর এই যুদ্ধে অপরিসীম বীরত্ব দেখাইয়াছিল। কিন্তু কিয়ৎকালমধ্যে তাহারও পতন হইল। এই অবসরে পাল্কীবাহকেরা আফজল খাঁকে লইয়া পলাইতে উদ্যত হইয়াছিল। তাহাদের ঐ উদ্যম সফল হইল না। শিবাজীর কয়েকজন সৈনিক হঠাৎ উপস্থিত হইয়া আফজল্ খাঁর শিরশ্ছেদ করিল। এদিকে ইঙ্গিত প্রাপ্তি মাত্র মাওয়ালীগণ জঙ্গল হইতে বহির্গত হইয়া, একেবারে চারিদিক হইতে বিজাপুরের সৈন্য আক্রমণ করিল। বিপক্ষগণ ইহাদের পরাক্রম সহিতে পারিল না। তাহারা শৃঙ্খলাশূন্য হইয়া পলায়ন করিল। শিবাজী বিজয়ী হইলেন। মহারাষ্ট্রচক্রে তাঁহার অপরিসীম প্রতিপত্তি বদ্ধমূল হইল। তিনি অবিলম্বে বহু সৈন্য ও বহুসম্পত্তির অধিকারী হইয়া উঠিলেন।

যাঁহারা সরলহৃদয়, জীবনের প্রতিকার্য্যে যাঁহারা আপনাদের সরলতার পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহারা এই কার্য্যে ঘোরতর বিশ্বাসঘাতক, পাষণ্ড বলিয়া, শিবাজীকে ধিক্কার দিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা দুর্দ্দান্ত শক্রকে পরাজিত করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষায় উদ্যত হইয়া থাকেন, তাঁহারা অন্যভাবে এ বিষয়ের বিচার করিবেন। যখন মহাবীর পৃথ্বীরাজ স্বদেশের স্বাধীনতারক্ষার্থে বহুসংখ্য সৈন্য লইয়া দৃশদ্বতীর তীরে সমাগত হয়েন, তখন সাহবুদ্দীন গোরী তাঁহার অলোক-সাধারণ তেজস্বিতা ও প্রভূত সৈন্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। সাহবুদ্দীন চাতুরী অবলম্বন করিয়া রাত্রিকালে প্রতিদ্বন্দ্বীর অজ্ঞাতসারে, হিন্দুসৈন্য আক্রমণ না করিলে সহসা পৃথ্বীরাজের পতন হইত না, সহসা ভারতের স্বাধীনতার অন্তর্দ্ধান ঘটিত না। যাঁহারা এইরূপ চাতুরী, এইরূপ প্রবঞ্চনা করিয়া ভারতে আপনাদের আধিপত্য স্থাপনের সূত্রপাত করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত সেইরূপ চাতুরী না করিলে, যে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না, ইহা শিবাজী বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, চতুরের সহিত

চাতুরী না করিলে, তিনি কিছুতেই মুসলমান সাম্রাজ্য অধিকৃত করিয়া হিন্দুরাজ্যের গৌরব করিতে পারিবেন না। যাহারা অপরের অজ্ঞাতসারে আপনাদের দুরাকাঙ্খা চরিতার্থ করিয়াছে, তাহাদের নিকটে সরল ভাবের পরিচয় দিলে কখনও অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। শিবাজী বাল্যকাল হইতে এই নীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন। শিবাজী নিরস্ত্রভাবে উপস্থিত হইলে, সহজে আফ্‌জল খাঁর আয়ত্ত হইতেন; সহজে বিজাপুরের সৈন্য তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিয়া লইয়া যাইত; অথবা আফ্‌জল খাঁর অসির আঘাতে তাঁহার শিরশ্ছেদ হইত। এস্থলে শিবাজীর চাতুরী শিক্ষার ফল সর্ব্বাংশে কার্য্যকর হইয়াছিল। যাঁহারা স্বদেশহিতৈষিতায় উদ্দীপিত হইয়া দুরন্ত ও চতুর শত্রুর অত্যাচারের গতিরোধে উদ্যত হয়েন, তাঁহাদের নিকটে শিবাজীর এই শিক্ষার ফল কখনও অনাদৃত হইবে না।

সহ্যাদ্রির পশ্চিমে সমুদ্র পর্য্যন্ত ভূখণ্ড কোকণ নামে পরিচিত। বিজাপুরের সৈন্যের পরাজয়ের পর কোকণ প্রদেশের অধিকাংশ শিবাজীর হস্তগত হয়। ইহার পর শিবাজী কোকণের পান্‌হালা দুর্গ অধিকার করিতে উদ্যত হয়েন। এই দুর্গ বিজাপুরের অধিপতির অধিকৃত ও দুর্ভেদ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। শিবাজী পান্‌হালা দুর্গ অধিকারেও অপূর্ব্ব কৌশলের পরিচয় দেন। তিনি আপনার কতিপয় প্রধান সেনানায়কের সহিত পরামর্শ করিয়া, ছলপূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত বিবাদ করেন। ইহাতে সেনানায়কগণ অসন্তুষ্ট হইয়াই যেন, আট শত সৈন্যের সহিত শিবাজীর চাকৃরি পরিত্যাগ করিয়া দুর্গাধ্যক্ষের নিকটে উপনীত হয়েন। দুর্গাধ্যক্ষ ইহাদের কৌশল বুঝিতে পারিলেন না। শিবাজীর সহিত ইহাদের অসদ্ভাব হইয়াছে মনে করিয়া, হৃষ্টচিত্তে ইহাদিগকে দুর্গে স্থান দিলেন। এ দিকে শিবাজী অবিলম্বে দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। দুর্গপ্রাচীরের সমান উন্নত কতকগুলি বৃক্ষ প্রাচীর সম্মুখে ছিল। শিবাজীর যে সকল সর্দ্দার দুর্গে স্থান পাইয়াছিলেন, একদা রাত্রিকালে তাঁহারা ঐ

সকল বৃক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক বহির্ভাগ হইতে শিবাজী ও তাঁহার অনুচরদিগকে দুর্গের অভ্যন্তরে লইয়া গিয়া, দুর্গদ্বার খুলিয়া দিলেন। দুর্গ সহজে অধিকৃত হইল।

এইরূপ পুনঃ পুনঃ জয়লাভে শিবাজীর এতদূর প্রতিপত্তি হইল যে, নানাস্থান হইতে হিন্দু সৈনিকপুরুষেরা আসিয়া, তাঁহার দল পরিপুষ্ট করিতে লাগিল। বলবৃদ্ধির সহিত শিবাজী অধিকতর দুরূহ কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইতে লাগিলেন। তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্য মুসলমান ভূপতির অধিকৃত নানা জনপদ লুণ্ঠন করিতে লাগিল। ইহাদের উদ্যম, সাহস ও তেজস্বিতা বিচলিত হইল না। ইহারা দেখিতে দেখিতে বিজাপুরের নগরপ্রাচীরের সম্মুখে গিয়া বিলুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল।

বিজাপুর-ভূপতি ক্রুদ্ধ হইলেন; বশ্যতাস্বীকারের জন্যে শিবাজীর নিকটে দূত পাঠাইলেন। দূত শিবাজীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। শিবাজী ধীর-গম্ভীরস্বরে তাহাকে কহিলেন,—"দূত! আমার উপর তোমার প্রভুর এমন কি ক্ষমতা আছে যে, আমি তাঁহার কথায় সম্মত হইব? শীঘ্র এখান হইতে প্রস্থান কর; নচেৎ তোমাকে অপমানিত হইতে হইবে। দূত চলিয়া গেল। বিজাপুরের অধিপতি শিবাজীর এই উদ্ধতভাবের জন্যে অধিকতর ক্রুদ্ধ হইলেন; ইহার পূর্ব্বে শিবাজী যখন তাঁহার বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়েন, তখন তিনি শাহজীকে কারারুদ্ধ করিয়া কহিয়াছিলেন,—"তোমার পুত্র শীঘ্র বশীভূত না হইলে, এই কারাগারের দ্বার গাঁথিয়া তোমাকে জীবদ্দশায় সমাহিত করিব।" পিতার কারাগারের সংবাদে শিবাজী কিছু শঙ্কিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কর্ত্তব্যবিমুখ হয়েন নাই। তিনি দিল্লীর সম্রাট্ শাহজঁহার নিকটে আবেদন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ শাহজঁহার কথায় বিজাপুর-রাজ শাহজীকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বিমুক্ত হইয়া শাহজী রায়গড়ে আপনার এই দুরদৃষ্টের মূল—তনয়ের নিকটে উপস্থিত হয়েন। শিবাজী পিতার সমুচিত সম্মান করিতে উদা-

সীন ছিলেন না। তিনি পিতাকে গদীতে বসাইয়া, তাঁহার পাদুকা গ্রহণপূর্ব্বক সামান্য ভৃত্যের ন্যায় তদীয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকেন। মহাবীর শিবাজী কিরূপ পিতৃভক্ত ছিলেন, তাহা ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে।

শাহজী বিমুক্ত হইলে, শিবাজী পুনর্ব্বার আধিপত্যবিস্তারে উদ্যত হয়েন। বিজাপুররাজ তাঁহাকে পরাজিত করিবার জন্য বহুসংখ্য সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু শিবাজীর কৌশলে বিজাপুর-ভূপতির চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাঁহার সেনাপতি আফ্‌জল্ খাঁ নিহত হয়েন। এবার এক-জন রণদক্ষ আবিসিনীয় সর্দ্দার শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। বিজাপুরের সৈন্য শিবাজীকে পান্‌হালা দুর্গে অবরোধ করিল। কিন্তু এবারও শিবাজীর জয় হইল। তাঁহার কৌশলে আবিসিনীয় সর্দ্দারের সমুদয় চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। শেষে ঐ সর্দ্দার আপনার অনুচরগণ কর্ত্তৃক নিহত হইলেন।

যখন আওরঙ্গজেব পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্যে আগ্রায় যাত্রা করেন, তখন তিনি শিবাজীর নিকটে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত সর্দ্দার পাঠাইয়া, তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু শিবাজী আওরঙ্গজেবের ন্যায় বহির্ভূত কার্য্যের অনুমোদন করেন নাই। তিনি আওরঙ্গজেবের গর্হিত কার্য্যের কথা শুনিয়া, ঘৃণা ও বিরাগের সহিত দুতকে বিদায় দেন এবং দূত আওরঙ্গজেবের যে পত্র আনিয়াছিলেন, তাহা ঘৃণা ও বিরাগের সহিত কুক্কুরের লাঙ্গুলে বান্ধিয়া দিতে অনুমতি করেন। এই অবধি আওরঙ্গজেব শিবাজীকে "পার্ব্বত্য মূষিক" বলিয়া তাঁহার অনিষ্টসাধনে উদ্যত হয়েন।

আওরঙ্গজেব বৃদ্ধ পিতাকে রাজ্যচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিয়া, স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এ দিকে শিবাজীর সহিত বিজাপুর-রাজের সন্ধি স্থাপিত হইল। এই সময়ে শিবাজী সমগ্র কোকণ প্রদেশের

অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার সাত হাজার অশ্বারোহী ও পঞ্চাশ হাজার পদাতিক সৈন্য হইয়াছিল।

বিজাপুররাজের সহিত সন্ধিস্থাপনের পর শিবাজী মোগলরাজ্য আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার আদেশে তদীয় সেনাপতিগণ দিল্লীশ্বরের অধিকার বিলুণ্ঠন করিয়া পুনায় ফিরিয়া আসিলেন। সায়েস্তা খাঁ এই সময়ে দক্ষিণাপথের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সম্রাট্ আওরঙ্গজেব শিবাজীকে দমন করিবার জন্য তাঁহার প্রতি আদেশ দিলেন। এই আদেশ অনুসারে সায়েস্তা খাঁ বহু সৈন্য সহ আরাঙ্গাবাদ হইতে যাত্রা করিয়া, পুণায় উপস্থিত হইলেন। শিবাজী মোগলসৈন্যের আগমন-সংবাদ শুনিয়া, রায়গড় পরিত্যাগপূর্ব্বক সিংহগড়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সায়েস্তা খাঁ শিবাজীর কৌশলের কথা জানিতেন। এজন্য সাবধানে আপনার আবাসগৃহ সুরক্ষিত রাখিলেন। তাঁহার অনুমতি-পত্র ব্যতীত কোন সশস্ত্র মহারাষ্ট্রীয় পুণায় প্রবেশ করিতে পারিত না। কিন্তু মোগল শাসনকর্ত্তার এইরূপ সতর্কতাতেও কোন ফল হইল না। চতুর শিবাজীর সাহসে ও কৌশলে সতর্ক মোগলের সর্ব্বনাশ হওয়ার উপক্রম হইল।

একদা রাত্রিকালে পৃথিবী ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে। পুণার পথ-ঘাট, প্রাসাদ, সমস্তই যেন গভীর অন্ধকারে মিশাইয়া গিয়াছে। কোথাও জনসমাগম নাই, কেবল এক দল বিবাহযাত্রী রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, ধীরে ধীরে পুণার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। সাহসী শিবাজী এই সুযোগে নির্দ্দিষ্ট স্থানে সেনানিবাস করিয়া, কেবল পঁচিশ জন অনুচরের সহিত সেই বিবাহযাত্রির দলে মিশিলেন। বরযাত্রির দল আমোদ করিতে করিতে পুণায় প্রবেশ করিল, শিবাজীও তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া, পুণায় উপনীত হইয়া একেবারে আপনার বাসভবনে পঁহুছিলেন। এই গৃহে সায়েস্তা খাঁ নিদ্রিত ছিলেন। তাঁহার পরিবারের

কয়েকটি স্ত্রীলোক, ঐ আকস্মিক আক্রমণের সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে জাগাইয়া দিল। সায়েস্তা খাঁ শয়নগৃহের গবাক্ষ দিয়া পলাইতে চেষ্টা করিলেন। এই সময়ে আক্রমণকারীগণের তরবারির আঘাতে তাঁহার হস্তের একটি অঙ্গুলি ছিন্ন হইয়া গেল। যাহা হউক, তিনি কোন রূপে পলাইয়া রক্ষা পাইলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র ও অনুচরগণ নিহত হইল। শিবাজী জয়লাভে উৎফুল্ল হইয়া, মশালের আলোকে যাইবার পথ আলোকিত করিয়া, পুনর্ব্বার সিংহগড়ে ফিরিয়া গেলেন।

সমগ্র মহারাষ্ট্রে মহাবীর শিবাজীর এই কীর্ত্তি উদ্‌ঘোষিত হইল। সমগ্র মহারাষ্ট্রবাসী স্বদেশের মহাবীরের এই বীরত্বে মোহিত হইয়া, তাঁহার গুণগান করিতে লাগিল। বহু বৎসর অতীত হইয়াছে, বহু বৎসর অতীত কালস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে, কিন্তু শিবাজীর ঐ সাহস ও বীরত্বের কাহিনী বিলুপ্ত হয় নাই। মহারাষ্ট্রীয়েরা আজ পর্য্যন্ত আহ্লাদের সহিত শিবাজীর ঐ সাহস ও বীরত্বের কীর্ত্তন করিয়া থাকে।

পরদিন প্রাতঃকালে কতকগুলি মোগল অশ্বারোহী সিংহগড়ের অভিমুখে গমন করিল। শিবাজী ইহাদিগকে দুর্গের নিকটে আসিতে অনুমতি দিলেন। ইহারা মহাবিক্রমে রণডঙ্কাধ্বনির সহিত নিষ্কোষিত তরবারির আস্ফালন করিতে করিতে দুর্গের সমীপবর্ত্তী হইল। তখন শিবাজী ইহাদের সম্মুখে কামান স্থাপিত করিলেন। ইহারা তোপের নিকটে স্থির থাকিতে পারিল না; সন্ত্রস্ত হইয়া পলাইয়া গেল। শিবাজীর একজন সেনাপতি পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া ইহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। এই প্রথমবার মোগল সৈন্য শিবাজীর সৈন্য কর্ত্তৃক পরাভূত ও তাড়িত হইল। শিবাজী বিজয়ী হইয়া দক্ষিণাপথে আত্মপ্রাধান্য অব্যাহত রাখিলেন।

ইহার পর শিবাজী অশ্বারোহী সৈন্যসহ সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের অধিকৃত সুরাত নগর লুণ্ঠন করিয়া, অনেক অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক রায়গড়ে

ফিরিয়া আসিলেন। তিনি জলপথেও আধিপত্যস্থাপনে যত্নশীল ছিলেন। তাঁহার অনেকগুলি রণতরী ছিল। ঐ সকল রণতরীদ্বারা মোগল-সম্রাটের রণতরী অধিকৃত হইল।

সুরাত নগর লুণ্ঠনের পর শিবাজী শুনিলেন যে, তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। পিতৃবিয়োগে শিবাজী সিংহগড়ে গিয়া শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর রায়গড়ে উপস্থিত হইয়া, অমাত্যগণের সহিত অধিকৃত জনপদের শাসনপ্রণালীর সুবন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। এই কর্ম্মে কয়েক মাস অতিবাহিত হইল। এই সময়ে শিবাজী "রাজা" উপাধি পরিগ্রহপূর্ব্বক নিজনামে মুদ্রা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। বীরপুরুষের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল। মোগলের মহাপ্রতাপের মধ্যে ভারতের বীরশ্রেষ্ঠ স্বাধীন রাজার সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, স্বাধীনভাবে শাসনদণ্ডের পরিচালনায় উদ্যত হইলেন।

মক্কাযাত্রিগণ সুরাত বন্দরে জাহাজে উঠিত। এজন্যে মুসলমানগণের মধ্যে সুরাত একটী পবিত্র স্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল। ঐ পবিত্র স্থান বিলুণ্ঠন ও শিবাজীর "রাজা" উপাধি গ্রহণসংবাদে আওরঙ্গজেব ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার দমন জন্য রাজা জয়সিংহ ও দিলের খাঁকে পাঠাইলেন। কিন্তু শিবাজী ইঁহাদের সহিত সম্মুখ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন না। তিনি প্রস্তাব করিয়া প্রথমে রঘুনাথ পন্ত ন্যায়শাস্ত্রীকে জয়সিংহের নিকটে পাঠাইলেন। জয়সিংহের সহিত দূতের অনেক কথা হইল। দূত বিদায় লইয়া শিবাজীর নিকটে আসিলেন। শিবাজী বীরধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন; সুতরাং কিছুমাত্র আশঙ্কা না করিয়া, অত্যল্প অনুচরের সহিত বর্ষার প্রারম্ভে জয়সিংহের শিবিরে উপস্থিত হইয়া আপনার পরিচয় দিলেন। জয়সিংহ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য একজন সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারীকে পাঠাইলেন। শিবাজী শিবির দ্বারে উপস্থিত হইলে, জয়সিংহ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আপনার

আসনের দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইলেন। সন্ধির নিয়ম নির্দ্ধারিত ও দিল্লীতে প্রেরিত হইল। সম্রাট্ উহার অনুমোদন করিয়া পাঠাইলেন। ইহার পর শিবাজী মোগলের পক্ষ হইয়া, বিজাপুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন; পরবর্ত্তী বৎসর সম্রাট্-কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া আপনার পুত্র শাম্ভাজী পাঁচ শত অশ্বারোহী ও এক হাজার মাওয়ালী সৈন্যের সহিত দিল্লীতে যাত্রা করেন।

শিবাজী দিল্লীতে উপনীত হইলেন। দিল্লীর সমগ্র অধিবাসী তাঁহাকে দেখিবার জন্যে ব্যস্ত হইল। কিন্তু আওরঙ্গজেব এই পরাক্রান্ত হিন্দু-ভূপতির যথোচিত সম্মান করিলেন না। তিনি শিবাজীকে প্রজা-লোকের সমক্ষে অপদস্থ করিতে উদ্যত হইলেন।

শিবাজী সম্রাটের সভাগৃহে সমাগত হইলে, আওরঙ্গজেব তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারিগণের আসনে বসাইয়া দিলেন। শিবাজী ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়া সভাগৃহ পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ দিল্লী হইতে প্রস্থান করিতে পারিলেন না। সম্রাট্ তাঁহার বাসগৃহে প্রহরী রাখিতে নগরের কোতয়ালকে বলিয়া দিলেন। এ দিকে চতুর মহারাষ্ট্রপতি দিল্লীর জলবায়ু সমভিব্যাহারী লোকের সহ্য হয় না বলিয়া, তাহাদিগকে স্বদেশে পাঠাইতে সম্রাটের নিকটে অনুমতি চাহিলেন। সঙ্গের লোক চলিয়া গেলে, শিবাজী সহায়বিহীন, সুতরাং আপনার আয়ত্ত হইবেন ভাবিয়া, সম্রাট্ তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিলেন। ইহার পর শিবাজী পীড়ার ভাণ করিয়া, শয্যাশায়ী হইয়া রহিলেন। অনন্তর পীড়ার কিঞ্চিৎ উপশম হইয়াছে বলিয়া, ঝুড়িতে মিষ্টান্ন রাখিয়া, ফকীর-সন্ন্যাসীদিগকে ঐ মিষ্টান্ন দিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার আবাসগৃহ হইতে মিষ্টান্নপূর্ণ বড় বড় ঝুড়ি বাহির হইতে লাগিল। যখন প্রহরীদিগের সংস্কার হইল যে, কেবল মিষ্টান্নই যাইতেছে, তখন শিবাজী এক ঝুড়িতে নিজে চড়িয়া, এবং আর একটিতে তাঁহার পুত্র শাম্ভাজীকে

চড়াইয়া আবাসগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। নগরের উপকণ্ঠে অশ্ব সজ্জিত ছিল। শিবাজী সেই অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক আপনার পশ্চাদ্ভাগে শাম্ভাজীকে রাখিয়া মথুরায় উপনীত হইলেন। এই স্থানে তিনি কতিপয় বন্ধুর নিকটে শাম্ভাজীকে রাখিয়া, স্বয়ং সন্ন্যাসীর বেশে ভ্রমণ করিতে করিতে দক্ষিণাপথে উপনীত হইলেন। ইহার পর তাঁহার বন্ধুগণও শাম্ভাজীকে লইয়া দক্ষিণাপথে উপস্থিত হয়েন।

এই সময়ে বিজাপুরের সহিত যুদ্ধ চলিতেছিল। পাছে শিবাজী বিজাপুররাজের সহিত মিলিত হয়েন, এই আশঙ্কায় আওরঙ্গজেব তাঁহাকে জাইগীর দিয়া তাঁহার 'রাজা' উপাধি দৃঢ়তর করিলেন। ইহার পর শিবাজী বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার রাজাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া, তাঁহাদের নিকট করগ্রহণ করেন।

কিছু দিনের জন্যে যুদ্ধের বিরাম হইলে, শিবাজী স্বকীয় রাজ্যের শৃঙ্খলাবিধান করেন। তিনি রাজস্বসম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্য ব্রাহ্মণের হস্তে দিলেন; কৃষকদিকের উপর দৌরাত্ম্য না হয়, কেহ কাহাকে ঠকাইতে না পারে, তজ্জন্য সুনিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহার নিয়ম অনুসারে উৎপন্ন শস্যের পাঁচ ভাগের তিনভাগ কৃষক পাইত, অবশিষ্ট দুই ভাগ সরকারে যাইত। শিবাজী আপনার কর্ম্মচারী দ্বারা রাজস্বসংগ্রহ করিতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি সৈনিকদিগকে রাজকোষ হইতে বেতন দিবার নিয়ম করেন। তাঁহার পদাতি সৈন্যের অধিকাংশই মাওয়ালী-জাতীয়। তরবারি, ঢাল ও বন্দুক ইহাদের প্রধান অস্ত্র। অশ্বারোহী সৈন্য বর্গিরদার ও শিলেদার, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল।

হিন্দুদিগের মতে শরৎকালই দিগ্বিজয়যাত্রার সময়। প্রতাপশালী শিবাজী ঐ সময়ে দুর্গতিনাশিনী ভবানীর পূজা করিয়া, দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইতেন। তিনি শত্রুদিগের অধ্যুষিত জনপদ লুণ্ঠন করিতেন বটে, কিন্তু কৃষক, গো, অথবা স্ত্রীলোকদিগের উপর হস্তক্ষেপ করিতেন

না। এইরূপে পরাক্রান্ত মোগলের শাসনসময়ে মহারাষ্ট্ররাজ্য স্থাপিত হয়, এবং এইরূপে মহারাষ্ট্রীয়গণ সাধারণের নিকটে একটি প্রধান জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়া উঠে।

আওরঙ্গজেব বাহিরে সৌজন্য দেখাইয়া, শিবাজীকে আর একবার হস্তগত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ঐ চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। শিবাজী আওরঙ্গজেবের কৌশলজালে আবদ্ধ হইলেন না। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় দক্ষিণাপথের নানাস্থানে আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। সুতরাং মোগল সম্রাট্কে এখন বাধ্য হইয়া, শিবাজীর সহিত প্রকাশ্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইল। শিবাজী ইহাতে কিছুমাত্র ভীত হইলেন না, আত্মসম্মানে বিসর্জ্জন দিয়া, মোগলের আনুগত্য স্বীকার করিলেন না। তিনি প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় বীরধর্ম্মরক্ষায় যত্নশীল হইলেন। অবিলম্বে মোগল সম্রাটের অধিকৃত কয়েকটি দুর্গে বিজয়পতাকা স্থাপিত হইল; শিবাজী ইহার পর ১৫ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া, আর একবার সুরাত নগরে উপনীত হইলেন। নগর বিলুণ্ঠিত হইল। কেহই তেজস্বী মহারাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধাচরণে সাহসী হইল না। শিবাজী অবাধে সুরাতের সম্পত্তি সংগ্রহপূর্ব্বক স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন।

শিবাজী যখন সুরাত হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন দায়ুদ খাঁ নামক একজন মোগলসেনাপতি পাঁচ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া, তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হয়েন। শিবাজী দায়ুদ খাঁকে আক্রমণপূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করেন। এদিকে তাঁহার সেনাপতি প্রতাপ রাও খান্দেশ প্রদেশে যাইয়া, নানা স্থান হইতে করসংগ্রহ করিতে থাকেন। শিবাজীর এইরূপ আধিপত্যে চিন্তিত হইয়া, আওরঙ্গজেব তাঁহার বিরুদ্ধে মহব্বৎ খাঁকে চল্লিশ হাজার সৈন্যসহ দক্ষিণাপথে পাঠাইয়া দেন। শিবাজী এই সৈন্যের সম্মুখে আত্মপ্রাধান্য স্থাপনে বিমুখ হয়েন নাই;

তিনি মরোপন্ত ও প্রতাপ রাও, আপনার এই দুই জন প্রধান সেনাপতিকে মোগল সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে অনুমতি দেন। এই সেনাপতিদ্বয়ের আগমন সংবাদ শুনিয়া মহব্বৎ খাঁ। ইখলাস খাঁকে বহুসংখ্য সৈন্যের সহিত ইহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধে মোগল সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজয় স্বীকার করে। তাহাদের অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ২২ জন সেনানায়ক নিহত হয়েন। কয়েক জন প্রধান সেনাপতি আহত হইয়া বন্দিত্ব স্বীকার করেন।

মোগল সৈন্যের সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের এইটি প্রধান সম্মুখ যুদ্ধ। এই যুদ্ধে শিবাজীর সৈন্য বিজয়লক্ষ্মীতে গৌরবান্বিত হয়। তাহাদের বিজয়িনী শক্তির বিষয় চারিদিকে পরিকীর্ত্তিত হইতে থাকে। শিবাজী মহাপরাক্রান্ত ভূপতি বলিয়া সাধারণের নিকটে সম্মানিত হয়েন। তাঁহার প্রতাপ, তাঁহার বীরত্ব, তাঁহার সমরচাতুরীতে লোকে বিস্মিত হইয়া, তাঁহাকে অসাধারণ বীরপুরুষ বলিয়া, মনে করিতে থাকে। মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব এই পরাক্রান্ত শত্রুর অপূর্ব্ব প্রভাবে স্তম্ভিত হয়েন। এই যুদ্ধে যে সকল সেনাপতি বন্দী হইয়াছিলেন শিবাজী তাঁহাদের সহিত কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করেন নাই। তিনি বন্দীদিগকে প্রভূত সম্মানের সহিত রায়গড়ে প্রেরণ করেন, এবং তাঁহাদের ক্ষতস্থান ভাল হইলে, প্রভূত সম্মানের সহিত তাঁহাদিগকে বিদায় দেন। ভারতের অদ্বিতীয় বীরপুরুষ বীরধর্ম্মের অবমাননা করেন নাই। আহত বন্দিগণকে রায়গড়ে কখনও কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। শিবাজীর আদেশে ইঁহাদের যথোচিত শুশ্রূষা হইয়াছিল। পতিত শত্রুর প্রতি এইরূপ সৌজন্য প্রকাশ করাতে শিবাজী বীরোচিত মহত্ত্ব ও উদারতার পরিচয় দিয়াছিলেন। এই মহত্ত্ব ও উদারতা চিরকাল তাঁহাকে ইতিহাসের বরণীয় করিয়া রাখিবে।

শিবাজী পূর্ব্বেই "রাজা" উপাধিগ্রহণপূর্ব্বক নিজ নামে মুদ্রা অঙ্কিত

করিয়াছিলেন। এখন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের সহিত শাস্ত্রের নিয়মানুসারে রাজ্যাভিষেক সম্বন্ধে পরামর্শ করেন। এই সময়ে গাগাভট্টনামক এক-জন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ বারাণসী হইতে রায়গড়ে উপনীত হইয়াছিলেন। অভিষেক-কার্য্য সম্পাদনের ভার ইঁহার প্রতি সমর্পিত হয়। মহারাষ্ট্রের ইতিহাসে ১৫৯৬ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী প্রাতঃস্মরণীয় তিথির মধ্যে পরিগণিত। এই তিথিতে দুরারোহ শৈলশিখরবর্ত্তী রায়গড়ের মহারাজ শিবাজী স্বাধীন ভূপতির সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। শাস্ত্রপারদর্শী গাগাভট্ট এই তিথিতে শিবাজীকে যথাশাস্ত্র রাজ্যা-ভিষিক্ত করেন। ব্রাহ্মণগণ এই উপলক্ষে ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে, মহোল্লাসের তরঙ্গে, রায়গড়ে অপূর্ব্ব দৃশ্যের আবির্ভাব হয়। বহুদিনের পর স্বাধীনতাভক্ত হিন্দুবীরগণের জয়ধ্বনিতে রায়গড় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। বীরপ্রবর শিবাজী রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, এই দিনের স্মরণার্থে একটি অব্দের প্রতিষ্ঠা করেন এবং রাজ্য-সম্পর্কীয় উপাধিসমূহ পারস্য ভাষার পরিবর্ত্তে সংস্কৃত ভাষায় অভিহিত করিতে আদেশ দেন। শিবাজীর প্রবর্ত্তিত অব্দ শিবশক নামে কোলাপুরে প্রচলিত রহিয়াছে। রাজ্যাভিষেককালে বিভিন্ন স্থান হইতে কয়েক জন রাজদূত রায়গড়ে উপনীত হইয়াছিলেন। একজন ইংরেজদূত বোম্বাই হইতে উপনীত হয়েন। এই দূত ইংরেজ কোম্পানীর প্রতিনিধি হইয়া শিবাজীর সহিত সন্ধিবন্ধন করেন। এইরূপে শিবাজীর অভিষেকক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এইরূপে ক্ষত্রিয় ভূপতি আত্মপ্রাধান্যের মহিমায় লোকসমাজে চিরপ্রসিদ্ধি লাভ করেন।

শিবাজী রাজপদবী গ্রহণপূর্ব্বক, যথানিয়মে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। নর্ম্মদা হইতে কৃষ্ণা নদী পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভারতবর্ষ তাঁহার অধীন হইয়াছিল। তিনি এই বিস্তৃত রাজ্যশাসনে কখনও ঔদাস্য

প্রকাশ করেন নাই। যুদ্ধজয়ে ও রাজ্যাধিকারে তাঁহার যেরূপ ক্ষমতা ও কৌশল প্রকাশিত হয়, তিনি অধিকৃত রাজ্যের শৃঙ্খলাবিধানেও সেইরূপ ক্ষমতা ও কৌশলের পরিচয় দেন। শিবাজী ইহার পর, নানা স্থানে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। এই সকল যুদ্ধেও তাঁহার অপরিসীম ক্ষমতা প্রকাশ হইয়াছিল। তাঁহার সৈন্য এক সময়ে নর্ম্মদা নদী উত্তীর্ণ হইয়া মোগল সম্রাটের অধিকৃত জনপদ আক্রমণ করিতেও সঙ্কুচিত হয় নাই। যখন মোগল সেনানী দিলের খাঁ বিজাপুরের অধিপতিকে আক্রমণ করেন, তখন বিজাপুররাজ শিবাজীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শিবাজী সাহায্যদানে অসম্মত হয়েন নাই। তাঁহার সমরচাতুরীতে দিলের খাঁ এমন ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন যে, তাঁহাকে অগত্যা বিজাপুর পরিত্যাগ করিতে হয়। বিজাপুররাজ এজন্যে ভূসম্পত্তি দিয়া, শিবাজীর নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এইরূপে নানাস্থানে নানাবিষয়ে অসামান্য সাহস, অপরিমেয় ক্ষমতা, অবিচলিত তেজস্বিতার পরিচয় দিয়া, বীরশ্রেষ্ঠ শিবাজী ঐহিক জীবনের চরমসীমায় উপনীত হয়েন। তাঁহার হাঁটু ফুলিয়া উঠাতে তিনি রায়গড়ে গমন করিলেন। ক্রমে প্রচণ্ড জ্বরের আবির্ভাব হইল। এই জ্বরের আর বিরাম হইল না। শিবাজী জ্বরারম্ভের সপ্তম দিবসে ১৬৮০ অব্দের ৫ই এপ্রেল ৫৩ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিলেন।

এইরূপে অসাধারণ বীরপুরুষের অসামান্য ঘটনাপূর্ণ জীবনের অবসান হইল। বীরপুরুষের সমস্ত কার্য্যই লোকাতীতভাবে পরিপূর্ণ। ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাট্‌ও তাঁহার ক্ষমতা ও প্রাধান্যের রোধে সমর্থ হয়েন নাই। যখন তাঁহার মাওয়ালী সৈন্য, তাঁহার সমরপটুতা, তাঁহার সাহস এবং রাজ্যশাসনের কথা মনে হয়, তখন তৎপ্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঞ্চার হইয়া থাকে। তিনি পিতার অজ্ঞাতসারে নিঃসহায় ও নিরবলম্বন হইয়া অভীষ্ট কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার মনে

কোনরূপ আশঙ্কা বা উদ্বেগের সঞ্চার হয় নাই। তিনি অপূর্ব্ব ক্ষমতায় ও অধ্যবসায়ে আপনার গুরুতর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন।

শিবাজী স্বজাতির পূর্ব্বতন গৌরবের উদ্ধারকর্ত্তা। বহুশতাব্দীর অত্যাচার ও অবিচারে যে জাতি নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত হইয়াছিল, যে জাতি স্বাধীনতায় বিসর্জ্জন দিয়া, পরাধীনতা স্বীকারই পুরুষার্থ বলিয়া মনে করিতেছিল, শিবাজী সেই জাতিকে ধীরে ধীরে উন্নতিপথে আনয়ন করেন, এবং ধীরে ধীরে সেই জাতির হৃদয়ে অচিন্তনীয় সাহস ও উৎসাহ প্রসারিত করিয়া, তাহাদিগকে স্বাধীনতাভক্ত বীরপুরুষের সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলেন। মোগল সাম্রাজ্যের উন্নতির সময়ে তাঁহার ক্ষমতায় একটি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পরাধীনতার শোচনীয় সময়ে, নিপীড়নের ভয়াবহ কালে, হিন্দুর পবিত্র ভূমিতে আর কোন হিন্দুবীরকর্ত্তৃক এরূপ পরাক্রান্ত রাজ্য স্থাপিত হয় নাই।

অপরিসীম সাহস ও ক্ষমতা থাকাতে শিবাজী সকল বিষয়েই কৃতকার্য্য হইতেন। তাঁহার ক্ষমতায় সুশিক্ষিত মোগলসৈন্যও ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করে। ফলতঃ, সাহসে, কৌশলে ও ক্ষমতায়, তৎসমকালে তাঁহার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। সম্রাট্ আওরঙ্গজেব তাঁহাকে "পার্ব্বত্য মূষিক" বলিয়া ঘৃণা করিতেন। কিন্তু এই পার্ব্বত্য মূষিকের ক্ষমতায় দিল্লীর প্রতাপান্বিত সম্রাট্ এতদূর নিপীড়িত হইয়াছিলেন যে, অগত্যা তিনি উহার প্রাধান্যস্বীকারে বাধ্য হয়েন। আওরঙ্গজেব শিবাজীর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া কহিয়াছিলেন, 'শিবাজী একজন প্রধান সেনাপতি ছিল; যখন আমি ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজ্যগুলি বিনষ্ট করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলাম তখন কেবল এই ব্যক্তিই একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করে। আমার সৈন্য উনিশ বৎসর কাল, তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল। তথাপি তাহার রাজ্যের কোন

অবনতি হয় নাই।' আওরঙ্গজেবের কথাতেই শিবাজীর ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

শিবাজী শত্রুর অপকারী ছিলেন। কিন্তু যাহারা পরাজিত ও বন্দী-ভূত হইত, তাহাদের প্রতি যথোচিত সৌজন্য দেখাইতেন। তিনি আত্মীয় স্বজন ও অধীন কর্ম্মচারীর সহিত কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করিতেন না। গো ব্রাহ্মণ ও বর্ণাশ্রমধর্ম্মের রক্ষার জন্যে তাঁহার অধ্যবসায় সর্ব্বদা পরিস্ফুট হইত। তিনি যেরূপ পিতৃভক্ত ও মাতৃসেবক, সেইরূপ গুরু-শুশ্রূষাপর ও প্রজাবৎসল ছিলেন। তাঁহার গুরুর নাম রামদাস স্বামী। তিনি গুরুর নামে স্বকীয় রাজ্যের উৎসর্গ করিতেও সঙ্কুচিত হয়েন নাই। গুরুর আদেশানুসারে তিনি বর্ণাশ্রমধর্ম্মরক্ষায় নিয়োজিত হইয়াছিলেন। পরমাত্মনিষ্ঠ সাধকের প্রতি তাঁহার অতিশয় শ্রদ্ধা ছিল। মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত দেহুনামক স্থানে তুকারাম নামে একজন বণিগ্জাতীয় সাধু ছিলেন। ইঁহার প্রতি শিবাজীর সবিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। নানারূপ বিঘ্নবিপত্তির মধ্যেও শিবাজী ইঁহার কীর্ত্তন শুনিতে গমন করিতেন। দাদোজী কোণ্ডদেব মৃত্যুকালে শিবাজীকে স্বধর্ম্মরক্ষণ ও রাজ্যপালন বিষয়ে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, শিবাজী সেই উপদেশ পালনে কখনও অমনোযোগী হয়েন নাই। তিনি নারীজাতির যথোচিত সম্মান রক্ষা করিতেন। তাঁহার একজন সেনাপতি কোন জনপদ অধিকারপূর্ব্বক একটি রূপবতী কামিনীকে তৎসকাশে প্রেরণ করেন। শিবাজী তাঁহাকে মাতৃসম্বোধন করিয়া সম্মানসহকারে যথাস্থানে পাঠাইয়া দেন। এইরূপ সদয়ব্যবহারে মহারাষ্ট্রবাসিগণ তাঁহার অনুরক্ত থাকিত; মিতাচার তাঁহার একটি গুণ ছিল। অসাধারণ ক্ষমতায় অপরিমিত সম্পত্তির অধিকারী হইলেও তিনি কখনও সৌখীনতার পরিচয় দেন নাই। তাঁহার নিকটে ভোগবিলাসের আদর ছিল না। তিনি সামান্য আহার পানে পরিতুষ্ট থাকিতেন।

শিবাজী দক্ষিণাপথে যে রাজ্য স্থাপন করেন, তাহার দৈর্ঘ্য চারি শত মাইল, বিস্তার এক শত কুড়ি মাইল। তাঞ্জোরেও তাঁহার আধিপত্য ছিল। নর্ম্মদা হইতে তাঞ্জোর পর্য্যন্ত, কোকণ হইতে মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের অধিপতিগণ কোন না কোন সময়ে শিবাজীর সাহায্য, প্রার্থনা করিতেন। অনেকে কর দিয়া, তাঁহার সন্তোষসাধনে ব্যাপৃত থাকিতেন, সমগ্র দক্ষিণাপথে তাঁহার অপরিসীম প্রভুত্ব ছিল। দক্ষতায়, একাগ্রতায়, সত্বরতায় তিনি তৎসমকালীন বীরপুরুষদিগকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। কেহই তাঁহার কৌশলজাল ভেদ করিতে পারিত না, কেহই তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে সমর্থ হইত না, কেহই তাঁহার ক্ষমতা রোধে সাহস পাইত না। তিনি পরাক্রান্ত মুসলমানদিগের মধ্যে সর্ব্বাংশে আত্মপ্রাধান্য রক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, বিশ্বাসঘাতকের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা না করিলে, অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, তিনি কোন কোন সময়ে বিশ্বাসের বহির্ভূত কার্য্য করিতেও বাধ্য হইয়াছিলেন।

শিবাজী খর্ব্বকায় ছিলেন। তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল এবং মুখমণ্ডল সুগঠিত ও বীরত্বব্যঞ্জক ছিল। দেহের পরিমাণ অনুসারে তাঁহার বাহুযুগলের দৈর্ঘ্য অধিক বোধ হইত। তাঁহার অনুরক্ত স্বদেশীয়গণ তাঁহাকে দেবতার অবতার বলিয়া থাকেন। তিনি আপনার তরবারির নাম “ভবানী” রাখিয়াছিলেন। ঐ তরবারি সাতারার রাজার অধিকারে রহিয়াছে। সাতারার রাজ-সংসারে শিবাজীর ভবানীর পূজা হইয়া থাকে।

শিবাজীর মহানুভাবতা।

বীরপ্রবর শিবাজী রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তাঁহার নামে একটি শক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তাঁহার নামে মুদ্রা অঙ্কিত হইতেছে। তাঁহার নামে দক্ষিণাপথের শৈলমালাশোভিত, প্রশস্ত ভূখণ্ডে রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত যাবতীয় কর্ম্ম সম্পন্ন হইতেছে। মোগল সাম্রাজ্যের চরমোৎকর্ষ-সময়ে বীরপুরুষ এইরূপে আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছেন। মোগলের পতাকার পার্শ্বে শিবাজীর জয়পতাকা উড্ডীন হইয়া, আত্মগৌরবের পরিচয় দিতেছে। শিবাজী বিভিন্ন স্থানে দুর্গ স্থাপনপূর্ব্বক স্বকীয় অধিকার সুরক্ষিত করিয়াছেন। যুদ্ধকুশল হম্বীর রাও তাঁহার সেনাপতি হইয়াছেন। প্রসিদ্ধ মাওয়ালী সৈন্য দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁহার অধিকার-বৃদ্ধির জন্যে সাহস ও ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছে।

রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শিবাজী অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিয়াছেন। তিনি প্রত্যক্ষ দেবতাবোধে জননী জিজাবাইর সেবা করিতেন। তিনি প্রিয়তমা প্রণয়িনী সইবাইর প্রতি অপরিসীম অনুরাগ দেখাইতেন। তাঁহার রাজপদ গ্রহণের পর তদীয় জননী ও প্রণয়িনী, উভয়েই একে একে দেহত্যাগ করেন। মহারাজ শিবাজী ইঁহাদের বিয়োগশোকে কাতর হইলেও রাজধর্ম্মের পালনে ঔদাস্য প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার সুনিয়মে, তাঁহার উদার ব্যবহারে, তাঁহার ধর্ম্মানুরাগে প্রজালোকে পরম সুখে কালযাপন করিয়াছে। তিনি বিভিন্ন জনপদ অধিকার করিয়াছেন, কিন্তু শরণাগত বা বন্দীকৃত প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি কোনরূপ অসম্মান প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার সৈনিকদল মহাবিক্রমে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছে, কিন্তু গন্তব্য পথের কোন স্থানে গো, কৃষক, নারী-

জাতি বা বিভিন্ন জাতির ধর্ম্মমন্দির আক্রমণ করে নাই। ভিন্ন ভিন্ন দুর্গে তাঁহার জয়পতাকা স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু শরণাগত দুর্গবাসিগণ কোনরূপে নিপীড়িত বা নিগৃহীত হয় নাই। বীরশ্রেষ্ঠ শিবাজী এইরূপে বীরধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন; এইরূপে নৃপতিজনোচিত উদার ভাবের পরিচয় দিয়াছেন; এইরূপে মহীয়সী কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া লোকসমাজের বরণীয় হইয়াছেন। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ব্যাঙ্কোজী পৈতৃক সম্পত্তিলোলুপ হইয়া, সৈন্যসংগ্রহ করিলেও, মহারাজ শিবাজী ভ্রাতৃধর্ম্মে বিসর্জ্জন দেন নাই। ব্যাঙ্কোজী স্বকীয় মন্ত্রীর পরামর্শে যখন শিবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন শিবাজী সৎপরামর্শ দিয়া, তাহার বিষণ্ণভাব দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

রাজস্থানের ন্যায় দক্ষিণাপথেও বীরনারীর আবির্ভাব হইয়াছে। শিবাজীর সময়ে এইরূপ একটি নারী আত্মক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন। বীরপ্রবর শিবাজী ইঁহার মহীয়সী বীরত্বকীর্ত্তির কখনও অবমাননা করেন নাই।

শিবাজী রাজদণ্ড ধারণ করিয়া, দক্ষিণাপথের বিভিন্ন জনপদে আধিপত্য বিস্তারে উদ্যত হয়েন। এই সময়ে বল্লারা রাজ্যে মলবাই দেসাইন নাম্নী একটি বিধবা আধিপত্য করিতেন। শিবাজী বল্লারী দুর্গ অধিকার করিতে উদ্যত হইলে, মলবাই আত্মপ্রাধান্য রক্ষার জন্যে অস্ত্রপরিগ্রহ করিলেন। অবিলম্বে দুর্গরক্ষার বন্দোবস্ত হইল। মহারাষ্ট্রপতির আক্রমণে বাধা দিবার নিমিত্ত বিভিন্ন স্থানে সৈনিকগণ সন্নিবেশিত রহিল। উপযুক্ত সেনাপতিগণ ইঁহাদের পরিচালনভার গ্রহণ করিলেন। মলবাই স্বয়ং সমগ্র সামরিক কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। ভারতের সর্ব্বপ্রধান বীরপুরুষ তাঁহার দুর্গ আক্রমণ করিয়াছেন; সর্ব্বপ্রধান বীরপুরুষের বহুসংখ্য সৈন্য তাঁহাকে পরাধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়াছে, ইহাতে বীরাঙ্গনা বিচলিত হইলেন না। তিনি আত্ম-

ক্ষমতায় বিসর্জ্জন না দিয়া, অসিহস্তে আক্রমণকারীর সম্মুখীন হইলেন। মহারাষ্ট্রসৈন্য প্রবলবেগে তাঁহার সৈনিকদলকে আক্রমণ করিল। বীরাঙ্গনা অকুতোভয়ে বহির্ভাগে থাকিয়া, আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্ররাজের যুদ্ধকুশল সৈন্যের সম্মুখে তিনি দীর্ঘকাল আপনার সৈনিকদলের শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে পারিলেন না। বীরনারী দুর্গের বহির্ভাগে থাকিয়া, যুদ্ধ করা অসঙ্গত মনে করিলেন। অবিলম্বে তাঁহার আদেশে সৈনিকদল দুর্গ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। এদিকে শিবাজীর সৈন্যও দুর্গ আক্রমণ করিল। তাহারা দুর্গের পুরোভাগে কামান স্থাপনপূর্ব্বক মুহুমু্হুঃ গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। কিন্তু মলবাই ইহাতে ভীতা হইলেন না; তিনি যথোচিত সাহসসহকারে দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে সাতাশ দিন অতীত হইল। সাতাশ দিন শিবাজীর সৈন্য দুর্গ অবরোধ করিয়া রহিল! এই দীর্ঘকালের মধ্যে মলবাই কখনও সন্ত্রাসে অভিভূত ও আত্মপরাক্রম প্রকাশে নিরস্ত হয়েন নাই। তাঁহার সাহস অন্তর্হিত হয় নাই; তেজস্বিতার বিলোপ ঘটে নাই, আত্মগৌরব-রক্ষার বাসনা মনোমধ্যে উদিত হইয়া, মনেই বিলীন হইয়া যায় নাই। তিনি এরূপ নৈপুণ্যের সহিত সৈন্যপরিচালনা করিতেছিলেন, এরূপ বীরতার সহিত যুদ্ধের আদেশ দিতে ছিলেন, এরূপ বিচক্ষণতার সহিত দুর্গস্থিত সৈনিকদলের শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখিতেছিলেন যে, সপ্তবিংশতি দিবস পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রপতি তাঁহার ক্ষমতানাশে সমর্থ হয়েন নাই। সপ্তবিংশদিবসে বীরাঙ্গনার অদৃষ্টচক্র নিম্নাভিমুখে আবর্ত্তিত হইল। ঐ দিন দুর্গের একাংশ ভগ্ন হওয়াতে দুর্গ রক্ষার আর কোন উপায় রহিল না। আক্রমণকারী সৈনিকগণ ভগ্ন স্থান দিয়া দুর্গপ্রবেশে অগ্রসর হইল। বীরাঙ্গনা দুর্গরক্ষায় একান্ত হতাশ হইয়া মহারাষ্ট্রপতির হস্তে আত্মসমর্পণে বাধ্য হইলেন।

শিবাজীর আশা ফলবতী হইল। বল্লারী দুর্গে তাঁহার জয়পতাকা

উড়িতে লাগিল। বিধবা বীরনারী সপ্তবিংশতিদিবস ঘোরতর যুদ্ধের পর তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। কিন্তু বীরপুরুষ এই বীরাঙ্গনার বীরত্বের গৌরবরক্ষায় উদাসীন রহিলেন না। তিনি মলবাইকে যথোচিত সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন। বল্লারী দুর্গে আর মহারাষ্ট্রপতির জয়পতাকা পরিদৃষ্ট হইল না। উহার স্বাধীনতা অব্যাহত রহিল। শিবাজী মলবাইর হস্তে দুর্গ প্রত্যর্পণ করিলেন। বীরাঙ্গনা স্বকীয় বীরত্বে বীরশ্রেষ্ঠ মহারাষ্ট্ররাজকে পরিতোষিত করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় স্বাধীন ভাবে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণ।

প্রিণ্টার—শ্রীকুলচন্দ্র দে,
"শাস্ত্রপ্রচার প্রেস"
৫নং ছিদামমুদির লেন, কলিকাতা।